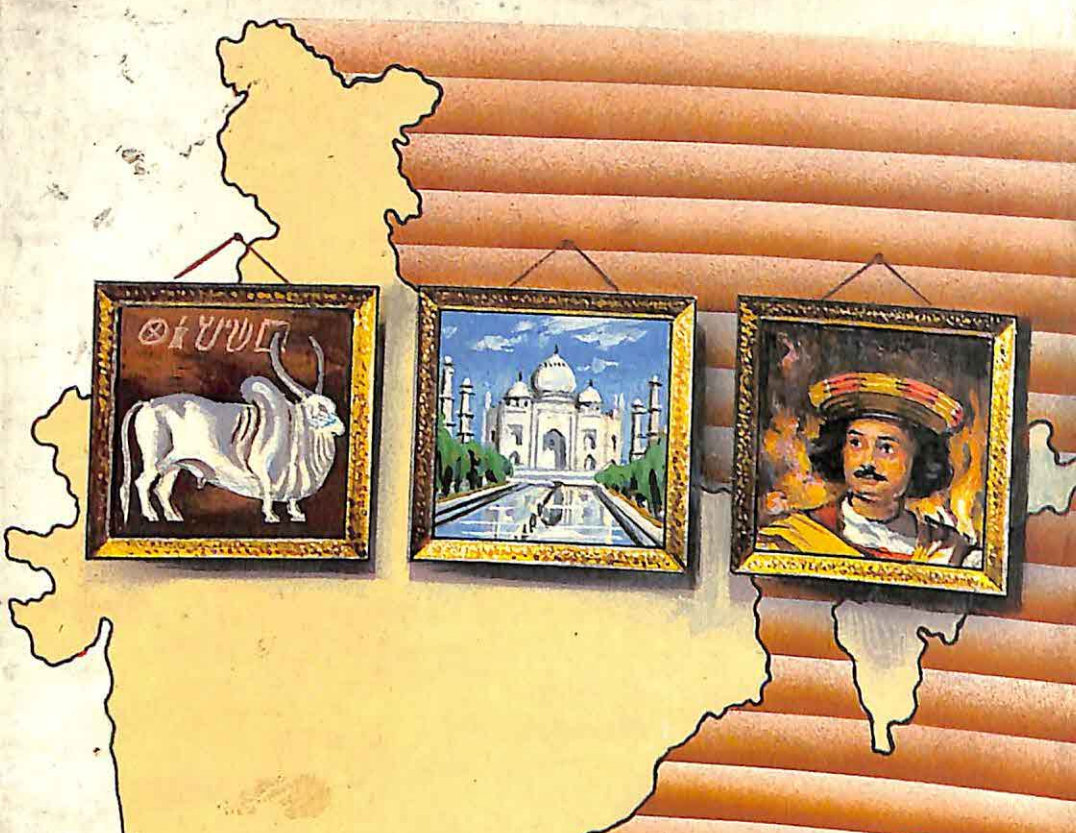


ইতিবৃত্তে ভারত ও ভারতবাসী

ডক্টর দিলীপ কুমার ঘোষ
ও
মন্ময়ী বসু

Recommended as a suitable Textbook by the West Bengal Board of Secondary Education for Class IX of all the schools of West Bengal & Tripura
[Vide Notification No. T. B. Syll/H/IX/87/44 dated 13.11.1987]

ইতিবৃত্তে ভারত ও ভারতবাসী

[নবম শ্রেণীর জন্য]

ডক্টর দিলীপ কুমার ঘোষ, এম. এ., পি. এইচ. ডি. (কলিকাতা)
পি. এইচ. ডি. (লণ্ডন)
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (প্রাক্তন)
ও
মন্ময়া বসু, এম. এ. (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)
ইতিহাস-বিভাগ, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়
'রায়বাহাদুর জি. সি. ঘোষ সি. আই. ই. স্মৃতি স্কলারশিপ প্রাপ্ত' ও
'ইউ. জি. সি. জাতীয় স্কলারশিপ প্রাপ্ত' এবং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ. জি. সি. রিসার্চ ফেলো
প্রণীত

nbs
দি নিউ বুক স্টল
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

Dr. Dilip Kumar Ghose
M. A. (Cal) Ph. D. (Calcutta and London)
Professor and Head of the Department, Burdwan University (Retd.)
AND
Monmayee Basu, M. A. (Goldmedalist)
Department of History, Magadh University
'Raibahadur G. C. Ghose C. I. E. Memorial'
Scholarship holder, 'University Grant Commission
National Scholarship' holder and U. G. C. Research
Fellow of Calcutta University'

সংশোধিত সংস্করণ জানুয়ারী, ১৯৮৮

॥ প্রকাশক ॥
শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল
দি নিউ বুক স্টল
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা মাত্র

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীনিশীথ কুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯/এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রস্তাবনা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন পাঠক্রম অনুযায়ী নবম শ্রেণীর ইতিহাস রচনার কাজে ব্রতী হয়েছি। পূর্বের পাঠক্রমের সঙ্গে বর্তমান পাঠক্রমের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি নজর রেখে সহজ ও সাবলীল ভাষায় তার উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। পুস্তকে আলোচিত বিষয় ও তথ্যগুলি নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে সংগ্রহ করা হয়েছে। পুস্তকের শেষে প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী সংযোজিত হয়েছে।

এখানে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, পুস্তকের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, শিক্ষক বা শিক্ষিকাই 'শিক্ষা' নামক যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত; পুস্তক—শিক্ষক বা শিক্ষিকার বিকল্প নহে।

যাহাদের জন্য এই পুস্তকখানি রচিত, তাহারা যদি এই পুস্তক পাঠে কিছুমাত্র উপকৃত হয়, তবে শ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পরিশেষে, ভ্রম-প্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা প্রথম সুযোগেই দূর করার চেষ্টা করা হইবে।

কলিকাতা
৪ঠা জানুয়ারী ১৯৮৮

গ্রন্থকারদ্বয়

HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX

CHAPTER I: Geography and History—Chief physical features of the Indian subcontinent and its main ethnic elements—influence of Geography on History—the fundamental unity—source of ancient Indian History.

CHAPTER II: Dawn of Indian Civilization—Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of cultures—Harappan civilization—chief features, antiquity, extent, urban character, town planning—social, economic and religious life—relations with the outside world.

CHAPTER III: The Vedic Age—the Aryans, homeland, literary works—the Rig-veds—Vedic literature—Later Samhitas Brahmuns, Aranyaks, Upanishadas and Sutras—Social, economic, religious life and political and administrative activities of the Rig-Vedic Aryans—later developments—expansion of Vedic culture—beginning of Iron Age.

CHAPTER IV: Protest Movement—social, economic and religious causes of the movement—Jainism and Buddhism—lives and teachings of Mahavira and the Buddha.

CHAPTER V: The Age of Imperialism and Political Unification—Sixteen Mahajanapadas—rise of Magadha from Bimbisara to the Mauryas—Chandragupta—Asoka—invasions of India by foreigners—Persian invasion—Alexander's invasion and its effects reference to the rule of the Indo-Greeks, Sakas and Pahlavas—Social and economic condition under the Mauryas—history of the Kushanas—the Satvahana empire—history of the Gupta empire—Samudragupta—Chandragupta II—Fa-Hien—causes of the fall of the Gupta empire—Gupta culture.

CHAPTER VI: Struggle for Domination—North India—Hunas—rise of Gauda under Sasanka—Harsavardhana—Pratihara and Pala empires—tripartite struggle—important Pala and Sena rulers. Deccan—the early Chalukyas of Badami—Pulakesi II—the Rashtrakutas—South India—the Pallavas of Kanchi—the Cholas of Tanjore.

CHAPTER VII: (i) Social, economic and cultural life from the 7th century A.D. to the 12th century A.D. (ii) Commercial and cultural contacts with outside world.

CHAPTER VIII : Medieval India—the sultanate period——advent of Islam in India—Arab conquest of Sind—beginning of Muslim rule—foundation of the Delhi Sultanate—Khalji imperialism—Muhammad bin Tughluq—Firuz Tughluq—invasion of Timur—the Sayyids and Lodis.

CHAPTER IX : Rise of some Regional Powers—(i) Bengal (ii) Bahmani Kingdom, (iii) Vijaynagar empire. Impact of Islam on India during the Sultanate Period—Sufism—Bhakti cult——religious teachers—art, literature and culture.

CHAPTER X : The Mughal Age (1526—1707) : Origins of the Mughals—foundation of the Padshahi by Babar—Mughal-Afghan contest—Sher Shah—Akbar—Jahangir and Shah Jahan—Aurangzeb—activities of the European trading companies.

CHAPTER XI : India under the Mughals—political unification—administration—trade and industry—cultural life.

CHAPTER XII : Decline and disintegration of the Mughal empire—invasion of Nadir Shah and its effects—growth of regional powers—Bengal, Hydrabad, Mysore, Awadh, Sikhs and Marathas—third battle of Panipath—its impact.

CHAPTER XIII : Growth of European commerce and conflict among European Trading Companies—Anglo-French conflict in the Deccan—its results—causes of French failure. Growth of English East India Company's commerce and political power in Bengal till 1765. British Imperial Expansion—Marathas, Mysore, Subsidiary Alliance, Sikhs—annexation of the Punjab—Dalhousie and imperial expansion—novel features.

CHAPTER XIV : Administrative Foundations—growth of British political power till 1765—implications of Dewani and Dyarchy, Growth of centralisation—(Hastings to Cornwallis)—new judicial and police system—land revenue—three types of arrangements—their broad effects. Industry and Trade—the cultural scene—English education—social and cultural movements.

CHAPTER XV : Peasant unrest and uprisings—Wahabi and Farazi movements—Tribal movements—Kols and Santhals—The Revolt of 1857—causes, extent of popular participation—leadership and nature of the revolt.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

[প্রাচীন যুগ]

বিষয় পৃষ্ঠা

[মুঘল যুগ]

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড

[আধুনিক যুগ]

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

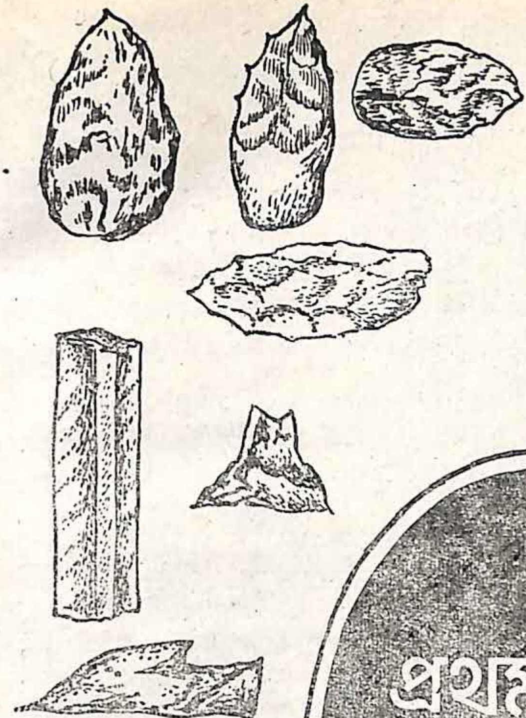
পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

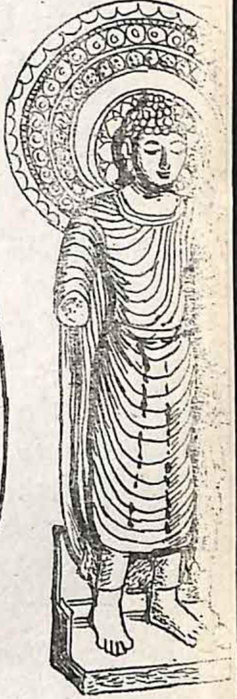
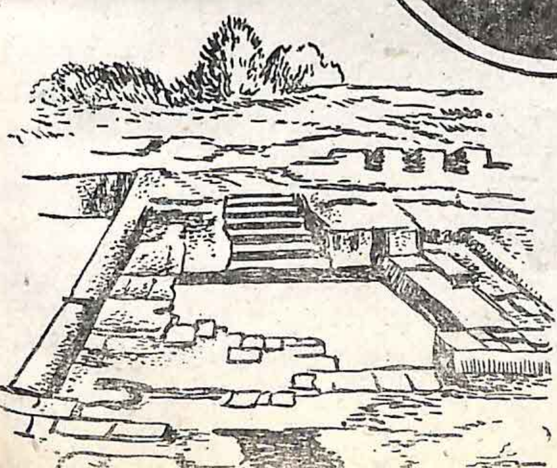
অষ্টম অধ্যায়

ইতিবৃত্তে
ভারত ও ভারতবাসী




প্রথম খণ্ড

প্রাচীন যুগ



১ ভূগোল এবং ইতিহাস
[Geography and History]

ভারত উপমহাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ইহার প্রধান প্রধান জনগোষ্ঠীর পরিচয়

[Chief Physical features of the Indian sub-continent and its main ethnic elements]

ভারত উপমহাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ঃ ভারতের ভূগোলের কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে তাহার ইতিহাসের মর্মানুধাবন সম্ভব নয়। ভারতীয় উপমহাদেশ পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ এই তিনটি স্বতন্ত্র দেশে বিভক্ত। ভারতবর্ষ ২৪টি অঙ্গরাজ্য এবং ৭টি ইউনিয়ন রাজ্য লইয়া গঠিত।

ভৌগোলিক সীমা

ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশই ক্রান্তীয় অঞ্চলে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট বিশাল উপদ্বীপ। উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে এবং উত্তর-পূর্বে হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পর্বতরাজি (যথা, উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বত এবং উত্তর-পূর্বে পাতকই লুসাই প্রভৃতি) ভারতবর্ষকে এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে পৃথক রাখিয়াছে। অপর তিনদিকে এই উপমহাদেশ সমূদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিভাগ

প্রাকৃতিক বিচারে ভারতবর্ষকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতল, (৩) মধ্যভারতের মালভূমি, (৪) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, (৫) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল। সাধারণভাবে, এই অঞ্চলগুলিকে 'আর্যাবর্ত' ও 'দাক্ষিণাত্য'—এই দুই নামে অভিহিত করা হয়। বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরাঞ্চল 'আর্যাবর্ত' নামে পরিচিত, আর দক্ষিণাঞ্চলকে বলা হয় 'দাক্ষিণাত্য'। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেও এইরূপ ভৌগোলিক ধারণার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন, পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্ধনকে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী 'সকলোত্তরাপথনাথ' অর্থাৎ আর্যাবর্তের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তেমনই দক্ষিণের সাতবাহন নরপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নিজেকে 'দক্ষিণাপথপতি' রূপে দাবি করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন অঞ্চলের আপেক্ষিক গুরুত্ব

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত কাশ্মীর কাঙ্গরা কুমায়ুন ও সিকিম-এর সহিত ভারতের সমতল বিভাগের এই যোগাযোগ সহজসাধ্য ছিল না বলিয়া ইহারা আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতলভূমি ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে ; তাহার কারণ, এই অঞ্চলেই প্রধানত ভারতীয় সংস্কৃতি ও

রাজনৈতিক ঐক্যের বিকাশ হয়। রাজনৈতিক মাপকাঠিতে মধ্যভারতের মালভূমি উত্তরাপথের সমতল বিভাগেরই একটি অংশ। দ্রাবিড় জাতি অধ্যুষিত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বিন্ধ্য-সাতপুরা এবং পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুদূর অতীতকাল হইতেই এই অঞ্চলে উত্তরাপথের রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার লাভ করে, কিন্তু আধুনিক কালে একমাত্র মারাঠা শক্তি ব্যতীত অন্য কোন শক্তিই উত্তর ভারতে ক্ষমতা-বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। 'সুদূর দক্ষিণের' ইতিহাসে দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবই সমধিক।

ভারতজনের প্রধান নৃতাত্ত্বিক উপাদান ঃ প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীতকাল হইতেই গিরিপথে ও সমুদ্রপথে বহু নরগোষ্ঠী আসিয়া "ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" মিলিয়াছে। মোটামুটি ছয়টি নরগোষ্ঠী লইয়া ভারতজন গঠিত। যেমন ঃ

১. **আদিম উপজাতি ঃ** আজ যাহারা কোল, ভীল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি উপজাতির লোক বলিয়া উপেক্ষিত, একদা তাঁহারাই ছিলেন এই ভারতের অধীশ্বর। ইহারা খর্বকায়, নিম্ন নাসা, কৃষ্ণবর্ণ এবং অষ্ট্রিক অর্থাৎ দক্ষিণী ভাষাভাষী। বাংলার যত দেশী শব্দ সবই ইহাদের দান। ইহারা প্রোটো-অষ্ট্রেলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিগোষ্ঠীর।

২. **নেগ্রিটো ঃ** আন্দামানের জারোয়া নরগোষ্ঠী নেগ্রিটো। তাহাদের চুল ভেড়ার পশমের মতো কুঞ্চিত, দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

৩. **দ্রাবিড় জাতি ঃ** দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালয়ালাম ভাষাভাষী লইয়া দ্রাবিড় নরগোষ্ঠী গঠিত।

৪. **মঙ্গোলয়েড ঃ** হরিদ্রাভ বর্ণ বিশিষ্ট, খর্ব নাসা, খর্ব দেহ ভুটিয়া, লেপচা, অহোম, খাসিয়া, নেপালী প্রভৃতি জনসমষ্টি মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত।

৫. **নর্ডিক গোষ্ঠী ঃ** ভারতীয় আর্যভাষাভাষী জনসমাজ নর্ডিক গোষ্ঠীভুক্ত। ভারতে আর্যদের আবির্ভাব খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে। তাঁহারা গৌরবর্ণ, দীর্ঘ দেহ উন্নত নাসা।

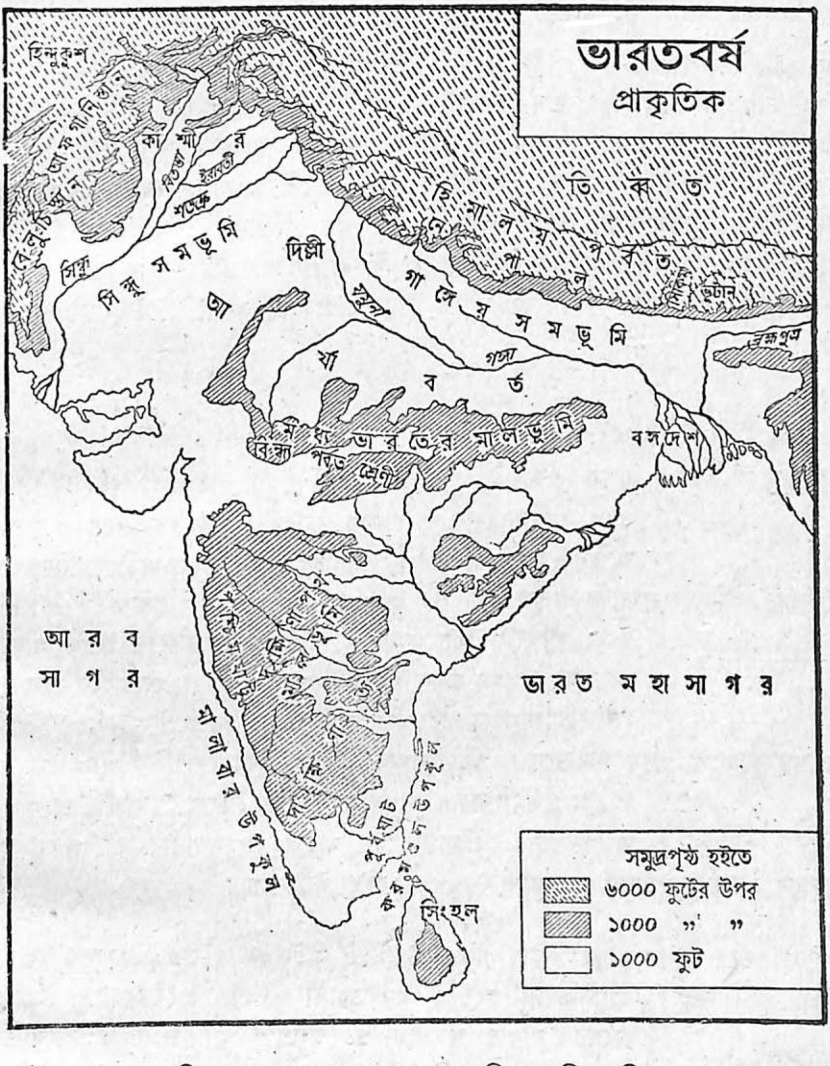
৬. **আলপাইন গোষ্ঠী ঃ** এই সকল জাতিগোষ্ঠী ব্যতীত আছে আলপাইন জনগোষ্ঠী। ইহারাও আদিম উপজাতি বিশেষ।

ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব
[Influence of Geography on History]

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব ঃ আসমুদ্রহিমাচল-বিস্তৃত এই উপমহাদেশ উহার ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। মহাকবি কালিদাস যাহাকে 'নগাধিরাজ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই হিমালয় দুর্লজ্ঘ্য প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ভারতবর্ষকে যেমন বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে, তেমনই আবার ভারতবর্ষের অর্থব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। হিমালয়ের বক্ষনিঃসৃত নদনদী ভারতবর্ষকে সুজলাসুফলা করিয়াছে। ভারত মুখ্যত

হিমালয়ের প্রভাব

কৃষিপ্রধান দেশ ও তার কৃষিব্যবস্থা বৃষ্টিপাতের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই বৃষ্টিপাতও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় হিমালয়ের দ্বারা।



উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া বিন্ধ্যপর্বত ভারতবর্ষের এই দুই অংশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাতন্ত্র্য বিধান করিয়াছে, ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর ভারতের কোন কোন শক্তিশালী রাজা দক্ষিণ ভারতে প্রভূত্ব বিস্তারে সমর্থ হইলেও কেহই সমগ্র ভারতব্যাপী স্থায়ী এবং ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই।

বিন্ধ্যপর্বতের প্রভাব

পর্বত ও সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় এই দেশে সমাজ ও সভ্যতা এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিন দিকে সমুদ্রবিধৌত হইলেও ভারত সামুদ্রিক বাণিজ্য ও নৌবলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। তাহার কারণ ভারতবর্ষের তটরেখা সুদীর্ঘ হইলেও বিশেষ অভগ্ন এবং তটরেখার আয়তনের তুলনায় স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও বন্দরের সংখ্যা কম। তাই বলিয়া ভারতবাসী নৌবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, একথা মনে করিলে ভুল হইবে। প্রাচীনকাল হইতেই তাহারা সমুদ্রপথে দূর দেশে পাড়ি জমাইতে অভ্যস্ত ছিল। গুপ্তযুগে এবং পরে চোল ও পাণ্ড্যদের আমলে, এদেশীয় নৃপতিগণ ভারত মহাসাগর অঞ্চলে যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। অবশ্য একথাও ঠিক যে নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা ভারতীয়রা করে নাই। তাই পরবর্তীকালে ইউরোপীয় বণিকদের সহিত সম্মুখ সংঘর্ষে ভারত আঁটিয়া উঠিতে সক্ষম হয় নাই।

সামুদ্রিক প্রভাব

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের সাহিত্য ও দর্শন একান্তই ভারতীয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত বিশেষভাবে আদান-প্রদান না থাকায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আপন অভিনবত্বে গড়িয়া উঠে। জলবায়ুর প্রভাব ভারতবাসীকে কিয়দংশে শ্রমবিমুখ করিলেও সম্পদের প্রাচুর্য তাহাকে জ্ঞানচর্চা ও শিল্পসাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ফলে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন অজ্ঞতার তিমিরে আচ্ছন্ন, ভারতবাসী তখন জ্ঞান সঞ্চয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া এক মহান সভ্যতার আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল। দেশের প্রাচুর্য অবশ্য বিদেশী আক্রমণকারীকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। হিমালয়ের গিরিপথ দিয়া পারসিক গ্রীক শক হূণ পাঠান ও মোগল এবং সমুদ্রপথে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছে। বহিরাগতদের সহিত এদেশবাসীর ভাবের আদান-প্রদানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছে।

স্বতন্ত্র সভ্যতা

জলবায়ু ও প্রাচুর্যের প্রভাব

বিদেশী আক্রমণ

ভারতবর্ষ আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া গড়িয়া উঠিলেও বহির্জগৎ হইতে যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, এমন নহে। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসী এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রাখিয়া চলিয়াছে। খাইবার বোলান প্রভৃতি গিরিপথ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও পণ্যদ্রব্য মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করিয়াছে। জলপথেও বহির্বিশ্বের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা যবদ্বীপ চম্পা কম্বোজ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করিয়াছিল।

বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ

মৌলিক ঐক্য

[The Fundamental Unity]

ভারতের বৈচিত্র্য ঃ বৈচিত্র্যের সমাবেশে গড়িয়া উঠিয়াছে এই ভারতভূমি। ইহার একদিকে যেমন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, অপরদিকে তেমন উত্তুঙ্গ পর্বতরাজি। দেশের অভ্যন্তরে একদিকে দেখা যায় অসংখ্য নদনদী ও বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর বা ঘন অরণ্যানী, অন্যদিকে ধু ধু করিতেছে বালুকাময় ঊষর মরুভূমি। এই বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশে মিলিত হইয়াছে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন জাতির লোক আসিয়াছে এই 'মহামানবের সাগর তীরে', বিলীন হইয়া গিয়াছে এই উপমহাদেশের সমাজবক্ষে। বাস্তবিকই আর্য ও অন্যান্য জাতির অপূর্ব এক মিলনক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। এককথায় ভারতবর্ষ যেন একটা 'নৃতত্ত্বের যাদুঘর' ('an ethnological museum')। বিভিন্ন যুগে এই সকল জাতির বিভিন্ন শাখা ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

জাতি বৈচিত্র্য

ভারতের বৈচিত্র্য শুধু প্রকৃতি ও জাতিগত নহে। ভাষা, ধর্মের দিক দিয়াও ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময়। ভাষা ও উপভাষার সংখ্যা এখানে দুই শতেরও বেশী। বস্তুত প্রত্যেক অঞ্চলেরই একটা নিজস্ব ভাষা আছে। মুসলমান ও ইউরোপীয়দের আগমনে ভারতের বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্ম সম্পর্কেও ঐ একই কথা। বহু ধর্মের সমাবেশ হইয়াছে এই দেশে। হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান জৈন বৌদ্ধ শিখ প্রভৃতি সকল ধর্মই এখানে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে একাধিক ধর্মীয় প্রথা প্রচলিত আছে।

ভাষা ও ধর্ম বৈচিত্র্য

বৈচিত্র্যের মধ্যে মৌলিক ঐক্য ঃ বিশাল আয়তন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভারতবর্ষ এক ও অভিন্ন। ভৌগোলিক বিভিন্নতা বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এই ঐক্যবোধের পথে অন্তরায় হয় নাই। ভারতবাসী যেন এক মৌলিক একতার বন্ধনে আবদ্ধ। ইহাকে শুধু রাজনৈতিক ঐক্যের ফল হিসাবে গণ্য করা যায় না।

প্রথমত, ভারতবর্ষ নামের মধ্যে একটা ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ভারতবর্ষ বলিতে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত একটি অখণ্ড ভূভাগের কথা মনে পড়ে। প্রাচীন ভৌগোলিকগণও যে ভারতের এই ভৌগোলিক অখণ্ডতার কথা সগর্বে উল্লেখ করিয়াছেন—বিষ্ণুপুরাণ তাহার সাক্ষ্য বহন করে। [উত্তরম্ যৎ সমুদ্রস্য/হিমাদ্রিশ্চৈব দক্ষিণম্। বর্ষম্ এব ভারতম্ নামা/ভারতী যত্র সন্ততি (বিষ্ণুপুরাণ)] ভৌগোলিক বৈচিত্র্য দেশের মাধুর্য বৃদ্ধি করিয়াছে, কিন্তু ঐক্যবোধ ক্ষুণ্ণ করে নাই।

সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা

সাংস্কৃতিক ঐক্য ঃ ভাষা ধর্ম আচার-আচরণ প্রভৃতি সকল বিষয়ে ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ-পরিহিত জনসমষ্টি অধ্যুষিত এই দেশ। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে যে ঐক্যবোধ,

সেটি ভারতবর্ষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। "নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের" মধ্যে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য গঠনে অবিসম্বাদী প্রভাব রহিয়াছে সংস্কৃত ভাষার। ভারতের ঐতিহ্যময় যত মহাকাব্য তা আসমুদ্র হিমাচলে শাশ্বত জ্ঞান বিতরণ করিয়া চলিয়াছে। ঐ সংস্কৃত হইতেই কালক্রমে যত বিভিন্ন ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার প্রভাব

সংস্কৃতের ন্যায় মুঘল যুগে সারা ভারতে উর্দু ভাষা এবং পরবর্তীকালে ইংরাজীও জনচেতনায় ঐক্যের প্রতীক হইয়া রহিয়াছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা উত্তরের বিভিন্ন অঞ্চলব্যাপী তীর্থ পরিক্রমার সহিত দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থ যাত্রায় উভয় অঞ্চলের মানুষের চেতনার একাত্মতার সঞ্চার ঘটিয়াছে। পূজা ও নানা শুভকার্যে গঙ্গা যমুনার সহিত গোদাবরী কাবেরী নর্মদার জল লইতে হয়। তাহাও ঐক্য সঞ্চারক।

হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব

দীর্ঘকাল ভারতের দুই বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করায় একটি সমোচ্চারিত জীবনধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। বস্তুত ভারতবর্ষের ঐক্যবোধ তাহার আদর্শগত এবং সংস্কৃতিগত। কোন রাজনৈতিক প্রভাবে বা বহিরাগত চাপে সে ঐক্য সৃষ্টি হয় নাই। বহুর মধ্যে একের সন্ধান এবং বিরোধের মধ্যে সমন্বয়সাধনই ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল সূত্র।

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন

রাজনৈতিক ঐক্য ঃ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা সুপ্রাচীন। সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ একসময় ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। মৌর্য, গুপ্ত, পাঠান, মোগল এবং পরিশেষে ব্রিটিশশক্তি ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াসী হইয়াছিল। 'একরাট', 'রাজচক্রবর্তী', 'সম্রাট' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ আমলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে একই শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঐক্যবোধ দৃঢ়তর হইয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় ভারতব্যাপী যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের পথ সুগম হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতবর্ষের একাংশ লইয়া পাকিস্তান গঠিত হওয়ায় ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান নামে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেও পূর্বতন দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারত লইয়া ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন বিশ্বের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়া ভারতীয় ইউনিয়ন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনার উপাদান

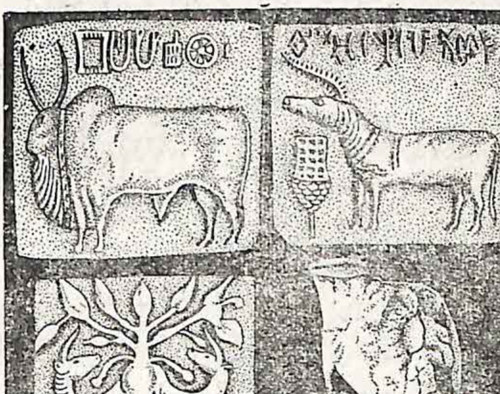
[Sources of Ancient Indian History]

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য বর্তমান কালের গবেষকগণকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বিভিন্ন লিপি ও তাম্রশাসন, মুদ্রা, শিল্পকলার নিদর্শন, ধর্মীয় ও অন্যান্য সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ প্রভৃতি উপাদানের উপর নির্ভর করিতে হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঃ প্রাচীন যুগের ভারতীয়রা অসংখ্য জিনিসপত্রের ধ্বংসাবশেষ রাখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের প্রস্তর-মন্দিরগুলি, পূর্ব ভারতের পোড়া ইটের মঠগুলি এখনও অতীতের বস্তুনির্মাণের কার্যক্রমের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ধ্বংসাবশেষগুলির রেডিও-কার্বন পরীক্ষায় নির্মাণের তারিখ এবং গাছগাছড়ার অবশেষ হইতে তৎকালীন জল-বায়ু ও উদ্ভিজ্জ জগতের পরিচয় পাওয়া যায়। ধাতুদ্রব্যাদি পরীক্ষা দ্বারা তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ইতিহাস রচনা সম্ভব। জীবজন্তুর হাড়গোড় পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় সেগুলি গৃহপালিত কিংবা বন্য। এই সকল প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান। এইভাবেই আবিষ্কৃত হইয়াছে ২৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার সভ্যতা সম্বন্ধে ইতিহাস। এই ইতিহাস রচনা সম্ভব হওয়ায় ভারতের ইতিহাসে এক অজ্ঞাতপূর্ব অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। তেমনি খনন ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গিয়াছে রাজস্থান ও কাশ্মীর ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে চাষের প্রচলন ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অপর একটি অঙ্গ হইতেছে খনন বা আবিষ্কারের ফলে প্রাপ্ত স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের প্রমাণ। অতীতের মন্দির, স্তূপ, মঠ ইত্যাদি হইতে সমসাময়িক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়। যেমন—সাঁচী, তক্ষশীলা, নালন্দা, রাজগীর এবং অজন্তার গুহা চিত্রাবলী।

বিভিন্ন লিপি ও তাম্রশাসন ঃ প্রাচীনকালে রাজারা প্রস্তরগাত্রে, তাম্র বা ব্রোঞ্জ নির্মিত ফলকে তাঁহাদের আদেশ, নির্দেশ এবং দানপত্র ও কীর্তি খোদিত করিয়া রাখিতেন। সে সকলই প্রাচীন ইতিহাসের অমূল্য সাক্ষর। উদাহরণ-স্বরূপ অশোকের শিলালিপির উল্লেখ করা যায়। সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয় কাহিনী এলাহাবাদের এক স্তম্ভগাত্রে খোদিত ছিল। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'র রচয়িতার নাম হরিষেণ। এই লিপিগুলি সংস্কৃত প্রাকৃত তামিল প্রভৃতি ভাষায় পাওয়া যায়। সাধারণত ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী—এই দুই প্রকার লিপি ব্যবহৃত হইত।



প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (সিন্ধু সভ্যতা)

ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল তাম্রশাসনে রাজবংশের পরিচয়, রাজ্য বা সাম্রাজ্যের সীমা প্রভৃতি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

মুদ্রা ঃ মুদ্রার সাহায্যে অনেক রাজার নাম, রাজত্বকাল, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা

প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ করা যায়। ভারতের বহ্লীক (ব্যাকট্রিয়া) দেশীয় গ্রীকদের ইতিহাস রচনার একমাত্র উপাদান হইল মুদ্রা। অনেক সময় ব্যবসায়ী গিল্ড মুদ্রা প্রচলন করে। তাহাতেই সমসাময়িক সমাজে ব্যবসায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কখনো কখনো মুদ্রায় যে সকল দেবদেবীর মূর্তি খোদিত থাকে, তাহা রাজার ধর্মমত সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে। অনেক মুদ্রায় রাজার প্রতিকৃতি থাকে। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত প্রতিকৃতির উল্লেখ করা চলে। ইহা ছাড়া, একই ধরনের মুদ্রা বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেলে ঐ সকল অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের অস্তিত্ব বা ঐ সকল অঞ্চল এক শাসকের অধীন ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

ধর্মীয় ও অন্যান্য সাহিত্য ঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় অপর এক অপরিহার্য উপকরণ সেই যুগে রচিত ধর্মীয় ও অন্যান্য সাহিত্য। বৈদিক যুগ সম্বন্ধে ইতিহাস রচনার শ্রেষ্ঠ উপাদান বৈদিক সাহিত্য। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ হইতে এই দুই ধর্ম এবং তৎকালীন ভারত সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' প্রভৃতিতেও ইতিহাসের প্রচুর উপাদান রহিয়াছে। তৎকালীন ঐতিহাসিক কাব্যগুলি ইতিহাস-রচনার কার্যে বিশেষ সহায়ক। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত", কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী', বাক্‌পতি রচিত 'গৌড়বহ' সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' প্রভৃতি কাব্য হইতেও ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

বৈদেশিকদের বিবরণ ঃ বৈদেশিকদের বিবরণ ব্যতীত প্রাচীন ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। গ্রীক, চৈনিক ও আরবীয় লেখক এবং পর্যটকদের বিবরণ হইতে ইতিহাস রচনার মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ভারতে না আসিলেও পারসিকগণ কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত-বিজয় সম্পর্কে নানা বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামক একজন গ্রীকদূত 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থে তৎকালীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মৌর্য যুগের ইতিহাস রচনায় এই গ্রন্থের গুরুত্ব অত্যধিক। কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখকের "পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী" (*Periplus of the Erythrean Sea*) নামক গ্রন্থখানিও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার এক প্রয়োজনীয় উপকরণ।

গ্রীক

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার অমূল্য সম্পদ। ফা-হিয়েনের বিবরণ ব্যতীত গুপ্তযুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা অসম্ভব। তেমনিই হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার পক্ষে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ এক অপরিহার্য উপাদান। আরবীয় লেখকদের মধ্যে অলবিরুণীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করা যায়।

চৈনিক

আরবীয়

১

ভারত-সভ্যতার উদয়
[Dawn of Indian Civilisation]

পুরা প্রস্তর, মধ্য প্রস্তর ও নব্য প্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির স্তর-বিন্যাস

[Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of Cultures]

পুরা প্রস্তর যুগ ঃ ভারতে মানব বসতির আরম্ভ মোটামুটি ২,০০,০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ হইতে। তাহারা ব্যবহার করিত অমসৃণ পাথুরে যন্ত্রপাতি—যা অজস্র পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ-ভারতে এবং বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সোয়ান উপত্যকায়। ইহা পুরা প্রস্তর যুগ। পুরা প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি, হাতিয়ারের সন্ধান মিলিয়াছে কাশ্মীরে। এই যুগের মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রহকারী। ৮০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত একটানা চলিয়াছিল পুরা প্রস্তর যুগের দাপট।

মধ্য প্রস্তর যুগ ঃ মধ্য প্রস্তর যুগে (৮০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে) জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও শুষ্ক হইতে থাকে। তাহার ফলে জীবজন্তু ও গাছপালাতেও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ভারতের ক্ষেত্রে এ যুগের আরম্ভ হয় ৮০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ এবং শেষ হয় ৪০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। এ যুগের বিশিষ্ট যন্ত্রপাতিই হইল ক্ষুদে পাথুরিয়া। ছোটনাগপুর ও কৃষ্ণা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর মধ্য প্রস্তর যুগের নিদর্শন আছে।

নব্য প্রস্তর যুগ ঃ পৃথিবীর অন্যত্র নব্য প্রস্তর যুগের আরম্ভ ৭০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ হইলেও ভারতে ৫০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের আগে ঘটে নাই। এ যুগের লোকেরা মসৃণ পাথুরে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত। বিশেষ করিয়া তাহারা ব্যবহার করিত পাথুরে কুঠার। ভারতের বহু অঞ্চলেই তাহার সন্ধান মিলিয়াছে। নব্য প্রস্তর যুগের একটি উপনিবেশ ছিল কাশ্মীরের শ্রীনগরের ২০ কি.মি. দূরে বুরঝাহোম্-এ। মালভূমির মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া লোক সেখানে বাস করিত। পরবর্তীকালের মানুষ কৃষিকার্য করিত, আগুনের ব্যবহার জানিত, পশুপালন করিত, এমনকি মাটির পাত্রও তৈয়ারী করিতে পারিত। তাহারা গুহায় বাস করিলেও দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকিয়া উহাকে সুসজ্জিত করিত। চাল, গম, যব প্রভৃতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শস্য নব্য প্রস্তর যুগেই ভারতে উৎপন্ন হইত। কৃষি কাজের সঙ্গে কিছু কিছু গ্রামও তখন ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। নব্য প্রস্তর যুগের জনগণ যেন সভ্যতার চৌকাঠে আসিয়া পৌছিয়াছিল।

তবে প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনের অগ্রগতির পথে কতকগুলি বাধা ছিল। পাথুরে যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ারের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় তাহারা পাহাড় হইতে বেশী দূরে যাইতে পারিত না। জলের জন্য তাহাদের কেবলমাত্র নদী উপত্যকাতেই উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইত। তাহা ব্যতীত শত চেষ্টা করিলেও তাহারা নিতান্ত অন্নসংস্থানের অপেক্ষা উদ্বৃত্ত কিছু উৎপাদন করিতে পারিত না।

হরপ্পা সভ্যতা (তাম্র-প্রস্তর যুগ)
[Harappan Civilisation (Chalcolithic)]

ভারতে তাম্র-প্রস্তর ও তাম্র যুগ ঃ নব্য প্রস্তর যুগের শেষে ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম যে-ধাতু ব্যবহৃত হয় তাহা ছিল তাম্র এবং তাম্র ও প্রস্তরের ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া বেশ কয়েকটি সভ্যতার ভিত্তি গড়িয়া ওঠে। ভারতের মধ্যে রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্ব ভারতেও প্রাচীনতম তাম্র-প্রস্তর যুগের উপনিবেশের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল।

তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির পরিচয় মেলে তাহাদের ব্যবহৃত ছোট ছোট যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার থেকে। তামায় জোড়া দেওয়া হইত পাথরের ফলা। কোথাও কোথাও তামার ব্যবহার হইত।

তাম্র-প্রস্তর যুগের লোক লাল-কালো রঙের মিশ্রণে নির্মিত বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের লোকেরা পশুপালন ও খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে শিখিয়াছিল। বিহার ও পশ্চিমবাংলায় মাছ ধরিবার বড়শি পাওয়া গিয়াছে।

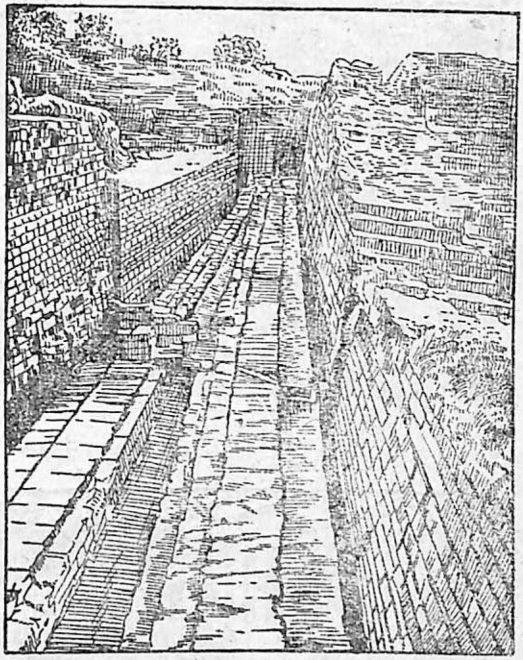
ভারতের তাম্র যুগের আরম্ভ হয় মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের উর্ধ্বাঞ্চলে তাম্র যুগ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। তাম্র যুগের জনগণ ছিলেন হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক এবং তাম্র যুগের গৈরিক রঙের মৃৎ পাত্রের অঞ্চল হইতে তাহাদের অবস্থানও বেশী দূরের নহে। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ঐ সমস্ত তাম্র-ব্যবহারকারী ও ব্রোঞ্জ-ব্যবহারকারী হরপ্পাবাসীদের মধ্যে হয়ত নিয়মিত নানা সাংস্কৃতিক লেনদেন হইত।

হরপ্পা সভ্যতা ঃ প্রধান প্রধান বিশেষত্ব ঃ আবিষ্কার ঃ সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা ভারতের তাম্র-প্রস্তর যুগের আগের সভ্যতা। তবে এ সভ্যতা অনেক বেশী উন্নত। ইহার উদ্ভব ঘটিয়াছিল ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে। সভ্যতাটির এই নামকরণের কারণ ; ১৯২১ সালে দয়ারাম সাহনী বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাবের পশ্চিমে হরপ্পার উপনিবেশ আবিষ্কার করেন। তাহা হইতেই হরপ্পা সভ্যতার নামকরণ হইয়াছে। প্রায় ঐ সময়েই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জিলার মহেঞ্জোদড়ো উপনিবেশটির সন্ধান পান।

সভ্যতার বিস্তৃতি ঃ হরপ্পা সংস্কৃতি পাঞ্জাবের সিন্ধু, বেলুচিস্তান, গুজরাটের এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিমে রাজস্থানের কিছু অংশ জুড়িয়া প্রচলিত ছিল। উত্তরে জম্মু হইতে দক্ষিণে নর্মদা মোহনা, পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মক্রান উপকূল হইতে উত্তর-পূর্বে মীরাট পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র আয়তনটি একটি ত্রিভুজাকার ও তাহার পরিমাপ ১,২৩,৯০০ বর্গ-কি মি.। সমগ্র পাকিস্তান হইতেও ইহার প্রসার বেশী ও প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া কোন সভ্যতাই এত সুদূর ব্যাপ্ত ছিল না। প্রায় ২৫০টি হরপ্পা সংস্কৃতি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইলেও সর্বপ্রধান দুইটি হইতেছে **হরপ্পা** এবং **মহেঞ্জোদড়ো**। তৃতীয়টি মহেঞ্জোদড়োর ১৩০ কি.মি. দূরে অবস্থিত **চানহুদাড়ো,** চতুর্থটি গুজরাটের কাম্বে উপসাগরের শীর্ষে **লোথাল,** পঞ্চমটি উত্তর রাজস্থানের **কালিবঙ্গান,** ষষ্ঠটি হইতেছে

হরিয়ানার হিসার জিলার অন্তর্গত **বানওয়ালি**। পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতির উপনিবেশ রহিয়াছে গুজরাটের কাথিওয়াড় উপদ্বীপে **রংপুর** ও **রোজদিতে**।

প্রাচীনত্ব ঃ এই আবিষ্কারের ফলে আর্য সভ্যতা (আনুমানিক ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) যে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা নহে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকায় যে সকল শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে তাহার লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নাই। তবে ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া ঐতিহাসিকগণ এইমত পোষণ করেন যে সিন্ধু সভ্যতা লৌহ যুগের পূর্বে বিকশিত হইয়াছিল। সম্ভবত খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই হইতে তিন হাজার বৎসর পূর্বে এই সভ্যতার বিকাশ হয়। পূর্বে আমাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে মিশর ব্যাবিলোনিয়া অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি স্থানে মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটে। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় খননকার্যের ফলে যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা-সমূহের অন্যতম ও প্রায় সমকালীন।

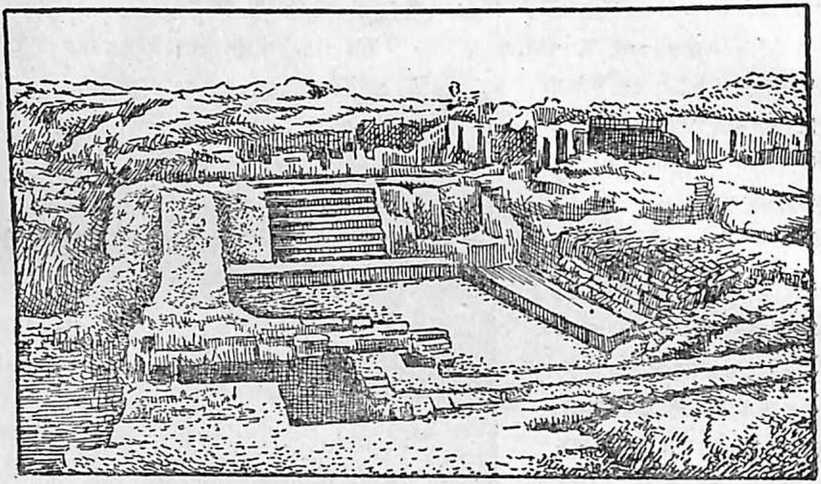


মহেঞ্জোদড়োর পয়ঃপ্রণালী

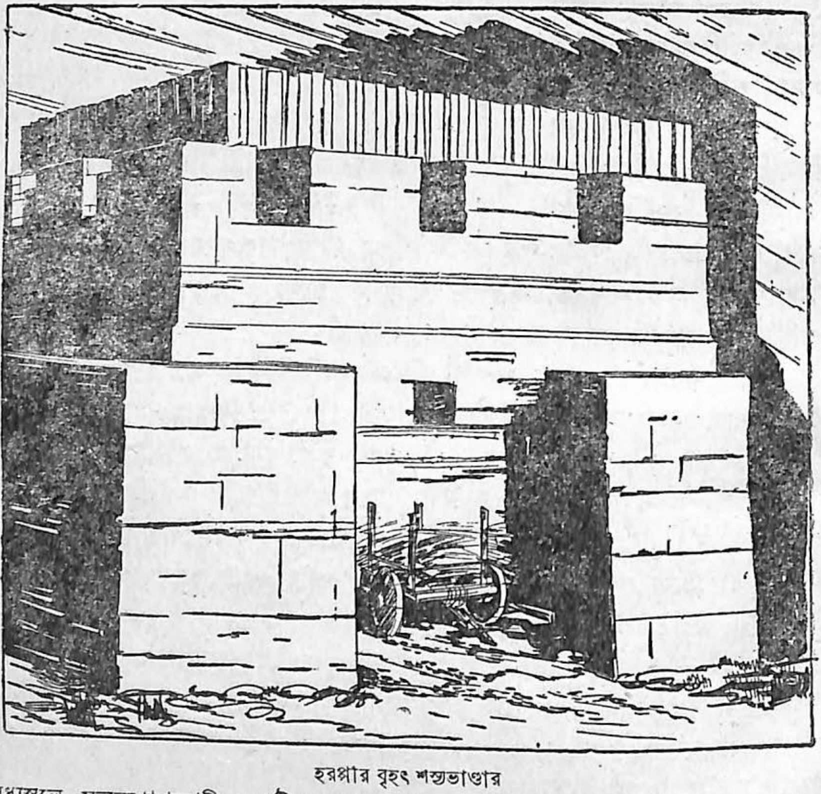
নগর সভ্যতা ঃ সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগরভিত্তিক। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অতি সুপরিকল্পিত উপায়ে এই নগর দুইটি নির্মিত হইয়াছিল। প্রশস্ত ও সমান্তরাল ছোট-বড় রাস্তা মহেঞ্জোদড়ো নগরটিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। রাস্তার পার্শ্বে ছিল জল-নিকাশের জন্য পয়ঃপ্রণালী। বাসগৃহগুলি দ্বিতল বা ততোধিক উচ্চ ছিল। সুপরিসর অট্টালিকার অস্তিত্বের প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। প্রতিটি দালানের দেওয়াল ও মেঝে ছিল অতি মসৃণ। গৃহনির্মাণে আগুনে-পোড়ানো ইট ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেক বাড়িতে কূপ ও বাঁধানো উঠান ছিল। এমনকি অনেক বাসগৃহে স্নানাগারও ছিল। একটি প্রকাণ্ড হলঘরের ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত সভাসমিতি বা প্রার্থনাগৃহরূপে ইহা ব্যবহৃত হইত। হরপ্পায় একটি বৃহৎ শস্যভাণ্ডারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নগর পরিকল্পনা

মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত এক বিশাল স্নানাগার পরম বিস্ময়ের বস্তু। এই স্নানাগারের



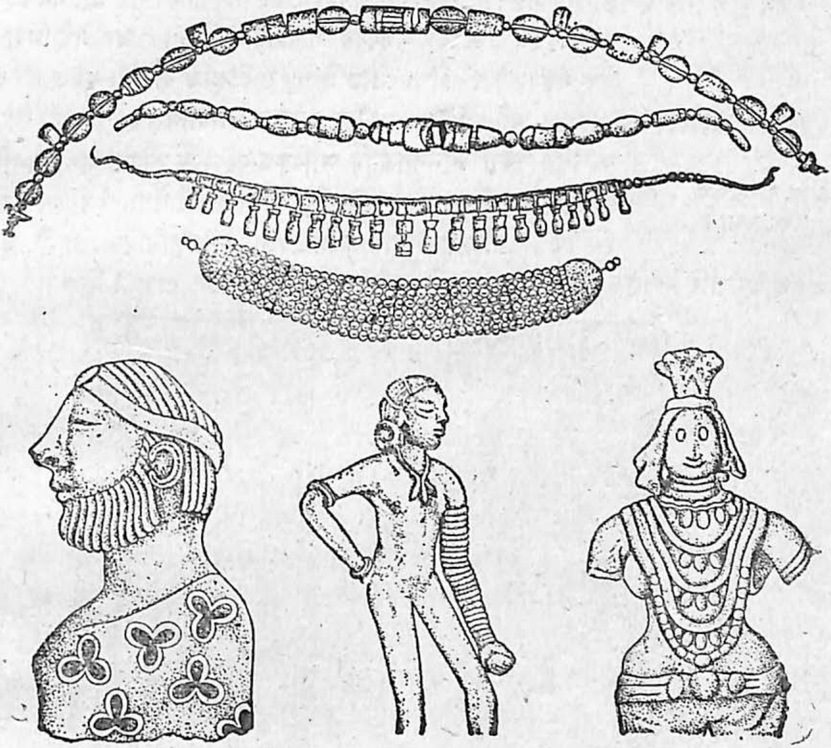
মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার



হরপ্পার বৃহৎ শস্যভাণ্ডার

মধ্যস্থলে সন্তরণোপযোগী একটি জলাধার আছে। উহার দৈর্ঘ্য ৩৯ ফুট, প্রস্থ ২৪ ফুট ও

গভীরতা ৮ ফুট। এই জলাধারকে জলপূর্ণ করিবার এবং ইহা হইতে জল নিষ্কাশনের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। দর্শকের জন্য আধুনিক ধরনের 'গ্যালারি' এবং বস্ত্রাদি পরিবর্তনের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ ছিল।



অধিবাসী ঃ এই নগর যাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহাদের পরিচয় এবং জীবনযাত্রা সম্বন্ধে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে। আবিষ্কৃত তথ্যাদি হইতে অধিবাসিগণ কোন্ শ্রেণীভুক্ত ছিল, তাহা সঠিক নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন দ্রাবিড়গণই এই সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এখানে প্রাপ্ত নরকঙ্কালের গঠন-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া নৃতত্ত্ববিদ্গণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই অঞ্চলে যাহারা বাস করিত তাহারা ছিল বিভিন্ন জাতিভুক্ত। হয়ত ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এই অঞ্চলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং তাহাদের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল এই সুপ্রাচীন সভ্যতা।

অধিবাসী

সমাজ জীবন ঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন হইতে অধিবাসীদের জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

এই অঞ্চলে অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল সম্ভবত গম যব দুগ্ধ এবং খর্জুর জাতীয় ফল। তাহারা মাছমাংসও খাইত। এই অঞ্চলে যে সকল জীবজন্তুর প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত

হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় মেষ বৃষ গর্দভ উট হস্তী কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুর সহিত তাহারা পরিচিত ছিল। কিন্তু অশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আছে। এই সকল জীবজন্তুর অধিকাংশই ছিল গৃহপালিত।

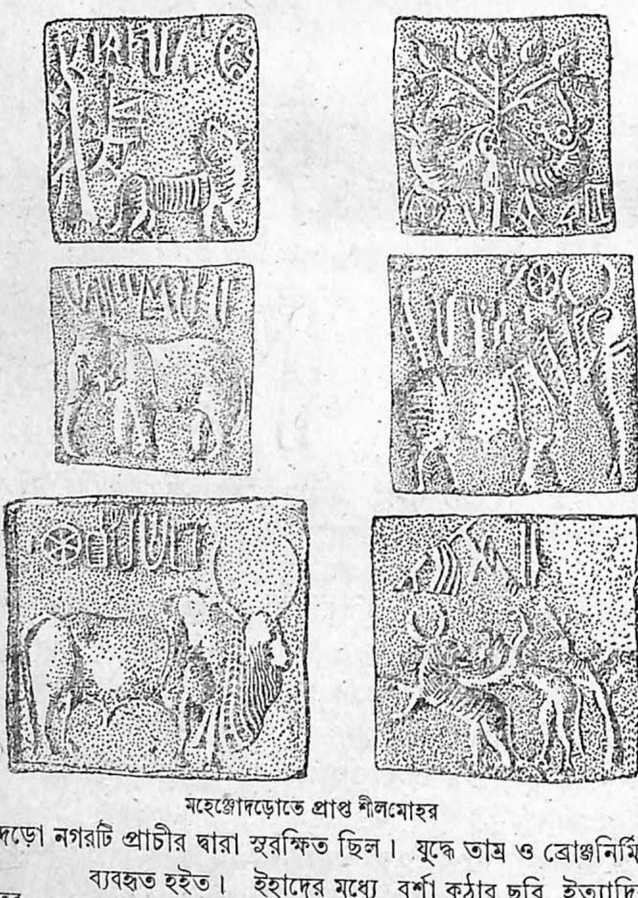
খাদ্য

পোশাক-পরিচ্ছদ

সে যুগে সিন্ধু উপত্যকায় সম্ভবত সূতী ও পশমী উভয় প্রকার বস্ত্রেরই প্রচলন ছিল। নারী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার ব্যবহার করিত। অলঙ্কার নির্মাণের জন্য সম্ভবত স্বর্ণ রৌপ্য ব্রোঞ্জ হস্তিদন্ত প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার অধিবাসীদের আর্থিক সচ্ছলতা প্রমাণিত হয়। খননকার্যের

নিত্য ব্যবহার্য ও শৌখিন দ্রব্যাদি

ফলে যে সকল জিনিসপত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে নানাবিধ পাত্র পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি তাম্র ব্রোঞ্জ রৌপ্য বা মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত। লৌহের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। ধাতুনির্মিত চিরুনী, ছুরি, কাস্তে ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত। আসবাবপত্র এবং খেলনারও বহুল প্রচলন ছিল।



মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত শীলমোহর

অস্ত্রশস্ত্র: ধাতুর ব্যবহার

মহেঞ্জোদড়ো নগরটি প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। যুদ্ধে তাম্র ও ব্রোঞ্জনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহাদের মধ্যে বর্শা কুঠার ছুরি ইত্যাদির প্রচলনই বেশী ছিল। প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রও ব্যবহৃত হইত। তীর-ধনুকের ব্যবহারও অজ্ঞাত ছিল না, তবে তরবারির অস্তিত্ব ছিল না।

অর্থনৈতিক জীবন : কৃষিকার্য পশুপালন ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পকার্য এখানকার অধিবাসীদের জীবিকা ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। শীলমোহর ও অন্যান্য উপাদান হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে দূর দেশেও যাতায়াত করিত বলিয়া মনে হয়। মৃৎশিল্প বয়নশিল্প ভাস্কর্য ও ধাতুশিল্পের নানা নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ সকলই উন্নত ধরনের অর্থনীতি ও শিল্পকার্যের পরিচয় বহন করে।

অধিবাসীদের জীবিকা

ধর্মীয় জীবন : মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার তৎকালীন অধিবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় নাই। সম্ভবত মন্দির বা চৈত্য নির্মাণের প্রথা ছিল। শীলমোহরে খোদিত মূর্তি দেখিয়া ইহাদের মধ্যে যে দেবপূজার প্রচলন ছিল তাহা অনুমান করা যায়। সম্ভবত মাতৃকাপূজার প্রচলনই বেশী ছিল। সিন্ধুবাসিগণের মধ্যে বৃক্ষ বৃষ প্রস্তর সর্প এবং বিভিন্ন পশুপক্ষীর পূজা প্রচলিত চিল। মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত একটি মূর্তি পশুপতি শিবের আদিরূপ। লিঙ্গ পূজারও প্রচলন ছিল। মৃতদেহ দাহ ও সমাহিত করা—উভয় প্রথাই অনুসৃত হইত।

ধর্ম

যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা একাধিকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্লাবন ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এবং আর্যদের আক্রমণের প্রকোপে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকদের অনুমান।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের সম্ভাব্য কারণ

অন্যান্য সভ্যতার সহিত সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্ক : পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত দু-একটি শীলমোহরের নিদর্শন হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন মিশরীয় বা অ্যাসিরীয় ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সহিত সিন্ধু সভ্যতার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে কোন্ সভ্যতা প্রাচীনতর বা কোন্ সভ্যতা অপর সভ্যতার নিকট কতটা ঋণী তাহা সঠিক নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, প্রাচীন সভ্যতাগুলি ছিল নদীমাতৃক এবং সিন্ধু সভ্যতার মতো অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনের সভ্যতাও ছিল নগরভিত্তিক। হরপ্পার লক্ষণীয় বিষয় হইল পোড়া ইটের দালান। কারণ, সমসাময়িক মিশরীয় সভ্যতায় ব্যবহৃত হইত রোদে শুকানো ইট। মেসোপটেমিয়াতে পোড়ানো ইট ব্যবহৃত হইলেও তাদের ব্যবহার ছিল অনেক কম। হরপ্পা সভ্যতাতে জল-নিষ্কাশনের যে অপূর্ব ব্যবস্থা ছিল, সেইরূপ নিকাশী ব্যবস্থা সমসাময়িক অন্য কোথাও ছিল না। চক্রযান আবিষ্কার ও কৃষিতে লাঙ্গল ব্যবহার হরপ্পা সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তুলার চাষও সমসাময়িক সভ্যতাদের মধ্যে হরপ্পা উপনিবেশেই প্রথম হয়। মেসোপটে-মিয়াতে হরপ্পার মতো হাতী পোষা বা চাল উৎপাদন হইত না। আফগানিস্তান হইতে আমদানী হইত সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তর। মিশর মেসোপটেমিয়ার তুলনায় হরপ্পা সংস্কৃতির কোন উপনিবেশেই দেবমন্দির আবিষ্কৃত হয় নাই। হরপ্পা সংস্কৃতির লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নাই এবং তাহাও মিশর, মেসোপটেমিয়ার লিপি হইতে বিভিন্ন। হরপ্পা সভ্যতার বিস্তারও ছিল সমসাময়িক সকল সভ্যতা অপেক্ষা অধিক।

পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতাগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

৩ বৈদিক যুগ
[The Vedic Age]

আর্যগণ
[The Aryans]

আর্য জাতি ঃ হরপ্পা সভ্যতার পরে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা **আর্য** বা **বৈদিক** সভ্যতা নামে অভিহিত। তাহারা ভারতের বহু স্থানে, ইউরোপ. ইরান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষায় কথা কহিত। তাহাদের প্রাচীনতম জীবনধারা ছিল সম্ভবত রাখালিয়া। কৃষিকার্য ছিল তাহাদের নিকট অপ্রধান। তাহারা স্থিতিশীল জীবন-যাপন না করায় কোনও অঞ্চল ছাড়িয়া গেলে অতীত জীবনের কোন স্মৃতি-চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। তাহারা দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট; অশ্বারোহণে পটু।

আদি বসতি ঃ ইন্দো-ইওরোপীয় জাতিগোষ্ঠীদের কথায় একই রকম গাছ-গাছড়া, ও জীব-জন্তুর কিছু কথা খুঁজিয়া পাওয়ায় ভারতের আর্যদের আদি বাসস্থানকে ইওরোপ-রাশিয়ার উরাল পর্বতমালার দক্ষিণে **কিরঘিজ** অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতের মত হইলেও আর একদল পণ্ডিতের মতে আর্যরা বিদেশীয় নহে, তাঁহারা মূলতান অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়। তবে এমত বহুজন গ্রাহ্য নয়। আর্যগণ সম্ভবত এশিয়া মাইনরের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের আগমনের সঠিক সময় নিরূপণ সম্ভব হয় নাই। এশিয়া মাইনরে বোঘাজ-কোই নামক স্থানে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে ঋগ্‌বেদ বর্ণিত অনুরূপ দেবদেবীর উল্লেখ রহিয়াছে; ইহা হইতে অনুমিত হয়, ঐ পথেই আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই শিলালিপি ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে লিখিত বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতে আর্যদের ভারতে আগমনের সময় নিরূপণ সম্ভব হয়। ঋগ্‌বেদের রচনাকাল হইতে আর্যদের ভারতে আগমনের সময় নিরূপণ করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন, আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ হইতে ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে আর্যগণ ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

ভারতে আর্যদের প্রথম সাহিত্যকৃতি
[The first literary work of the Aryans in India]

ঋগ্‌বেদ ঃ ভারতে আসিয়া আর্যগণ যেখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তাহা **সপ্তসিন্ধু** নামে অভিহিত। এখানেই তাঁহারা প্রথম শ্রুতি সাহিত্য **ঋগ্‌বেদ** রচনা করেন। ঋগ্‌বেদই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় যে, সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় বিভিন্ন কালে দলে দলে বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। তখন তাহাদের যেমন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত, তেমন অন্যান্য আর্যগোষ্ঠীদের

সহিত। ঋগ্বেদে ইন্দ্র 'পুরন্দর' নামে পরিচিত। তিনি ভীষণ যুদ্ধে বহু দুর্গ ধ্বংস করেন ; তাহা হরপ্পাবাসীদেরও দুর্গ হইতে পারে। আর্যদের মধ্যে প্রধান দুটি গোষ্ঠী ছিল **ভরত** এবং **ত্রিৎসু**। ভরতবংশীয়দের সহিত দশরাজার ভীষণ যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে ভরত জয়ী হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদ হইতেই প্রাচীন আর্যদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়। বেদ আর্য-মনীষার এক অপূর্ব বিকাশ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। হিন্দুদের বিশ্বাস বেদ অপৌরুষেয়—ইহা ঈশ্বরের বাণী, কাহারও রচনা নহে। গুরুশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে ইহা প্রচলিত ছিল। তাই বেদের অপর এক নাম 'শ্রুতি'।

বৈদিক সাহিত্যের চারিভাগ : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে চারি ভাগে ভাগ করা যায় : সংহিতা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা অংশে যাগযজ্ঞাদির মন্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অংশ পদ্যে রচিত। বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে এই মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। সংহিতার মন্ত্রগুলি আবার চারি ভাগে বিভক্ত : (১) ঋগ্বেদ (২) সামবেদ (৩) যজুর্বেদ ও (৪) অথর্ব বেদ। ঋগ্বেদে উষাস্তব ও সৃষ্টি স্তোত্র অতি বিখ্যাত। অথর্ববেদে আছে ভেষজ বিষয় এবং যাদুমন্ত্র।

ব্রাহ্মণ অংশে যাগযজ্ঞাদির আচার-অনুষ্ঠান গদ্যে রচিত হইয়াছে। আরণ্যক অংশে গৃহত্যাগী অরণ্যবাসীদের ধর্মজীবন যাপন ও উপাসনার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আর্য মনীষিগণের দার্শনিক চিন্তাধারার পরিণত রূপ হইল উপনিষদগুলি। প্রায় শতাধিক উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক সাহিত্যের নির্ভুল আলোচনা ও সম্যক্ অবগতির জন্য বেদাঙ্গের সৃষ্টি।

বেদাঙ্গ

বেদাঙ্গের ছয়টি অঙ্গ বা ভাগ : শিক্ষা (উচ্চারণ-পদ্ধতি), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দে ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ (গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিষয়ক আলোচনা) ও কল্প (ধর্মীয় রীতিনীতি-বিষয়ক বিচার)।

ষড়্‌দর্শন : বেদান্ত দর্শন

উপনিষদের অনুকরণে পরবর্তীকালে ষড়্‌দর্শন রচিত হয়। এই ষড়্‌দর্শন বা ছয়টি দর্শন হইল : (১) সংখ্যা (২) যোগ (৩) ন্যায় (৪) বৈশেষিক (৫) পূর্ব মীমাংসা ও (৬) উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন।

সূত্র

বেদকে কেন্দ্র করিয়া যে বেদাঙ্গ ও ষড়্‌দর্শন ধর্মশাস্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল তাহারা মিলিতভাবে সূত্র বা ধর্মসূত্র বলিয়া কথিত। বেদ মুখে মুখে প্রচারিত হইত বলিয়া শুদ্ধভাবে যাহাতে পাঠ করা যায়, সেজন্য ছয়টি ভাগে বেদাঙ্গ রচিত হয়। সূত্রের ভিতর আছে বৃহত্তর যাগযজ্ঞের আচরণ বিধি, 'স্রৌত', এবং গার্হস্থ্য পূজা-অর্চনার জন্য 'গৃহসূত্র'। তাহা ব্যতীত দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য রচিত হয় ষড়্‌দর্শন।

বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত জনজীবন

[Life of the People as Reflected in the Vedic Literature]

বৈদিক সাহিত্য ঃ বৈদিক যুগের আর্যসভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপাদান হইল বৈদিক সাহিত্য। এই সাহিত্য হইতে তৎকালীন ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়।

আর্যদের সমাজ ঃ সম্ভবত আর্যসমাজে প্রথমে জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা ছিল না, তবে ভারতে বসতি বিস্তারের পর বিজিত অনার্য ও বিজেতা আর্যদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ ছিল। পরবর্তীকালে পূজার্চনার জটিলতা বৃদ্ধি, দেশরক্ষা, কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নানা কার্যের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য কর্মবিভাগের প্রয়োজন হইল। এই কর্মবিভাগই হইল বর্ণবিভাগের উৎস। এইভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও ঋগ্বেদের শেষের দিকে শূদ্র নামে চারি বর্ণের উৎপত্তি হয়। যাগযজ্ঞাদি কার্যের এবং বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ, দেশরক্ষা বা শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বৈশ্য নামে পরিচিত হয়। আর, বিজিত আদিম অধিবাসিগণ শূদ্র নামে পরিচিত হইয়া আর্যসমাজে স্থান লাভ করে। এই বিভাগ প্রথমে জন্মগত ছিল না। যোগ্যতানুসারে বৃত্তিগ্রহণের দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদীয় আর্যসমাজে বিরল নহে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি অথবা সামাজিক সম্বন্ধ-স্থাপনে কোন বাধানিষেধ ছিল না। ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'দাস'দের মধ্যে স্ত্রী-দাসই ছিল প্রধান। তবে তাহাদেরকে গৃহকর্ম ব্যতীত কৃষি বা অন্যান্য উৎপাদনশীল কর্মে ব্যবহার করা হইত না। সমাজে তখনও কূলগত বা কৌলিক প্রথাই ছিল প্রবল।

বর্ণবিভাগ

আর্যসমাজে মূল কেন্দ্র ছিল পরিবার এবং পিতা ছিলেন পরিবারের কর্তা। ঋগ্বেদে পুত্র-সন্তান-এর আকাঙ্খা দেখা গেলেও কন্যা-সন্তানের কামনার একান্ত অভাব। বিবাহ-রীতি ঋগ্বেদীয় যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক হইলেও সমাজে নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। আর্যকন্যা পিতৃগৃহে শিক্ষা লাভ করিত। নারীর রচিত মন্ত্র বেদেও স্থান লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে গার্গী মৈত্রেয়ী বিশ্ববারা ঘোষা অপলা প্রভৃতি বিদুষী মহিলাদের নাম উল্লেখযোগ্য। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় নারীদের একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহারা কৃষি পশুপালন বয়ন প্রভৃতি কার্যেও অংশগ্রহণ করিতেন। মহিলাগণ সমিতিতে যোগ দিতে পারিতেন এবং স্বামীর সহিত যজ্ঞেও অংশ লইতেন। সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। ঋগ্বেদের যুগে কন্যার বিবাহের বয়স ছিল ১৬-১৭ বৎসর। বিধবা-বিবাহেরও প্রচলন ছিল কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

সমাজে নারীর স্থান

আর্যদের জীবনকাল চারিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল ঃ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও

সন্ন্যাস। ইহাকে বলা হইত চতুরাশ্রম। বাল্যাবস্থায় গুরুগৃহে অধ্যয়ন ও ধর্মশিক্ষা; গার্হস্থ্যে সংসারধর্ম পালন; প্রৌঢ় বয়সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন, তথা তপস্বীর জীবন যাপন এবং বার্ধক্যে যোগীর ন্যায় জীবনযাপন (অর্থাৎ, সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন) করাই ছিল আর্যদের রীতি।

চতুরাশ্রম

খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ

আর্যগণের জীবন ছিল অনাড়ম্বর। সূতী ও পশমী বস্ত্র এবং স্বর্ণালঙ্কারের প্রচলন ছিল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার ব্যবহার করিত। গম যব ফলমূল দুগ্ধ ঘৃত ইত্যাদি ছিল আর্যদের প্রধান খাদ্য। মৎস্য ও মাংস খাদ্য হিসাবে গৃহীত হইত। সোমরস ও সুরা পান করার প্রচলন ছিল।

অবসর যাপন

আদিযুগে আর্যদের অবসর বিনোদনের উপায় ছিল গান, বাজনা, নাচ, বাজী ধরিয়া পাশা খেলা। তাছাড়াও হইত রথের দৌড়।

অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ ঋগ্বেদে আর্যদের অর্থ নৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া। ঋগ্বেদীয় জনগোষ্ঠীর কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল উন্নততর। ঋগ্বেদের আদিতে লাঙ্গলেরও উল্লেখ আছে; তবে অনেকে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। সম্ভবত এ লাঙ্গল ছিল কাঠের। বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী বীজ-বপন, ফসল-কাটা, ঝাড়াই-মাড়াই সম্বন্ধেও তাহারা অবহিত ছিল। কৃষি ও পশুপালনই ছিল তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। গরুই ছিল আর্যদের প্রধান সম্পদ। বন্য পশু শিকারের প্রচলন ছিল। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদে কর্মকার, সূত্রধর, রথী, তন্তুবায়, চর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, এসব শিল্পজীবিগণ পেশাগত নৈপুণ্য অর্জনে আগ্রহী ছিল। অয়স্ শব্দ দ্বারা তাম্র বা ব্রোঞ্জের উল্লেখ হইতে মনে হয় ঋগ্বেদীয় আর্যগণ ধাতুর ব্যবহার জানিতেন। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। সমুদ্র ও জাহাজের উল্লেখ থাকায় মনে হয় উপকূলপথে কিছু বাণিজ্য চলিত। ঋগ্বেদীয় আর্যগণ বনবাসী ছিলেন না। সুরক্ষিত মৃত্তিকা-নির্মিত বসতিই ছিল প্রধান।

উপজীবিকা

আর্যদের ধর্ম ঃ প্রতিটি জাতি আপন আপন পরিবেশ হইতে ধর্মের উৎস সংগ্রহ করে। আর্যগণ নানাপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবদেবীজ্ঞানে পূজা করিত। ঋগ্বেদের প্রধানতম দেবতা ইন্দ্র। তিনিই আর্যদের দানবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী করিয়াছেন। তিনি বৃষ্টির দেবতা। তাঁহার পরেই স্থান অগ্নির। বৃষ্টির যেমন প্রয়োজন কৃষিতে, অগ্নিরও প্রয়োজন তেমনি গহন অরণ্য দহনে। তৃতীয় স্থান বরুণের। সোম ছিলেন উদ্ভিজ্জদেব; তাঁহার নামানুসারেই আর্যদের প্রধান পানীয়ের নাম হইয়াছে। নারী দেবী ছিলেন অদিতি এবং উষস্। আর্যদের পূজাপদ্ধতি প্রথমে ছিল অত্যন্ত সরল। ঋগ্বেদের যুগে দেবার্চনার উদ্দেশ্য ছিল প্রজা অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি, পশু, খাদ্য, ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্য-প্রার্থনা। আধ্যাত্মিকতার প্রভাব তত বেশী ছিল না। যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দান আর স্তবস্তুতি পাঠই ছিল পূজার্চনার প্রধান অঙ্গ। ব্রাহ্মণের যুগেই সম্ভবত পূজাপদ্ধতি ক্রমশ জটিল এবং আচারসর্বস্ব হইয়া উঠিতে থাকে এবং এই সকল

জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনের জন্য পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। আর্যসমাজে প্রথমে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না; পরে এই দেশের আদিম অধিবাসীদের মূর্তিপূজা পশুবলি প্রভৃতি আর্যসমাজে গৃহীত হয়।

রাজনৈতিক অবস্থা: ঋগ্বেদীয় যুগে আর্যদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার চূড়ায় ছিলেন কুলপতি। তিনি যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের জন্য এ পদ লাভ করিতেন। তাঁহাকে 'রাজা' বলা হইত। মনে হয়, রাজার পদ ছিল বংশানুক্রমিক। তবে রাজা স্বৈরতান্ত্রিকভাবে নিজ ক্ষমতা ব্যবহার করিতেন না—তাঁহাকে কৌলিক সংগঠনগুলির মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে হইত। বংশানুক্রমিক পদের পাশাপাশি কৌলিক সংগঠন 'সমিতি' কর্তৃক নির্বাচনের ঘটনাও আছে। ইহা ব্যতীত কয়েকটি পরিবার লইয়া গঠিত হইত 'গ্রাম'। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি 'গ্রামণী' (মোড়ল) নামে পরিচিত ছিলেন। কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত হইত 'বিশ'। বিশ-এর প্রধানকে বলা হইত 'বিশপতি'। বিশ ব্যতীত 'জন' শব্দটিও বহুবার ঋগ্বেদে উল্লেখিত হইয়াছে অথচ 'জনপদ' কথাটি একবারও উল্লেখিত হয় নাই।

রাজা, গ্রাম, বিশ ও জন

বৈদিক যুগে রাজতন্ত্রই ছিল সমধিক প্রচলিত। তবে 'সভা' ও 'সমিতি' নামক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ লইয়াই রাজা গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যসমূহ পরিচালনা করিতেন। সভা-সমিতির গঠন সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধ ও প্রবীণ ব্যক্তিদের লইয়া সভা এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া সমিতি গঠিত হইত। রাজকার্যে সহায়তা করিবার জন্য রাজা বিভিন্ন ধরনের কর্মচারীও নিয়োগ করিতেন। যুদ্ধকার্যের সহায়তার জন্য ছিল 'সেনানী' এবং রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য পূজার্চনা করা অথবা রাজাকে পরামর্শ দান করা ছিল 'পুরোহিতের' কাজ। রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ না হইলেও সম্ভবত যুদ্ধকালে তাহা বৃদ্ধি পাইত।

সভা ও সমিতি

সেনানী ও পুরোহিত

বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক অনৈক্যের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজা প্রতিবেশী দুর্বল রাজাকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেন। এইরূপে পরবর্তীকালে সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। 'সম্রাট', 'একরাট', 'রাজচক্রবর্তী' প্রভৃতি উপাধি এই প্রচেষ্টার পরিচায়ক। রাজসূয় অশ্বমেধ বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া নৃপতিগণ নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিতেন।

রাজনৈতিক ঐক্য: 'সম্রাট', 'একরাট', 'রাজচক্রবর্তী'

পরবর্তী বিকাশ: হরপ্পা সভ্যতায় লিপি আবিষ্কৃত হইলেও বৈদিক যুগে সম্ভবত ৭০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের পূর্বে লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে আর্যসমাজে নানা বিরুদ্ধ মতবাদ দেখা দিতে আরম্ভ করিলে আর্যদের সমাজ-জীবন কঠিনতর করা হয়। তখনই চতুরাশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম—ব্রহ্মচর্য ছাত্রদের অবশ্য পালনীয় হইল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রম ছিল যথাক্রমে গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ছাত্রদের

চতুরাশ্রম

তপোবনে ও গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া অঙ্ক, ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্র পাঠ করিতে হইত। ক্রমে ক্রমে নৃত্য ও কথোপকথন আবৃত্তির চর্চা হইত। তাহাই পরবর্তী কালে মহাকাব্য-দুইটির উৎস হইয়া ওঠে।

বৈদিক যুগের শেষের দিকে যাগযজ্ঞে বলিদান প্রথা প্রধান হইয়া ওঠে। পরবর্তী বৈদিক জনগণের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষিকার্য। তখনকার বৈদিক সাহিত্যে ছয়, আট, বারো এমনকি কুড়ি বলদ-বাঁধা জোয়াল যুক্ত লাঙ্গল টানার কল আছে। জমি-চাষ হইত কাঠের লাঙ্গলে এবং আদিম প্রথায়। সে-যুগে কৃষিকার্য হীন বলিয়া গণ্য হইত না। রাজা জনক লাঙ্গল চষিতেন, বলরামেরও অস্ত্র ছিল লাঙ্গল। আরও পরবর্তীকালে উচ্চ শ্রেণীর লোকের ক্ষেত্রে চাষবাস নিষিদ্ধ হয়।

আর্থিক জীবন

এই যুগের আর্যরা যব উৎপাদন করিলেও ক্রমে ক্রমে চাল ও গমই তাহাদের প্রধান খাদ্যে পরিণত হয়। গঙ্গা-যমুনা, দোয়াবে আসিয়া তাহারা সর্বপ্রথম চাল-এর পরিচয় লাভ করে। বৈদিক সাহিত্যে চাল বা ধানের নাম ব্রীহি। পূজা-পার্বণে চালের উল্লেখ থাকিলেও গমের উল্লেখ বিরল।

খাদ্য

পরবর্তী বৈদিক যুগে নানা ধরনের শিল্প ও কারিগরি কাজের প্রসার ঘটে। কর্মকার-এর উল্লেখ পাওয়া যায় ১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তামা বা ব্রোঞ্জের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত "অয়স্" শব্দটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খনির তাম্র ব্যবহার করিয়া বৈদিক আর্যরা নানা দ্রব্যাদি নির্মাণ করিতেন।

কারুকৃতি

তাঁতবোনা ছিল মহিলাদের কাজ—সে কাজও ছিল বহুল প্রচারিত। এই যুগে চর্মশিল্প, কুম্ভকারের কাজ, সূত্রধরের কাজের বহু উন্নতি ও প্রসার ঘটিয়াছিল।

তাঁতবোনা ও অন্যান্য

কৃষিকার্য ও নানাবিধ শিল্পকার্যের প্রসারের ফলে আর্যগণ স্থায়ী বসতিতে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। লোকজন বাস করিত মৃত্তিকা-নির্মিত ইটের বাড়িতে। তবে কৃষকদের উৎপন্ন হইতে নগরবাসীদের জীবন ধারণের উপযুক্ত উদ্বৃত্ত শস্য দান করা সম্ভব হইত না। সেজন্য হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র আদিম নগরের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পরবর্তী বৈদিক যুগ যে ঋগ্বৈদিক যুগ হইতে অনেক উন্নত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঘরবাড়ি

এই যুগে সভা ও সমিতির চরিত্র পরিবর্তিত হইয়া যায়। রাজা ও ধনীরাই এইগুলিতে প্রাধান্য লাভ করে। সভায় আর মহিলাদের বসিতে দেওয়া হইত না। বিস্তৃততর রাজ্য হওয়ায় রাজা ক্রমেই বেশী ক্ষমতাপন্ন হইতেছিলেন। রাজারাই কুলের উপর আধিপত্য করিতেন। রাজ্য বুঝাইতে রাষ্ট্র কথাটি তখন হইতেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। রাজ্য রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি বিরাট বিরাট যজ্ঞ করিয়া নিজ ক্ষমতা আরও সুদৃঢ় করেন। এই সময়ে রাজস্ব ও কর—উভয় প্রথারই প্রচলন ছিল। রাজা রাজকার্য পরিচালনায় রাজপুরোহিত, সৈন্যাধ্যক্ষ, পটমহাদেবী এবং অন্য কয়েকজন উচ্চপদাধিকারীদের সাহায্য লইতেন। নিম্নতম স্তরে গ্রাম্য সভাগুলিই

প্রশাসন

প্রশাসন পরিচালনা করিত। বৈদিক যুগের শেষেও রাজার কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না।

সামাজিক বিভাগ

পরবর্তী বৈদিক সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়। যজ্ঞের জটিলতা ও বলিপ্রদানের ব্যাপকতার সহিত ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদ হইলেও শেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইয়া উভয়েই সমাজের অন্যদের উপর আধিপত্য করিত। বৈশ্যগণের হাতে ছিল কৃষিকাজ এবং তাহারাই একমাত্র রাজস্ব প্রদান করিত। চতুর্থ শূদ্র শ্রেণীর কাজ ছিল সেবাধর্ম। রাজার অভিষেককালে শূদ্রদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, পরবর্তী বৈদিক যুগেও বর্ণবিভেদ অত তীব্র হয় নাই।

পরিবার

এই যুগে পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পুরুষ-পূর্বপুরুষদের পূজাও আরম্ভ হয় এই সময়ে। তাহার সহিত মহিলাদের মর্যাদার আসন কমিতে আরম্ভ করে। আর্যগণের মধ্যে এখনই গোত্রপ্রথা প্রবর্তিত হয় এবং সমগোত্রীয় বিবাহ নিষিদ্ধ হয়।

চতুরাশ্রম প্রথা

চতুরাশ্রম প্রথা এই যুগেও শিথিল ছিল। তবে ব্রহ্মচর্যটি কঠোর-ভাবে পালন করা হইত। অপর তিনটির মধ্যে গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে তত কড়াকড়ি করা সম্ভব হইত না। কিন্তু সমাজে বলিপ্রথা ও যাগযজ্ঞের কঠোরতায় উচ্চশ্রেণীর অনেকে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস ধর্ম পালন করিতেন।

ধর্মাচরণ, দেবদেবী

পরবর্তী বৈদিক যুগে দোয়াবের উর্ধ্বভাগে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবাধীন আর্য সংস্কৃতির বিকাশ-স্থল হইয়া ওঠে। ঋগ্বেদের দেবদেবীরও রূপান্তর ঘটে। ইন্দ্র, অগ্নির স্থানে প্রজাপতি সৃষ্টিকর্তারূপে প্রধান হইয়া ওঠেন। রুদ্র ও বিষ্ণু লাভ করে প্রাধান্য। ধর্মাচরণের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল যাগযজ্ঞ।

কর্মবাদ

এই সময় পূর্বের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথা উঠিয়া গিয়া দাহ-প্রথাই প্রবর্তিত হইয়াছিল। আর্যদের মধ্যে "কর্মবাদ"-এর উদ্ভব ঘটে এই পরবর্তী-কালে। তখনই ধারণা জন্মে যে, পূর্ব জন্মের সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফলেই মানুষ ইহজন্মে ফললাভ করে। কর্মবাদের মধ্যেই জাতিভেদ প্রথার দার্শনিক ভিত্তি

উপনিবেশ বিস্তার

প্রোথিত। মৌখিক ভাষা ক্রমে উচ্চশ্রেণীর লিখিত সংস্কৃত ভাষার রূপ গ্রহণ করিল। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে সে ভাষার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ততদিনে আর্যগণ গাঙ্গেয় অববাহিকা বনশূন্য করিয়া বিরাট কৃষি অঞ্চলে পরিণত করিয়াছেন।

উপমহাদেশে বৈদিক সংস্কৃতির প্রসার
[Expansion of Vedic Culture in the Sub-continent]

ঋগ্বেদোত্তর যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদানের উৎস ঋগ্বেদ-পরবর্তী বেদগুলির তথ্যাদি। গঙ্গা-অববাহিকার উত্তর অঞ্চলেই ১০০০-৬০০ খ্রীঃ পূঃ ঐগুলি রচিত হইয়াছিল। ঐসব গ্রন্থাদির তথ্য হইতে জানা যায়, আর্যগণ উপনিবেশ বিস্তার করেন পাঞ্জাব হইতে গঙ্গা-

যমুনা দোয়াব অধ্যুষিত উত্তর প্রদেশের সমগ্র পশ্চিম ভাগে। প্রধান প্রধান দুটি আর্যগোষ্ঠী ভরত ও পুরু বংশ মিলিয়া কুরু জনগোষ্ঠী গঠন করে। আদিতে তাহারা দোয়াবটির প্রান্তভাগে বসবাস করিলেও কুরুগণ শীঘ্রই দিল্লী ও দোয়াবের উপরিঅঞ্চল অধিকার করে এবং অঞ্চলটির নাম দেয় কুরুক্ষেত্র। পরে দোয়াবের মধ্যাঞ্চল অধিকারী পাঞ্চাল জনগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহারা তাহাদের অধিকারের সীমানা আরও বাড়াইয়া লয়। বর্তমান মীরাট জেলার হস্তিনাপুরে তাহাদের মিলিত রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই কুরু বংশের বিবাদ অবলম্বন করিয়াই মহাভারতের মহাকাব্য রচিত। তাহা সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ৯৫০ অব্দে রচিত হয়। সেই মহাযুদ্ধের ফলে কুরুবংশ প্রায় সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগের আর্যরা পোড়া ইঁটের ব্যবহার জানিত না। কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে, বন্যার প্লাবনে হস্তিনাপুর ধ্বংস হইলে কুরুকুল এলাহাবাদের নিকট কৌশাম্বীতে উঠিয়া আসে। আধুনিক বেরেলি, বাদাউন, ফরাক্কাবাদ লইয়া বিস্তৃত পাঞ্চাল রাজ্য দার্শনিকদের জন্য বিখ্যাত ছিল।

বেদের যুগের শেষের দিকে ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বৈদিক জনগোষ্ঠী দোয়াব হইতে আরও পূর্বে উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ ও উত্তর বিহারের বিদেহ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। কোশল রাজ্যের সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে রামায়ণের। ইহার পরবর্তী যুগে বৈদিক আর্যগণের সম্প্রসারণ সহজ হইয়াছিল লৌহের অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ববাহিত রথ-পরিচালনার জন্য।

লৌহযুগের আরম্ভকাল

[Beginning of the Iron Age]

প্রায় খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত গন্ধার অঞ্চলে লৌহের ব্যবহার দেখা যায়। প্রায় সমকালীন পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশেও লৌহ ব্যবহৃত হইত। ৮০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে পশ্চিম উত্তর প্রদেশে এবং রাজস্থানে লৌহনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রমাণ মেলে। লৌহ অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা সহজেই আদিম অধিবাসী শত্রুদের পরাজিত করিতে সক্ষম হয়। লৌহ-কুঠারের সাহায্যেই আর্যদের পক্ষে গঙ্গা অববাহিকার উর্ধ্বাংশের জঙ্গল সাফ করা সম্ভব হইয়াছিল। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগে এবং বিদেহ অঞ্চলে লৌহের ব্যবহার দ্রুত বিস্তৃত হয়। বেদে লৌহকে 'শ্যাম' বা 'কৃষ্ণ অয়স্' বলা হইত।

উত্তর ভারতে সাজসরঞ্জাম ও হাতিয়ার রূপে প্রস্তরের ব্যবহারের শেষে তাম্রের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। বেশ কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হইবার পরেই মাত্র লৌহ আবিষ্কৃত হইয়া জনজীবনে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। সেইজন্য এই অঞ্চলে তাম্রযুগের পরে লৌহযুগের সুস্পষ্ট ছেদ দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণভারতে প্রস্তরযুগের শেষে সরাসরি লৌহের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সেখানে তাম্রযুগের কোন মধ্যম স্তর নাই। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, ঋগ্বেদের যুগেই ভারতে লৌহযুগের বিকাশ ঘটিয়াছিল।

৪

প্রতিবাদী আন্দোলন
[Protest Movement]

মান্ধাতা আমলের বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রতিবাদী আন্দোলন সূত্রপাতের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণসমূহ

[Social, economic & religious causes of the beginning of the movements protesting against the dominance of the age-old Vedic or Brahmanical culture]

৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে মধ্য গঙ্গা অববাহিকায় প্রায় ৬২টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যতই দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে, সমাজে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাও ততই বৃদ্ধি পায়। তাহারা সমাজে নানা সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করিত। এইভাবে বর্ণ-বিভক্ত সমাজে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। তাহাদের বিক্ষোভই নূতন ধর্ম বা সম্প্রদায় সৃষ্টির অন্যতম কারণ। জৈনধর্ম প্রচারক বর্ধমান মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশজাত। তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের বিরোধিতা করেন।

সামাজিক কারণ

তবে ইহার পিছনে আরও নানা গুরুতর কারণ ছিল। ইতিমধ্যে লৌহকুঠারে বন কাটিয়া বসত হওয়ায় এবং লৌহফলা-যুক্ত লাঙ্গলে চাষ আরম্ভ হওয়ায় বলদের প্রয়োজন দেখা দিল। অথচ ব্রাহ্মণ্যবাদী যাগযজ্ঞে গো-বলিদানের এবং অনেকের গোমাংস ভক্ষণের ফলে কৃষির বিস্তারে ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। সেজন্য নূতন অহিংস নীতি গোমাংস রক্ষার সহায়ক রূপে দেখা দিল। ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতে বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ নগরের উদ্ভব ঘটে। এই সকল নগরে কারিগরদের কাজের ফলে মুদ্রার প্রচলন হয় সর্বপ্রথম। তাহাতে বাণিজ্য-প্রসারের সুবিধা ঘটায় বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাহারা প্রাধান্য লাভের আশায় নূতন ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়কে অকুণ্ঠ চিত্তে সাহায্য করে। বুদ্ধদেবের বহু শিষ্যই ছিলেন মহাধনী বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত।

অর্থনৈতিক কারণ

বৈশ্যদের প্রভাব বৃদ্ধি

বর্ণাশ্রম বিরোধী হওয়ায় বৈশ্যগণ আর এই সকল ধর্মে নিজেদের হীন মনে করিত না। এই ধর্মের অহিংসা নীতির ফলে যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি লোপ পাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম হয়। তাহা ব্যতীত ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মশাস্ত্রে সুদ ছিল গর্হিত। অথচ বৈশ্যদের টাকা খাটাইয়া সুদ গ্রহণ ছিল অন্যতম জীবিকার উপায়। তাই, তাহারা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী—এই দুই ধর্মকে সমর্থন ও সাহায্য করে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, নূতন বসতিগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। গরীবেরা পূর্বের সরল জীবন যাপন

ধর্মীয় কারণ

করিতে আগ্রহান্বিত হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে সরল অনাড়ম্বর জীবন উপাস্য হওয়ায় দরিদ্রগণও ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের বিরোধী হইয়া নূতন ধর্ম সমর্থন করে।

এইভাবে বিভিন্ন কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী ধর্ম-বিস্তারের ভিত্তি রচিত হইলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে আত্মপ্রকাশ করে।

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম
[Jainism and Buddhism]

জৈনমতে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত, জৈন সাহিত্যে উল্লিখিত প্রথম তেইশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ব্যতীত আর সকলেই কাল্পনিক চরিত্র। সর্বশেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন বর্ধমান বা মহাবীর। ঐতিহাসিকদের মতে, পার্শ্বনাথই জৈনধর্মের প্রবর্তক।

তীর্থঙ্করগণ: পার্শ্বনাথ

পার্শ্বনাথ অহিংসা চৌর্যবৃত্তিবর্জন সত্যভাষণ ও অনাসক্তি—এই চারিটি মূল নীতির উপর তাঁহার ধর্মমত স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাবীর এই ধর্মের পরিবর্ধন করিয়া উহার বহুল প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।



বর্ধমান মহাবীর

জৈন ধর্মমত: পার্শ্বনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মনীতির সহিত মহাবীর ব্রহ্মচর্য পালনের উপযোগিতা প্রচার করেন। বেদের অপৌরুষেয়তা এবং যাগযজ্ঞাদিতে জৈনগণ বিশ্বাস করে না। জৈনধর্ম মতে, মানবাত্মার পরম ও চরম বিকাশই ঐশীশক্তি। তাহাদের মত—বস্তুমাত্রেরই আত্মা আছে। তাই, সর্ববিষয়ে অহিংসাপালন ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয়। জৈনগণও হিন্দুদের ন্যায় জন্মান্তর ও কর্মফল বিশ্বাস করে। জন্মান্তর ও কর্মফল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য নিগ্রন্থ বা সর্বপ্রকার আসক্তিশূন্য বা বন্ধনশূন্য হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। জীবে দয়া, কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মপীড়নের মধ্য দিয়া নির্বাণ-লাভই জৈনধর্মের মূল কথা।

মহাবীরের উপদেশাবলী প্রথম চৌদ্দটি পর্বে বা খণ্ডে সঙ্কলিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত এক জৈন সঙ্গীতিতে মহাবীরের উপদেশাবলী এবং প্রচলিত ধর্মসূত্র বারোটি 'অঙ্গে' সঙ্কলিত হয়। পরবর্তীকালে বলভীতে (গুজরাট) একটি ধর্মসভায় জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি নূতনভাবে বিন্যস্ত হয়। কিন্তু ভদ্রবাহু নামক এক জৈনগুরুর নেতৃত্বে অনেকে এই ধর্ম-সঙ্গীতির নূতন সঙ্কলন মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। মহাবীরের বিধান সত্ত্বেও তাহারা উলঙ্গ থাকা হেয় জ্ঞান করিয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতেই এই ধর্মানুরাগীদের নামকরণ হইল 'শ্বেতাম্বর'। যাহারা উলঙ্গ থাকিত, তাহারা 'দিগম্বর' নামে পরিচিত হইল। এইভাবে জৈনগণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

জৈন ধর্মগ্রন্থ

'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর'

জৈনধর্ম প্রথম পূর্ব ভারতে প্রচারিত হইলেও ধীরে ধীরে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও প্রসার লাভ করে। এখনও রাজপুতনা ও গুজরাট অঞ্চলে জৈনধর্মাবলম্বী বহু লোক রহিয়াছে। জৈনধর্ম ভারতের বাহিরে কখনও প্রচারিত হয় নাই। জৈনধর্মের বিস্তারে কোন রাজশক্তি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জৈনধর্ম গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের উত্থান এবং অশোকের মতো সম্রাটের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে জৈনধর্মের প্রসার ব্যাহত হয়।

জৈনধর্মের প্রসার

বৌদ্ধ ধর্মমত : জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত হইতে অনির্বাণ বা মুক্তি লাভই ছিল বুদ্ধদেবের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এ জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণও আছে, সে কারণ দূর করা যায় এবং করিবার জন্য চাই অনাসক্তি ও সৎ জীবনযাত্রা। নির্বাণ বা মুক্তিলাভের জন্য তিনি (১) সম্যক্ দৃষ্টি (২) সদ্বাক্য, (৩) সৎকর্ম, (৪) সৎ সংকল্প, (৫) সৎজীবন (৬) সৎচেষ্টা, (৭) সৎস্মৃতি এবং (৮) সম্যক্ সমাধি—এই আটটি পথের নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাই 'অষ্টমার্গ নামে পরিচিত। বুদ্ধদেবের মতে, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন বা অতিরিক্ত ভোগবিলাস কোনটিই ধর্মানুশীলনের অনুকূল নহে। তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধগণ মনে করেন যে, মধ্যপন্থা অবলম্বনেই হয় মুক্তি, আর মুক্তিই 'নির্বাণ'।

'অষ্টমার্গ ও মধ্যপন্থা

বেদের অপৌরুষেয়তায় বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করে না এবং জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বও তাহারা স্বীকার করে না। বুদ্ধদেব বৈদিক যাগযজ্ঞ ও পশুবলির বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ধর্মোপদেশ জনগণের সহজবোধ্য পালিভাষায় রচিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ও বৌদ্ধসঙ্গীতি : বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় তাঁহার উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজগৃহে এক বৌদ্ধসঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়। এই সঙ্গীতিতে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী সঙ্কলিত হইয়া 'ত্রিপিটক' নামে বৌদ্ধগ্রন্থের সৃষ্টি হয়। ত্রিপিটকের তিনটি অংশ : (ক) সূত্র-পিটক (বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী), (খ) বিনয়পিটক (ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মাবলী) এবং (গ) অভিধর্মপিটক (বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব)। ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত।

ত্রিপিটক : জাতক

ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধদেবের জন্ম ও জন্মান্তর সম্পর্কিত বিভিন্ন কাহিনী 'জাতক' নামে বৌদ্ধ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

রাজগৃহে সঙ্গীতির প্রায় একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি, অশোকের সময় পাটলিপুত্রে তৃতীয় এবং কণিষ্কের সময়ে কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে) চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিবর্তন ও প্রসারে এই বৌদ্ধসঙ্গীতিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গীতির সময় হইতে বৌদ্ধদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। কালক্রমে ইহা চরমে পৌছায় এবং কুষাণ আমলে 'মহাযান' ও 'হীনযান'—এই দুই সম্প্রদায়ে বৌদ্ধগণ বিভক্ত হইয়া পড়ে। 'মহাযান' গোষ্ঠী বুদ্ধদেবকে অবতার জ্ঞান করেন; 'হীনযান' মতবাদীরা মৌলিক নীতিতে আস্থাবান।

মহাযান ও হীনযান

বুদ্ধদেব ও মহাবীরের জীবন ও বাণী

[Life and Teachings of Buddha and Mahavira]

মহাবীর: মহাবীর ছিলেন বৈশালীর জ্ঞাতৃক নামক এক ক্ষত্রিয়বংশের নায়ক সিদ্ধার্থের পুত্র; তাঁহার মাতা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবি বংশের অধিনায়ক চেতকের ভগ্নী। মহাবীরের নাম ছিল বর্ধমান। মহাবীরের জন্ম বা মৃত্যুকাল সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব না হইলেও ইহা নিশ্চিত যে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক। কেহ কেহ বলেন, তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৮ অব্দে মারা যান; কাহারও কাহারও ধারণা, খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রথম জীবনে বর্ধমান গার্হস্থ্য ধর্মেই লিপ্ত ছিলেন। স্ত্রীর নাম ছিল যশোদা। তাঁহার এক কন্যাসন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পারিবারিক জীবনে বিতৃষ্ণা হওয়ায় তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর নানা তীর্থদর্শন ও কঠোর তপশ্চর্যার পর তিনি কৈবল্য বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি 'জিন' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়ী এবং 'মহাবীর' আখ্যা লাভ করেন। তাঁহার এই জিন আখ্যা হইতেই তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত 'জৈনধর্ম' নামে অভিহিত হইল। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল মগধ মিথিলা কোশল প্রভৃতি দেশে ধর্ম-প্রচারের পর তিনি পাটনা জেলার অন্তর্গত পাবা নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন।

গৌতম বুদ্ধ: বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামক এক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের নায়ক শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁহার অপর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। লুম্বিনী (বর্তমান নেপালের রুম্মিনদেই) নামক গ্রামের এক উদ্যানে গৌতমের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য এখনও সংগৃহীত হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি আবির্ভূত হন বলিয়া কথিত আছে তবে নিঃসন্দেহে তিনি জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন।

সিদ্ধার্থের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার মাতা মায়াদেবী পরলোকগমন করেন। বাল্যকালে তিনি রাজার ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের প্রচুর উপকরণের মধ্যেই লালিত-পালিত হন। ক্ষত্রোচিত ধনুর্বিদ্যা মল্লযুদ্ধ প্রভৃতিও তিনি শিক্ষা করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতে তিনি ছিলেন চিন্তাশীল। ষোল বৎসর বয়সে গোপা বা যশোধারা নাম্নী এক সুন্দরী বালিকার সহিত গৌতমের বিবাহ হয়।

প্রথম জীবন



গৌতম বুদ্ধ

কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁহার যে বিরাগ ছিল, তাহা ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিভাবে জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করা যায়, সেই চিন্তায় সিদ্ধার্থের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার যখন উনত্রিশ বৎসর বয়স, সেই সময় রাহুল নামে গৌতমের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সংসার-বন্ধন ক্রমশই বাড়িতেছে দেখিয়া একদিন গভীর রাত্রে স্ত্রী পুত্র পরিবার ও রাজৈশ্বর্যের মায়া ছিন্ন করিয়া গৌতম সংসার ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই সংসারত্যাগ 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' (Great Renunciation) নামে অভিহিত হয়।

সংসার ত্যাগ

সংসার ত্যাগ করিয়া গৌতম বহু সাধুসন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসিলেন, নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও যোগসাধনা করিলেন। অতঃপর বর্তমান বুদ্ধগয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর তপস্যায় লিপ্ত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি পাইলেন না। অবশেষে বর্তমান বুদ্ধগয়ায় এক অশ্বত্থ বৃক্ষের পাদমূলে আত্মসমাহিত হইলেন। এইস্থানেই তিনি পরম 'বোধি' বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার নাম হইল বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী, আর ঐ স্থানের নাম হইল 'বোধগয়া' এবং অশ্বত্থ বৃক্ষের নাম হইল 'বোধিদ্রুম'। বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম বৌদ্ধধর্ম নামে অভিহিত হইল।

বুদ্ধত্ব লাভ

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে গৌতম সিদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব অর্জন করেন। সর্বপ্রথমে তিনি সারনাথের নিকট মৃগশিখাবনে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া গোরখপুর জিলার কুশীনগরে আশি বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব 'মহাপরিনির্বাণ' লাভ করেন (আনুমানিক ৪৮৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ)।

ধর্মপ্রচার : নির্বাণ লাভ

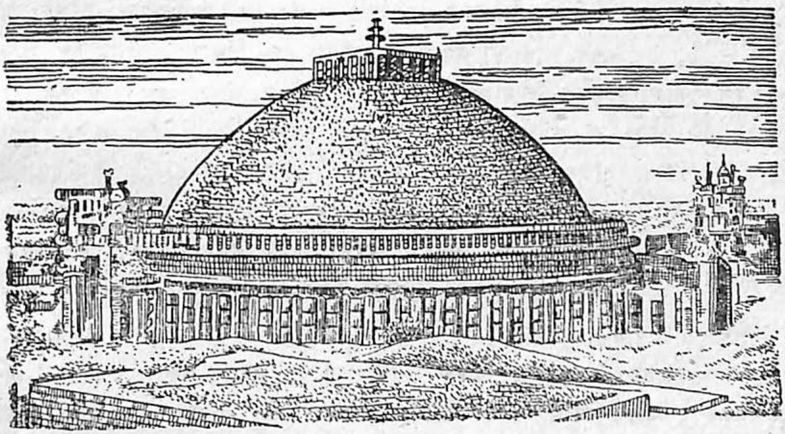
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আপেক্ষিক গুরুত্ব : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জৈনধর্ম

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্মের উত্থান এবং অশোকের ন্যায় সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় জৈনধর্মের প্রসার ব্যাহত হয়। জৈনধর্ম ভারতের বাহিরে প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম বিদেশে ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে। মৌর্য আমলে বৌদ্ধধর্ম পশ্চিম এশিয়া সিংহল প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে উহা মধ্য এশিয়া চীন প্রভৃতি দেশেও প্রচারিত হয়। তবে ধর্ম হিসাবে জৈনধর্মের উৎকর্ষ বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা কম ছিল বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। উভয় ধর্মই সারল্যে এবং সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

প্রসার: দেশে ও বিদেশে

মানবিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে অবশ্য গৌতম বুদ্ধ ভারতবাসীকে অধিকতর প্রেরণা দিয়াছিলেন। তুলনামূলক বিচারে দুই ধর্মের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জৈনধর্মে কৃচ্ছসাধন ও অহিংসা নীতির উপর বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

তুলনা: সাদৃশ্য ও পার্থক্য



সাঁচী-স্তূপ

ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্য, চিত্রকলা প্রভৃতিতে উভয় ধর্মের প্রভাব সমভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সে যুগের স্তূপ মঠ বিহার চৈত্য প্রভৃতি বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্যের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের দান যথেষ্ট। বৌদ্ধ স্তূপ বিহার ইত্যাদির গাত্রে খোদাই করা মূর্তি ও চিত্রকলা ভাস্কর্যশিল্পের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এককথায়, ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের অবদান অপরিসীম।

অবদান: স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কলাশিল্প

৫ সাম্রাজ্যবাদ এবং রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের যুগ
[The Age of Imperialism and Political Unification]

ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ
[Reference to Sixteen Mahajanapadas]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ কৌম প্রথার সাপেক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের শাসনকর্তা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হইতেন বলিয়া বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পরবর্তীকালে শাসকেরা নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগে অনেক রাজ্যই স্বীয় বংশের স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করিয়া রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই কৌম ব্যবস্থা ভাঙিয়া সুদৃঢ় রাজতন্ত্রের উদ্ভব শুরু হয়। এই সময় ষোলটি রাজ্য বা জনপদ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া ওঠে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে ইহাদের 'মহাজনপদ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মহাজনপদগুলি হইল যথাক্রমে ঃ

রাজতন্ত্রের উদ্ভব

কাশী (বারাণসী), কোশল (বর্তমান উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা), অঙ্গ (পূর্ব বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), ব্রিজি (উত্তর বিহার), মল্ল (উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর অঞ্চল), চেদী (বুন্দেলখণ্ড), বৎস (এলাহাবাদ অঞ্চল), কুরু (দিল্লী ও মীরাট), পাঞ্চাল (রোহিলখণ্ড ও তাহার সন্নিহিত দোয়াব অঞ্চল), মৎস (জয়পুর), শূরসেন (মথুরা), অশ্মক (অন্ধ্র প্রদেশের দোয়াব অঞ্চল), অবন্তী (পশ্চিম মালব অঞ্চল), গন্ধার (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল) এবং কম্বোজ (কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও কাফ্রিস্তান)। ইহাদের মধ্যে ব্রিজি ও মল্লদেশে কৌম শাসনস্থান প্রচলিত থাকিলেও অধিকাংশ মহাজনপদগুলিকে এক শক্তির দ্বন্দ্বে লিপ্ত করে। কালক্রমে দুর্বল মহাজনপদগুলিকে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত করিয়া চারিটি মহাজনপদ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতায় পরস্পরের সম্মুখীন হয়। ইহারা হইল (ক) অবন্তী, (খ) বৎস, (গ) কোশল ও (ঘ) মগধ। [রোমিলা থাপারের মতে, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে কাশীরাজ্য, কাশীরাজ্যের নিকটস্থ কোশল রাজ্য, মগধ (বর্তমানে দক্ষিণ বিহার) এবং পূর্ব নেপালের জনকপুর ও বিহারের মজফ্‌ফরপুর-জিলা লইয়া গঠিত ব্রিজি রাজ্যের মধ্যে]। প্রসেনজিতের অধীনে কোশল রাজ্যটি প্রথম দিকে শক্তিশালী হইয়া ওঠে। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর ও নেপালের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত শাক্যদের রাজ্য এবং কাশী জয়ের ফলে কোশল রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়, কিন্তু অচিরেই মগধের সহিত শক্তির দ্বন্দ্বে

ষোড়শ মহাজনপদ

কোশলের পতন হয়। বৎসরাজ উদয়ন অবন্তী অঙ্গ এবং মগধের রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি প্রতিবেশী কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর বৎস ক্রমশ হীনবল হইয়া পড়িতে থাকে।



অবশেষে অবন্তী এই রাজ্যটিকে গ্রাস করে। চন্দ্র প্রদ্যোত মহাসেনের রাজত্বকাল হইতেই অবন্তীর উত্থান শুরু হয়। তিনি তক্ষশিলা অভিযান করিয়াছিলেন এবং বৎসরাজ উদয়নকে কিছুকাল বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। মগধরাজও তাঁহার আক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া রাজধানী সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্র প্রদ্যোতের মৃত্যুর কিছুকাল পর মগধ অবন্তী রাজ্যটি অধিকার করিয়া উত্তর ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বিম্বিসার হইতে মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় অবধি মগধের শক্তি-বৃদ্ধির ইতিহাসের রেখাচিত্র

[A bare outline of the history of growth of the power

of Magadha from the days of Bimbisara to the rise of the Mauryas]

চতুঃশক্তির দ্বন্দ্বে জয়লাভের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী উত্তর ভারতের মূল কেন্দ্র হইল মগধ। মগধই সর্বপ্রথম ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া এই উপমহাদেশের এক বৃহৎ অংশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে হর্যঙ্কবংশীয় বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর হইতেই এই রাজ্যের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। একটি বৃহৎ শক্তি যদি নদীপথ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, তবে তাহার গুরুত্ব ও সম্ভাবনা কি হইতে পারে তাহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি মগধকে সেইভাবে গড়িয়া তোলেন। বিম্বিসার প্রথমে মদ্র, কোশল ও বৈশালী রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মগধের শক্তি বৃদ্ধি করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নী কোশলদেবীকে বিবাহ করিয়া তিনি বারাণসীর কিয়দংশ যৌতুকস্বরূপ লাভ করেন। ইহার পর তিনি মগধের প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্গরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পূর্বে অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত বিম্বিসারের পিতাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই পিতৃপরাজয়ের প্রতিশোধকল্পে বিম্বিসার অঙ্গ আক্রমণ ও ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করেন। ফলে, সমৃদ্ধশালী অঙ্গরাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মগধের উত্থান

বিম্বিসার

অঙ্গ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সামুদ্রিক বন্দরগুলি নিয়ন্ত্রণ করিত এবং তাহার সহিত ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ফলে, অঙ্গ মগধরাজ্যের মূল্যবান অর্থ নৈতিক সহায়ক হইয়া উঠিল। বিম্বিসার সমসাময়িক পরাক্রান্ত নরপতিগণের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া মগধকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

ভারতের রাজাদের মধ্যে বিম্বিসারই প্রথম দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কর্মনিপুণ মন্ত্রিসভা ও আমলাতন্ত্র গঠন করেন। কর্তব্যকর্ম অনুযায়ী রাজকর্মচারীদের শ্রেণীবিভেদ করিয়া দেওয়া হয়। উত্তম শাসন ব্যবস্থার পরিপূরক ও বাণিজ্যের সহায়ক রূপে রাস্তাঘাটের উন্নতি ও প্রসার ঘটানো হয়। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মূল ছিল 'প্রথা'। গ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তি সরকারের জরিপ করা কৃষিজমির ফসলের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া ১/৬ ভাগ রাজস্ব রাজাকে আদায় করিয়া দিতেন। জমি চাষ করিত শূদ্র এবং আরও নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্যগন।

অজাতশত্রু ঃ বিম্বিসারের মৃত্যুর পর অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া খ্রীঃ পূঃ ৪১৩ সালে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। জৈনগ্রন্থে অবশ্য বলা হইয়াছে যে, অজাতশত্রু পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং বন্দীদশায় বিম্বিসারের মৃত্যু হয়। স্বামীর শোকে কোশলদেবী প্রাণত্যাগ করেন। কোশলরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভগ্নীর বিবাহে যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত বারাণসীর কিয়দংশ পুনর্দখল করিয়া লইলে অজাতশত্রু কোশল আক্রমণ করেন। এই সংঘর্ষ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিবার পর কোশল ও

মগধের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অজাতশত্রু কোশলরাজ প্রসেনজিতের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বারাণসীর হৃত অঞ্চল যৌতুকস্বরূপ লাভ করেন। ইহার পর অজাতশত্রু পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মগধ রাজ্যের সম্প্রসারণে সচেষ্ট হন।

এই সময় পূর্ব ভারতে মল্ল লিচ্ছবি এবং কাশী কোশলের ১৮টি গণরাজ্য মিলিত হইয়া একটি প্রবল শক্তিজোটের সৃষ্টি করিয়াছিল। অজাতশত্রু এই শক্তিজোটটি ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রথমে বৈশালীর লিচ্ছবিগণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কাশী ও কোশলের গণরাজ্যগুলি বৈশালীর সাহায্যে অগ্রসর হয়। ষোল বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া উভয় পক্ষ সংগ্রাম করিয়াছিল। অবশেষে অজাতশত্রু বৈশালী জয় করিয়া পূর্ব ভারতে মগধের প্রভুত্ব স্থাপন করেন; ইহার পর অজাতশত্রুর সহিত অবন্তীর সংঘর্ষ বাধে। অজাতশত্রু আত্মরক্ষার জন্য রাজধানী রাজগৃহের প্রাকার সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র উদয়ী রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার সময়েও মগধের সহিত অবন্তীর বৈরীভাব সমানভাবে চলিতে থাকে। এই সময়ই প্রদ্যোতের পুত্র পালক বৎস রাজ্যটি জয় করেন। ফলে, অবন্তী রাজ্যটি মগধের পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া মগধ এবং অবন্তী উভয়ই চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইতিমধ্যে হর্যঙ্কবংশের শেষ নরপতি নাগদাসকে হত্যা করিয়া শিশুনাগ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার সময় সমগ্র কাশী রাজ্য মগধের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তিনি কোশল রাজ্যটিও জয় করেন। অবন্তীরাজ অবন্তীবর্মন তাঁহার নিকট পরাজিত হইলে সমগ্র অবন্তী রাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। শিশুনাগের সাফল্যের ফলে উত্তর ভারতে মগধের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মতো আর কোন শক্তিই অবশিষ্ট রহিল না।

শিশুনাগ

মহাপদ্মনন্দ ঃ শিশুনাগের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কালাশোক কাকবর্ণ কিছুকাল রাজত্ব করেন। কিন্তু মহাপদ্মনন্দ নামক একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি কাকবর্ণকে হত্যা করিয়া মগধে নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপদ্মনন্দ অত্যন্ত পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। পুরাণে তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনীর উল্লেখ আছে। এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজন্যকুলকে ধ্বংস করিতে প্রস্তুত হইলেন। পুরাণে বলা হইয়াছে যে, তিনি পরশুরামের ন্যায় দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তিনি ইক্ষাকু পাঞ্চাল কাশী হৈহয় কলিঙ্গ অশ্মক কুরু মৈথিল শূরসেন বিতিহোত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজ্যগুলি জয় করিয়াছিলেন। খারবেলের হাতীগুম্ফা লিপি হইতে মহাপদ্মনন্দের কলিঙ্গ-বিজয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। কয়েকটি লেখমালায় কুন্তল অর্থাৎ দক্ষিণ মহারাষ্ট্র ও উত্তর-পশ্চিম মহীশূরে নন্দরাজের শাসনের উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ নন্দ সাম্রাজ্যকে গঙ্গানদী হইতে রাজপুতনার মরু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এইরূপে দক্ষিণ বিহারের নগণ্য মগধ রাজ্য পর্যায়ক্রমে কয়েকজন রণকুশলী নৃপতির চেষ্টায় এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। মহাপদ্মনন্দ এই সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে

ভারতের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট

প্রতিষ্ঠিত করিয়া একরাটের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। বস্তুত তিনিই প্রাচীন ভারতের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট।

মহাপদ্মনন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার আট পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) পর্যায়ক্রমে মগধ শাসন করিয়াছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ ধননন্দের রাজত্বকালে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। সম্ভবত, তাঁহাকে বাধাদান করিতে নন্দরাজ দুই লক্ষ পদাতিক, কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, তিন হাজার রণহস্তী ও দুই হাজার রথী লইয়া প্রস্তুত হইলে গ্রীক সৈন্যবাহিনী ভীত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল।

ধননন্দ

নন্দবংশের এই বিপুল বাহিনীর ব্যয়ভার মিটানো হইত জমির খাজনা হইতে। উর্বরা জমিতে প্রচুর ফসল হওয়ায় খাজনাও যথেষ্ট আদায় হইত। বিশেষ শ্রেণীর রাজকর্মচারী খাজনা আদায় করিত। অসংখ্য খাল কাটাইয়া জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া নন্দরাজগণ কৃষির উন্নতি বিধানে যত্নবান হইয়াছিলেন। এইভাবেই ভারতে ধীরে ধীরে কৃষিভিত্তিক সাম্রাজ্য-ধারণা দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে।

কৃষির উন্নতি

বৈদেশিক আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিলেও ধননন্দ বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বৈরাচারী শাসন প্রজাসাধারণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। অবশেষে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ধননন্দকে নিহত করিয়া মগধে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (আঃ ৩২৪ খ্রীঃ পূঃ)।

মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠা

মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস

[History of the Maurya Empire]

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যঃ মগধের সিংহাসন অধিকার করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইলেন। এই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক-অধিকৃত অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জাষ্টিনের রচনা হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত বিদেশী শাসন হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতকে মুক্ত করিতে অগ্রসর হন। আত্মকলহে লিপ্ত গ্রীক শাসনকর্তাদের পক্ষে চন্দ্রগুপ্তকে বাধা প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। ফলে, অল্পকালের মধ্যেই তিনি গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

গ্রীক বিতাড়ন

আলেকজাণ্ডার তাঁহার সামরিক প্রতিভার বলে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার পূর্বাঞ্চলের অধিপতি ছিলেন সেনাপতি সেলুকাস। তিনি ভারতবর্ষে গ্রীকবিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইয়া ৩০৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হন। অতঃপর সেলুকাস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহার ফলাফল সম্পর্কে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার শর্ত স্পষ্টই গ্রীক সেনাপতির পরাজয়ের কথা প্রমাণ করে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের নীরবতাও সম্ভবত এই কারণে। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত কাবুল কান্দাহার হীরাট ও মাকরান লাভ করেন। পরিবর্তে তিনি সেলুকাসকে মাত্র পাঁচশত হস্তী দান করেন। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের

সেলুকাসের পরাজয়

মাধ্যমে উভয়ের মৈত্রী সুদৃঢ় করা হয়। সেলুকাস মৌর্য-সম্রাটের নিকট মেগাস্থিনিস নামক একজন দূতকেও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রাজ্য জয়

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্লুটার্ক লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ছয় লক্ষ সৈন্য লইয়া সমগ্র ভারত বিজয় করিয়াছিলেন। এই উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার কোন রাজ্য জয় করেন নাই। সম্রাট অশোক কেবলমাত্র কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অশোকের শিলালিপি দক্ষিণে মহীশূর হইতে উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত সর্বত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিঙ্গ ব্যতীত এই বিশাল সাম্রাজ্য যে চন্দ্রগুপ্তের বাহুবলেই সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা সন্দেহাতীত। কোন কোন তামিল গ্রন্থে এক মৌর্যরাজের দক্ষিণ ভারত বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। ঐতিহাসিকগণ এই মৌর্যরাজকে চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া মনে করেন। শকক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপি হইতে জানা যায় সুরাষ্ট্র চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী অবস্থিত ছিল। আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

অসাধারণ সামরিক প্রতিভা দ্বারা চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশ লইয়া এক ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, পশ্চিমে আরব সাগর ও দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেবলমাত্র রাজ্য জয় নহে, দেশ-শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই উপমহাদেশের এক বিশাল অংশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনে যে স্থিতাবস্থা দান করিয়াছিলেন তাহা ভারতীয় অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব উন্নতি আনয়ন করে। সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে থাকে। শিল্পে নবজীবনের সূত্রপাত হয়।

মৌর্য শাসন-ব্যবস্থাঃ সেলুকাসের রাজদূত মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'ইণ্ডিকা' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থ-দুইটি হইতে আমরা মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার পরিচয় পাই। তাহাতে জানা যায় যে, মৌর্য শাসন-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুসংহত এবং ব্যাপক।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী সম্রাট, নিজ হস্তেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তবে তিনি দুরাচারী ছিলেন না ; অর্থশাস্ত্রে তাঁহাকে প্রজাহিতৈষীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তিনি ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি প্রজ্ঞাবান মন্ত্রীসভা ছিল। এই সমস্ত পরামর্শদাতাদের মধ্য হইতেই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মনোনীত হইতেন।

পাটলিপুত্র

সমগ্র সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন রাজপরিবারের কোন কুমার। প্রদেশগুলিও ছিল ক্ষুদ্রতর বিভাগে বিভক্ত। উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক নগর ছিল পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী, তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনী। রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসন চালাইবার জন্য ছিল

ছয়টি কমিটি। প্রতিটি কমিটিতে ছিল পাঁচজন করিয়া সদস্য। কমিটিগুলির উপর আরোপিত ছিল স্বাস্থ্য, বৈদেশিকদের তত্ত্বাবধান, জন্ম-মৃত্যু লিপিবদ্ধ করা, ওজন ও পরিমাপের তদারকী এবং আরও নানা কাজ।

এইসব ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের আরও প্রায় দুই ডজন বিভাগ ছিল। তাহাদের কাজ ছিল রাজধানীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কাজকর্ম দেখাশুনা। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনী ছিল বিরাট। অশ্বারোহী, পদাতিক, রথী, গজবাহিনী, নৌবাহিনী এবং পরিবহণ—এই ছয়টি শাখায় বিভক্ত বাহিনীর জন্য ৩০ জন সেনানায়ক ছিলেন। মৌর্য বিচার-ব্যবস্থা সুসংগঠিত ছিল। দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর।

ভূমি-রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। উহা ছিল ফসলের ১/৬ ভাগ। ইহা ব্যতীত বাড়তি কর ছিল। 'বলি' এবং বন, খনি, বাণিজ্য প্রভৃতি হইতেও শুল্ক আদায় হইত, শাসন-ব্যবস্থা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোক মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার কিছু সংস্কার করেন মাত্র।

বিন্দুসার ঃ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিন্দুসার কোন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু তিনি তক্ষশিলা ও সম্ভবত দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করিয়া সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

মহামতি অশোক ঃ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন (আঃ ২৭৩ খ্রীঃ পূঃ)। তিনি ভারতবর্ষের যে সকল অঞ্চল তখনও মৌর্য সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল, তাহা জয় করিয়া চন্দ্রগুপ্তের আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করিতে উদ্যোগী হন। রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। এই রাজ্যটি মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকালে মগধের পদানত হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কলিঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্থল ও জলপথে দক্ষিণ ভারত এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার টিন-উৎপাদক অঞ্চলের সহিত যোগাযোগের বন্দর তাম্রলিপ্ত কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কলিঙ্গকে মৌর্যসাম্রাজ্য ভুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপি হইতে জানা যায়, যে বহুসংখ্যক লোক হতাহত ও বন্দী হইবার পর তিনি কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যুদ্ধের মর্মান্তিক দৃশ্য অশোকের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং তাঁহার জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে। তিনি উপগুপ্ত নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লন। ইহার পর অশোক পূর্বতন মগধ সম্রাটগণের অনুসৃত যুদ্ধ দ্বারা দিগ্বিজয়ের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মবিজয় অর্থাৎ সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের দ্বারা জনগণের হৃদয় জয় করার আদর্শ গ্রহণ করিলেন। এইভাবে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংহতি সাধনের যে প্রয়াস বিম্বিসারের অঙ্গবিজয়ের মাধ্যমে শুরু হইয়াছিল, অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ে তাহার প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কলিঙ্গ বিজয়

প্রজাপুঞ্জের নীতিবোধক জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে অশোক ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। এই সকল শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তব্য অশোকের সাম্রাজ্যের বিশালতার একটি ধারণা করিতে সাহায্য করে। ইহা দক্ষিণে চোল পাণ্ড্য কেরলপুত্র ও সত্যপুত্র রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে সুরাষ্ট্র বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ মৌর্য

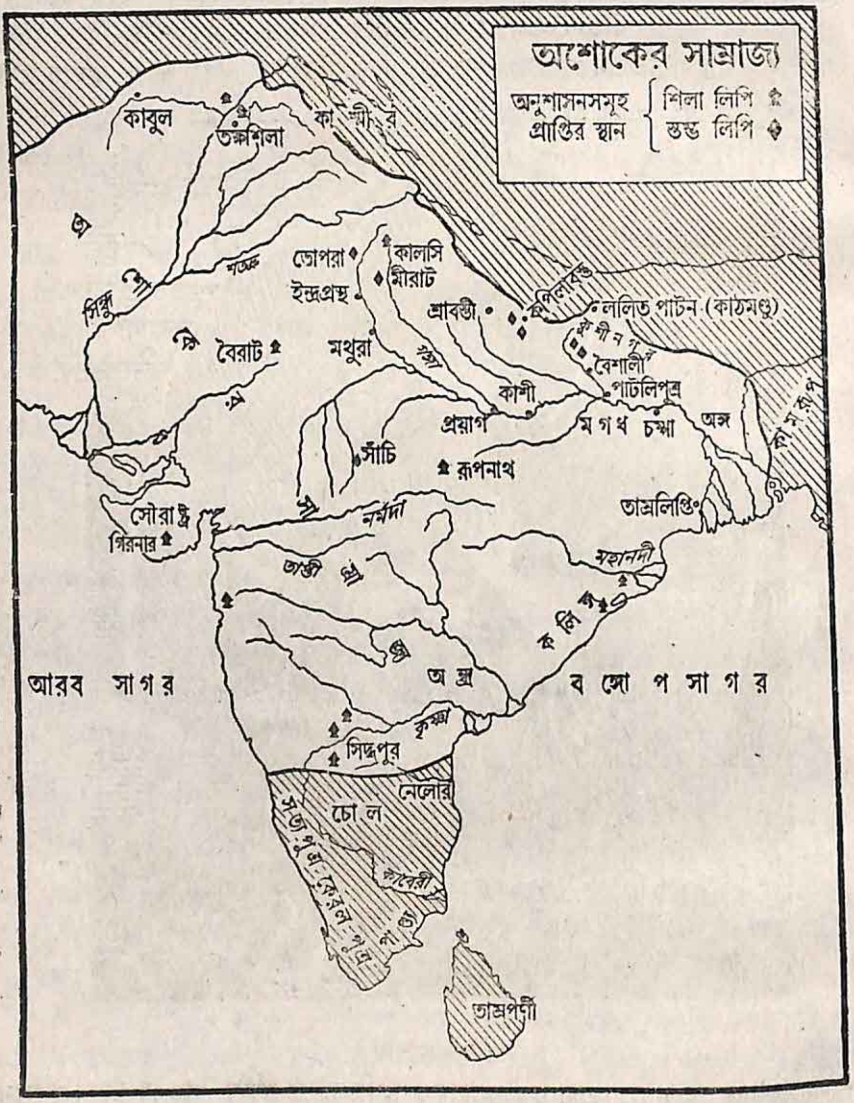
অশোকের সাম্রাজ্য সীমা



মহামতি অশোক

শাসনাধিকারে ছিল। অশোকের ত্রয়োদশ লিপি হইতে জানা যায় যে উত্তর-পশ্চিমে মৌর্য সাম্রাজ্য সিরিয়া ও পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীক অধিপতি দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাসের রাজ্যের পূর্বসীমা স্পর্শ করিয়াছিল। হিউয়েন সাঙ ও কহ্লনের বর্ণনা অনুযায়ী কাশ্মীর মগধরাজ্যের অধীনে ছিল। নেপালের তরাই অঞ্চলও মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হিউয়েন-সাঙ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অশোক-স্থাপিত স্তূপ দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, কামরূপ ব্যতীত সমগ্র পূর্ব ভারতে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত

ছিল। কলিঙ্গ জয়ের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের উপকূল পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল।



বুদ্ধের বাণী প্রচার করিবার জন্য অশোক অনেক ধর্মপ্রচারক নিযুক্ত করেন। ইহারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে, পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচার

অশোকের পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র ও কন্যা (মতান্তরে ভগ্নী) সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। ইহার ফলে বহির্বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করে।

অশোকের ধর্ম ঃ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর যুদ্ধ-বর্জন নীতি গ্রহণ করিয়া অশোক ভারতে এক নূতন ধারণার প্রবর্তন করিলেন। ইতিপূর্বের ভারতের রাজনৈতিক বা সামাজিক ধ্যানধারণার সঙ্গে ইহার কোন তুলনা নাই। ইহা হইতেছে অশোকের ধর্ম। ইহা সংস্কৃত ধর্ম শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ। তাঁহার ধর্ম কোন সংকীর্ণ মতবাদপুষ্ট নহে। প্রসঙ্গভেদে ইহার তাৎপর্য দাঁড়ায়—সর্বজনিক নিয়ম, জাগতিক রীতি, ন্যায় ও সত্যের পথ। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সংরক্ষণই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রচলিত ধর্মের নির্দেশ ছিল—লোকে পিতামাতাকে মান্য করিবে, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ-শ্রমণদের শ্রদ্ধা করিবে, দাস ও ভৃত্যদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করিবে। তাঁহার বাণী ছিল—সদাচরণ করিলে লোকে স্বর্গে যাইবে ; নির্বাণের কথা তিনি বলেন নাই। ধর্মের আদর্শ ছিল সকলের মধ্যে ঐক্য-সমন্বয় সাধন এবং অহিংসা।

জনহিতকর কার্যাবলী ঃ সম্রাট অশোক প্রজাসাধারণের হিতসাধনের জন্য বহুবিধ জনহিতকর কার্যাবলী সম্পন্ন করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশ-শাসনের জন্য সারা দেশব্যাপী উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ রাজপথ নির্মিত হয়। সেই সকল রাজপথের উভয় পার্শ্বে রোপিত হয় ছায়াপ্রদ ঘন পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী। কিছুদূর অন্তর অন্তর পথিকদের বিশ্রামের জন্য ছিল বিশ্রামাগার। রাজ্যের সর্বত্র মানুষ ও পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণও তাঁহার অন্যতম কীর্তি।

বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ ঃ ভারতের বাহিরের গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত সম্রাট অশোক নানাপ্রকার দূত বিনিময় করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রাজারা হইলেন সিরিয়ার অধিপতি সেলুকাস নিকেতরের পৌত্র দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাস ; মিশরের দ্বিতীয় টলেমী ফিলাডেলফাস (২৮৫—২৪৭ খ্রীঃ পূঃ), ম্যাসিডোনিয়ার অ্যান্টিগোনাস, গোনাটান (২৭৬—২৩৯ খ্রীঃ পূঃ) ; সিরনের রাজা ম্যাগাস ও এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডার।

এই যুগে বাহিরের পৃথিবীর সহিত ভালোভাবেই যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তবে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা ও পশ্চিমের দেশগুলির সহিতই সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী সেলুকিড সাম্রাজ্যের সহিত প্রথম তিন মৌর্য সম্রাটেরও রীতিমতো দূত-বিনিময় ও ভাব এবং সংস্কৃতি-বিনিময় ঘটিত।

ইতিহাসে অশোকের স্থান ঃ এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্য-শাসনকারী সম্রাট অশোক ছিলেন বিশ্ববন্দিত চরিত্র। প্রজাগণকে তিনি আপন সন্তানবৎ মনে করিতেন এবং তাহাদের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ বর্জন করেন পরাজয়ের গ্লানিতে নহে, বিজয় মুহূর্তে। তাঁহার পূর্বে কিংবা পরে পৃথিবীর কোন সম্রাটই শক্তির পথ বর্জন করিয়া এত বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতে সক্ষম হন নাই। সেইজন্যই পণ্ডিত প্রবর এইচ. জি. ওয়েলস্ বলেন ঃ

"ইতিহাসে যে লক্ষ লক্ষ রাজার নাম ভীড় করিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে অশোকের নাম একক একটি নক্ষত্রের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান। ভল্গা হইতে জাপান অবধি আজও

তাঁহার নাম সম্মানিত। জীন এবং ভারত তাঁহার ধর্মমত বর্জন করিলেও তাঁহার মহত্ত্বের ঐতিহ্য আজও বহন করিতেছে। কনস্টানটাইন বা সার্লেমেনের নাম যত লোক শুনিয়াছে—তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী লোক অন্তরে অন্তরে তাঁহার স্মৃতি পোষণ করে।”

অশোকের মৃত্যুর পর বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। সিংহাসন লইয়া বিরোধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নব নব রাজ্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত দুর্বল রাজাদের রাজ চক্রবর্তী রূপে ভারতবর্ষ বিজয় করিয়া নিজেকে একচ্ছত্র অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা ছিল না। মৌর্যোত্তর যুগে মগধের শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্র এবং দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন ও বাকাটক-বংশীয় রাজগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনে সমর্থ হন নাই।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কিছুকাল পর কুষাণ নরপতিগণ উত্তরে ভারতে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে কুষাণ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। অবশেষে কুষাণ শাসন পশ্চিম পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। গুজরাট ও মালবের শকগণও একটি ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজ্যের উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে পুনরায় অনিশ্চয়তা এবং ভাঙ্গাগড়া হইতে থাকে।

কুষাণ

বৈদেশিকগণ কর্তৃক ভারত আক্রমণ

[Invasions of India by Foreigners]

পারসিক আক্রমণ ও অ্যাকিমিনিড সাম্রাজ্য-সীমা : খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ভারতে যখন একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিতেছিল তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্তবর্তী পারস্য দেশে অ্যাকিমিনিড নামে একটি শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাইরাস আত্মকলহে লিপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির দুর্বলতার সুযোগে গন্ধার রাজ্য জয় করেন। সম্রাট দারায়ুসের রাজত্বকালে সিন্ধু দেশটিও বিজিত হয়। তাঁহার পার্সিপোলিস ও নাকস্-ই-রুস্তম শিলালিপিতে সিন্ধু ও গন্ধারকে অ্যাকিমিনিড সাম্রাজ্যের দুইটি প্রদেশ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুইটি প্রদেশ হইতে পারস্য সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব আদায় হইত। পরবর্তী পারস্য-সম্রাট জারেক্সিসের সময়ও ভারতের এই অঞ্চলে পারসিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষ অ্যাকিমিনিড সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য যে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীয় যোদ্ধারাও ছিলেন। কিন্তু গ্রীক অভিযানের

কাইরাস ও দারায়ুস

প্রাক্কালে পারস্য সম্রাটগণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সুযোগে পারস্যের শাসনাধীন উত্তর-পশ্চিম ভারতে পুনরায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানঃ অ্যাকিমিনিড রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পারস্য ও গ্রীসের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতে থাকে, আলেকজাণ্ডারের পারস্য অভিযানে তাহার চরম পরিণতি ঘটে। আলেকজাণ্ডার ছিলেন ম্যাসিডন রাজ্যের অধিপতি ফিলিপের পুত্র। ৩৩৬ গ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ফিলিপের মৃত্যু হইলে আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সমগ্র গ্রীক দেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। ৩৩৪ গ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তিনি পারস্য অভিযান করেন এবং তৃতীয় দারায়ুসকে পরাজিত করিয়া হিন্দুকুশ পর্বতের পশ্চিমাঞ্চলে উপস্থিত হন। ৩২৭ গ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ অভিযানে উদ্যত হন। এই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতের পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই রাজনৈতিক অনৈক্য আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

আলেকজাণ্ডার



গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার

উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া আলেকজাণ্ডার প্রথমে কয়েকটি দুর্ধর্ষ পার্বত্য উপজাতিকে পরাভূত করেন। তারপর তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তক্ষশিলা অভিমুখে যাত্রা করেন। তক্ষশিলা-রাজ অম্ভি বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তথা হইতে আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর তীরে উপস্থিত হন। ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ভূভাগের অধিপতি পুরু অকুতোভয়ে তাঁহার গতিরোধ করেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া তিনি বন্দী হন। আলেকজাণ্ডার পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইহার পর আলেকজাণ্ডার আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া বিপাসা নদীর তীরে উপস্থিত হন। তিনি এই নদী অতিক্রম করিয়া আরও অগ্রসর হইতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল অত্যন্ত রণক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতীয় শৌর্য ও বীর্যের যে পরিচয় তাহারা ইতিমধ্যেই পাইয়াছিল, তাহা গ্রীক সৈন্যগণকে আরও

তক্ষশিলা ঃ অম্ভি

পুরু

যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত হইতে নিরুৎসাহ করিয়াছিল। অধিকন্তু তাহারা যখন শুনিল যে গ্রীক-আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য মগধরাজ একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তখন পশ্চাদপসরণকেই তাহারা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিল। অগত্যা আলেকজাণ্ডারকে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। তিনি একদল সৈন্যসহ বালুচিস্তানের মধ্য দিয়া পারস্যের দিকে যাত্রা করেন। অবশিষ্ট সৈন্য জলপথে প্রত্যাবর্তন করিল। ব্যাবিলনে পৌঁছিবার পর হঠাৎ জরাক্রান্ত হইয়া মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে আলেকজাণ্ডার পরলোক গমন করেন (৩২৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ)।

আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তন

আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের ফলাফল ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফলে (১) অগণিত নরনারী নিহত হয় এবং অজস্র সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। (২) উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাষ্ট্রগুলি শক্তিহীন হইয়া পড়ায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করা সহজ হয়। (৩) পরবর্তীকালে বাহ্লিক গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্য-বিস্তারে সমর্থ হয়। (৪) সর্বোপরি গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে আদানপ্রদান সম্ভব হয়।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য গ্রীক সেনাপতিবর্গের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। সেলুকাস নিকেতর পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া লাভ করেন। তাঁহার সময়ই উত্তর-পশ্চিম ভারত গ্রীকগণের হস্তচ্যুত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সেলুকাস হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া পরাজিত হন এবং চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করিয়া কাবুল কান্দাহার হীরাট ও মাকরান মৌর্য-সম্রাটকে প্রদান করেন।

সেলুকাস

মৌর্যোত্তর যুগের গ্রীক অভিযান ঃ সেলুকাসের উত্তরাধিকারীগণের দুর্বলতার সুযোগে মধ্য এশিয়ার হিন্দুকুশ ও অক্ষু নদীর মধ্যবর্তী ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লিক দেশীয় গ্রীক শাসকগণ একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। বাহ্লিক-রাজ ডিমেট্রিয়স পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ জয় করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে যে-যবন আক্রমণ হইয়াছিল সম্ভবত তাহা ডিমেট্রিয়সই পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ রাজ্য হইতে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে ইউক্রেটাইডিস ব্যাকট্রিয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। ফলে ডিমেট্রিয়সের সাম্রাজ্য ভারতের বিজিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাঁহার মৃত্যুর পর যে-সকল গ্রীক নরপতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাসন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মিনাণ্ডার সর্বশ্রেষ্ঠ। সাকলে (শিয়ালকোট) তাঁহার রাজধানী ছিল। "মিল্‌হিতপঞ্‌হো" গ্রন্থে মিনাণ্ডার ও বৌদ্ধাচার্য নাগসেনের যে আলোচনার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে গ্রীকরাজের বৌদ্ধ-ধর্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাহ্লিক গ্রীক

মিনাণ্ডার

শক ঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক নরপতিগণের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না।

পারস্পরিক দ্বন্দ্বে তাঁহারা শক্তিক্ষয় করিতেছিলেন। এই সুযোগে মধ্য এশিয়ার শক নামে একটি যাযাবর জাতি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া আফগানিস্তান ও বালুচিস্তান হইতে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটায়। কালক্রমে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে তক্ষশিলা মথুরা উজ্জয়িনী প্রভৃতি(স্থানে শকদের বিভিন্ন শাখা-রাজ্য গড়িয়া ওঠে। পশ্চিম ভারতে শক-নরপতি নহপান অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর নিকট পরাজিত ও নিহত হন। কিছুকাল পরে শকক্ষত্রপ রুদ্রদামন পশ্চিম ভারতে পুনরায় একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনৈক সাতবাহন-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং মালব উত্তর গুজরাট সুরাট কোঙ্কন ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। পহ্লব জাতির আক্রমণ ও পরিশেষে গুপ্ত রাজবংশের উত্থানের ফলে ভারতে শক প্রভুত্ব বিলুপ্ত হয়।

নহপান : রুদ্রদামন

পহ্লব : উত্তর-পশ্চিম ভারতে গন্ধার অঞ্চলে যে-শক রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পহ্লব জাতি কর্তৃক বিজিত হয়। পহ্লবগণ কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পার্থিয়ার অধিবাসী। ভারতের পহ্লব রাজগণের মধ্যে গণ্ডোফার্নিস সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি পেশোয়ার অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে কুষাণ জাতির আক্রমণে পহ্লব শাসনের অবসান ঘটে।

গণ্ডোফার্নিস

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা
[Social and Economic Condition]

সামাজিক অবস্থা : গ্রীক, শক এবং পহ্লব অভিযানের ফলে ভারতীয় সমাজের নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। বিদেশী অভিযাত্রীরা নিজেদের 'দেবপুত্র' এবং পারসিক প্রথা অনুযায়ী নিজেদের সত্রপ বা ক্ষত্রপ অভিধায় অভিহিত করে। অভিযাত্রীদের মধ্যে অনেক বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য বা জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বৈদেশিক প্রভাবান্বিত প্রতি ধর্মের মধ্যেই কয়েকটি ভাগ দেখা দেয়। শিব ও বিষ্ণুর উপাসকদের অনেক মন্দির নির্মিত হয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বলিদান হ্রাস পায়। ধর্মের পাশাপাশি শিল্পকার্যেও রূপান্তর ঘটে। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন বিষয়বস্তু লইয়া গুহাগুলি চিত্রিত হইতে থাকে। গ্রীক প্রভাবে বুদ্ধদেবের অসংখ্য মূর্তি নির্মিত হইতে আরম্ভ করে।

অর্থনৈতিক অবস্থা : এই যুগে জনসমাজের অধিকাংশই ছিল গ্রামীণ কৃষক। বিদেশীদের অভিযানের ফলে ভারতের সহিত মধ্য এশিয়ার সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি পায়। মধ্য এশিয়ার আলতাই পর্বতাঞ্চলের সোনা তখন প্রচুর পরিমাণে ভারতে আসে। তেমনি রোমক সাম্রাজ্য হইতেও ভারতে সোনা আমদানি হইত। চীন হইতে 'রেশম পথ' ছিল পরের যুগে কুষাণদের অধিকারে। এত সোনা পাওয়া যাইত বলিয়াই কুষাণগণ সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিতে পারিয়াছিল।

রাজারা বিভিন্ন শিল্পপ্রসারে অকৃপণ সাহায্য করিতেন। মৌর্য যুগের ন্যায় এই যুগেও শিল্পীদের গিল্ড ও ব্যবসায়ী গিল্ড সব শিল্পকার্য নিয়ন্ত্রণ করিত। জলপথে দাক্ষিণাত্যের সহিত রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। তাহার সহিত দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি দক্ষিন-পূর্ব এশিয়াতেও বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ সম্পদ উপার্জন করিত। বিলাস দ্রব্য, মসলা, মূল্যবান প্রস্তর, এমন কি পাখি, বাঁদর, ময়ূরও রপ্তানী হইত।

মৌর্য শিল্প

মৌর্য সম্রাটগণ বিরাট নির্মাতা ছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য স্তূপ, স্তম্ভ এবং গুহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নির্মিত হইত স্তূপ। স্তূপগুলির মধ্যে সাঁচিতে অশোক কর্তৃক নির্মিত স্তূপটি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। স্তম্ভগুলি কঠিন প্রস্তরে নির্মিত এবং অত্যন্ত মসৃণ হইত। স্তম্ভের উপরে সিংহ কিংবা অন্য কোন পশুর মূর্তি খোদিত থাকিত। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারত সরকার সারনাথের নিকট অবস্থিত অশোকস্তম্ভের উপরের সিংহকে সরকারী নিদর্শন রূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। মৌর্য রাজপ্রাসাদগুলির স্থাপত্যও অতি সুন্দর এবং সেইগুলির অঙ্গসজ্জাও অপরূপ। প্রাসাদগুলি কাষ্ঠ নির্মিত বলিয়া কালের আঘাতে বিলুপ্ত। পাটলিপুত্রের গঠন দেখিয়া মেগাস্থিনিস-এর মনে হইয়াছিল উহা দৈত্যের কাজ।

কণিষ্কের রাজত্বকালের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস

[History of the Kushan Empire with special reference to the reign of Kanishka]

প্রথম কদফিস

কুষাণ বংশ ঃ যে সকল বিদেশী জাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কুষাণ বংশই সর্বপ্রধান। কুষাণগণ চীন দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে বসবাসকারী ইউ-চি জাতির একটি শাখা। হিউং-নু নামক এক যাযাবর জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ইউ-চি গণ অক্ষু নদীর তীরে উপস্থিত হয় এবং তথায় পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হইয়া বসবাস করিতে থাকে। এই পাঁচটি শাখার অন্যতম কুষাণগণ কুজুল কদফিস বা প্রথম কদফিসের নেতৃত্বে অপর শাখাগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করে। প্রথম কদফিস কাবুল উপত্যকা হইতে ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণকে উচ্ছেদ করেন। অতঃপর তিনি পহ্লবের রাজ্য আক্রমণ করিয়া গন্ধার ও দক্ষিণ আফগানিস্তান জয় করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন।

দ্বিতীয় কদফিস

প্রথম কদফিসের মৃত্যুর পর বিম কদফিস বা দ্বিতীয় কদফিস সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব জয় করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার সময়েই কুষাণ সাম্রাজ্য উত্তর প্রদেশে বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শকক্ষত্রপ নহপান তাঁহার অধীনস্থ সামন্তরূপে পশ্চিম ভারত শাসন করিতেন বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন। বিম কদফিস মহেশ্বর শিবের উপাসক ছিলেন।

কণিষ্ক ঃ বিম কদফিসের মৃত্যুর পর কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন কণিষ্ক। পূর্বতন সম্রাটের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নিশ্চিতরূপে স্থির করা সম্ভব না হইলেও তিনি ছিলেন কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার রাজত্বকালে কুষাণ বংশের চরম শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল এবং উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও কুষাণ যুগ রীতিমত উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকদের মতে ৭৮ খ্রীঃ হইতে ১৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন একটি কালে কণিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ৭৮ খ্রীঃ হইতে এক নূতন সংবৎ প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে ইহা 'শকাব্দ' নামে পরিচিত হয়। ভারত সরকার শকাব্দ অনুসরণ করেন। ইতিহাসে তিনি শকাব্দ-প্রচলন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি সর্বান্তকরণ পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই স্মরণীয়।

কাল নিরূপণ

কুষাণগণ প্রথম যুগে উত্তর ভারত এবং নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলে তাহাদের রাজ্য বিস্তার করে। মথুরা, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, বারাণসী পর্যন্ত কুষাণ যুগের মুদ্রা পাওয়া যাওয়ায় মনে হয় ঐ সকল অঞ্চল ছিল কুষাণ সাম্রাজ্যভুক্ত। তাহাদের সাম্রাজ্য দক্ষিণে সাঁচী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; পূর্ব সীমানা ছিল বারাণসী, প্রধান রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা বর্তমান পেশোয়ার এবং মথুরা ছিল দ্বিতীয় রাজধানী।

সাম্রাজ্য



কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

কণিষ্ক একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। তিনি ভারতের বাহিরে সুং-লি পর্বতমালার পূর্ব পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন এবং একজন চীনা রাজকুমারকে প্রতিভূস্বরূপ নিজ রাজসভায় আনয়ন করেন। আফগানিস্তান পাঞ্জাব কাশ্মীর সিন্ধু ও উত্তরপ্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। রাজপুতানা মালব এবং কাথিয়াবাড় অঞ্চলের অধিপতিগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। চীনা ও তিব্বতী কিংবদন্তীতে তাঁহার সাকেত ও পাট লিপু বিজয়ের উল্লেখ আছে।

দিগ্বিজয়

ক্ষত্রপ এবং মহাক্ষত্রপ নামধারী শাসনকর্তাগণ কুষাণ সাম্রাজ্যের নিজ রাজধানী পুরুষপুরে (পেশোয়ার) বাস করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে কণিষ্ক চীন-সম্রাট হোতির বিরুদ্ধে এক অভিযান করেন। কিন্তু তিনি চৈনিক সেনাপতি প্যান-চাও কর্তৃক পরাজিত হইয়া চীন-সম্রাটকে কর প্রদানে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হন।

কণিষ্কের মৃত্যুর পর হইতেই কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়। কণিষ্কের পর বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ই কুষাণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইতে থাকে। অবশেষে কুষাণ বংশের আধিপত্য উত্তর-পশ্চিম ভারতে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে সমুদ্রগুপ্তের নিকট এই অঞ্চলের কুষাণগণ আনুগত্য স্বীকার করিলে ভারতে কুষাণ শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয়।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা : কণিষ্ক দিগ্বিজয়ী সম্রাট মাত্র ছিলেন না। বৌদ্ধগণ কণিষ্ককে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলিয়াই জানিত। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও তিনি অশোকের মতো অস্ত্রত্যাগ করেন নাই। বিভিন্ন বিদেশী রাজারা ভারতে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করায় বৌদ্ধধর্মে নানা বিতর্ক দেখা দেয়। তাহার মীমাংসার জন্য কণিষ্ক কাশ্মীরের কুন্দবনে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন। অমীমাংসিত অবস্থাতে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান—এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মহাযানপন্থীরা বুদ্ধদেবকে দেবতারূপে অর্চনা করিতে আরম্ভ করে ও তাঁহার মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। কণিষ্ক মহাযান পন্থা অনুসরণ করিয়া মধ্য এশিয়া ও চীনে প্রচারক প্রেরণ করিয়া মহাযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কণিষ্ক বিদ্যাচর্চা ও শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন মহাকবি অশ্বঘোষ এবং বিজ্ঞানী নাগার্জুন, বসুমিত্র ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা ভিষগাচার্য চরক।

চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি

শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

কণিষ্ক আবার বিরাটাকার চৈত্যসমূহের স্রষ্টা ছিলেন। পেশোয়ারের নিকট ৪০০ ফুট উচ্চ চৈত্য নির্মাণ তাহার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য। কণিষ্কপুর নাম দিয়া তিনি কাশ্মীরেও একটি মনোরম নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় গন্ধার শিল্পের অপূর্ব বিকাশ ঘটে।

স্থাপত্য কীর্তি

কুষাণযুগে বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ : মৌর্য সম্রাটগণ সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে সুনির্মিত সড়ক রচনা করায় মধ্য-এশিয়া অঞ্চলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। ভারতবর্ষের গ্রীক-রাজারা পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে আগ্রহী ছিলেন। শক, পহ্লব ও কুষাণদের রাজত্বকালে মধ্য এশিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পরিধির মধ্যে আসিয়া পড়িল। চীনের সহিতও ব্যবসায়ী সংযোগ এই সময়ে ঘটিল। ব্যবসায়ীদের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও ঐসব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। চীনের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি হয় ৬৫ খ্রীঃ, সেখানে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণের পর। চীনের পথে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় বৌদ্ধগণ সেখানে বিশ্রাম লইতেন, সেখানকার অধিবাসীরাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। এইজন্য স্যার অরিয়েল স্টাইন মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ইয়ারখন্দ, খোটান, কানাগড়, তাসখন্দ প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার নগরগুলিতে ভ্রমণ করিলে মনেই হয় না যে তিনি ভারতের বাহিরে আছেন।

ভারত ইতিহাসে কুষাণযুগের গুরুত্ব : ভারত ইতিহাসে নানা দিক দিয়া

কুষাণ যুগের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। কুষাণ যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত নূতন বিষয়বস্তুর মিশ্রণে তাহা সমৃদ্ধতর হইয়াছে। বৈদেশিক হইলেও তাহারা ভারতীয় জনসত্তায় মিশিয়া নবতর ভারতীয় সংস্কৃতি গঠনে সহায়তা করিয়াছে। মধ্য এশিয়া ও চীনের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় ভারত-চীন সম্প্রীতি নিবিড়তর হইয়াছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের মধ্য দিয়া কুষাণগণ ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কাঠামো রচনা করে। বিজেতারূপে ভারতীয় সমাজে তাহারা বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়া ক্ষত্রিয় রূপে পরিগণিত হয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজপতিদের পক্ষে তাহাদের সমাজ-চ্যুত করার ক্ষমতা হয় নাই। তবে তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষত্রিয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।



গন্ধার শিল্প

বৌদ্ধধর্মে মহাযানপন্থীদের উদ্ভব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহাযানী বৌদ্ধধর্মই স্থলপথে মধ্য এশিয়া দিয়া চীনে প্রচারিত হইয়া ইহাকে বিশ্বধর্মের রূপ দান করে। অসংখ্য স্তূপ, চৈত্য-মঠ নির্মাণ ও বুদ্ধমূর্তির ভাস্কর্য ভারতীয় শিল্পরীতিতে যুগান্তর আনিল।

গন্ধার শিল্প

বিদেশী রাজারা ভারতীয় শিল্পকলার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক হইয়া নবদীক্ষিতদের বৈশিষ্ট্য লইয়া শিল্পপ্রসারে ব্রতী হন। তাঁহারা দেশবিদেশ হইতে নিপুণ শিল্পী, তক্ষক, স্থপতি ও রাজমিস্ত্রী আনিয়া এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় কারিগর ও শিল্পীরা গ্রীক ও রোমক শিল্পীদের সাহচর্যে যে নূতন ভাস্কর্য রীতির প্রবর্তন করে, তাহা উত্তর-পশ্চিমে গন্ধার অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ছিল। গ্রীক-রোমক রীতিতে বুদ্ধ মহাবীরের মূর্তি নির্মাণ এ যুগের বিশেষ ভাস্কর্য কৃতি। গন্ধার অঞ্চলে প্রচলিত বলিয়া ইহা গন্ধার শিল্প রূপে পরিচিত।

সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চা

বিদেশী রাজারা সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। বুদ্ধদেবের বাণী এ যুগে সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হয়। অশ্বঘোষ রচনা করিলেন বুদ্ধ চরিত এবং সৌন্দবানন্দ। মহাযানপন্থীরা রচনা করিলেন নানা 'অবদান'। বৈদেশিক রাজাদের সহায়তায় ভারতে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রেক্ষাপট গ্রীক (যবন)দের নিকট হইতে লওয়ায় ইহা 'যবনিকা' নামে পরিচিত হইল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রও গ্রীক সংস্পর্শে নানাভাবে বিকশিত হইয়া ওঠে। তবে ভেষজ ও চিকিৎসা বিদ্যায় ভারতীয়গণ চরক ও

সুশ্রুতের অবদানে ধন্য হইয়াছিল। প্রযুক্তিবিদ্যায় রোমক ও গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ভারত উন্নততর মুদ্রার নির্মাণ আরম্ভ করে। কাঁচশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ এ যুগে বৈদেশিকদের দান হইলেও ভারত ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সাতবাহন সাম্রাজ্য
[The Satabahan Empire]

সাম্রাজ্যের বিস্তার ঃ দাক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের দেশীয় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাম্রাজ্য ছিল সাতবাহন। এই বংশের উত্থানের সহিত ভারত-ইতিহাসে উত্তর-দাক্ষিণাত্য পূর্ণভাবে তাহার ভূমিকা পালনে অগ্রসর হয়। পুরাণে যাহাদের অন্ধ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদেরই সাতবাহন বলিয়া ধরা হয়। পুরাণে অন্ধ্রদের ৩০০ বৎসর রাজত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যভারতে কন্বদের পরাজিত করিয়া যখন তাহারা ঐ অঞ্চলে আপন রাজ্য বিস্তার করে, তখন খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে রচিত শিলালিপিতে তাহাদের সন্ধান মেলে। আদি সাতবাহনগণ অন্ধ্রের পরিবর্তে মহারাষ্ট্রেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের যে অঞ্চলে প্রধানত নানা জাতীয় শস্য উৎপন্ন হয়, গোদাবরী অববাহিকার সেই উচ্চাংশে তাহারা প্রথম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। বর্তমান নাসিক-কে ঘিরিয়া দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। কৃষ্ণা-গোদাবরী নদী-দুইটির ব-দ্বীপ অঞ্চল হইতে ইহারা গোদাবরীর তীর ধরিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া আসে। ক্রমে ক্রমে তাহারা কর্ণাটক ও অন্ধ্রে তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত করে।

রোমিলা থাপার বলেন, সম্ভবত সাতবাহনরা মৌর্যদের শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পুরাণে আছে দাক্ষিণাত্যে শুঙ্গদের যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, সাতবাহনরা তাহাও ধ্বংস করে।

এককালে মহারাষ্ট্রে ও পশ্চিম ভারতে শকগণ কর্তৃক সাতবাহনগণ রাজ্যচ্যুত হইতে বাধ্য হয়। তাহাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী (১০৬ – ১৩০ খ্রীঃ)। তাঁহার আমলে সাতবাহন সাম্রাজ্য উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক এবং সম্ভবত সমগ্র অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ছিলেন সাতবাহন রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। দিগ্বিজয়ী সম্রাটরূপে চতুর্দিকে রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁহার খ্যাতি।

দিগ্বিজয়

সাতবাহনদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শকদের নিকট হইতে তিনি গুপ্তরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। শকদের ক্ষহরত শাখার প্রবল পরাক্রান্ত নহপানকেও তিনি পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। শকদের কবল হইতে তিনিই মালব ও কাথিয়াবাড় দখল করেন। তিনি ছিলেন "পশ্চিমাঞ্চলের প্রভু"। তাঁহাকে 'পইলাস'-এর প্রভুও বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের আধুনিক 'পইথাম' হইতেছে তদানীন্তন প্রতিষ্ঠান নগর। সাতকর্ণী সাঁচী দখল করিলে তাঁহাকে একটি শিলালিপিতে 'রাজন শ্রী সাতকর্ণী' নামে

অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার পরে তিনি আরও দক্ষিণে অভিযান চালাইয়া গোদাবরী অববাহিকা জয় করিয়া উপাধি গ্রহণ করেন "দক্ষিণাপথপতি"। খারবেলের মতে উল্কাগতি দিগ্বিজয়ীও তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে গৌতমীপুত্র এবং তাঁহার পুত্র বাশিষ্ঠিপুত্রের রাজত্বকালে সাতবাহন রাজ্য বিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া ভারত-ইতিহাসে স্বীকৃত হইয়াছে। গৌতমীপুত্র শকদের গর্ব খর্ব করিয়া ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময়ে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের ভিতর দাক্ষিণাত্য মিলনের সেতু হইয়া দাঁড়ায়। তাহার ফলে উত্তর-দক্ষিণে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও নূতন নূতন ভাব-বিনিময় ঘটিতে থাকে। গৌতমীপুত্র চারিটি বর্ণের মধ্যে মিশ্রণ বন্ধ করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ বা দ্বিজদের স্বার্থরক্ষার্থে নানা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর পরেই সাতবাহন বংশের অবক্ষয় আরম্ভ হয়। তখন আর বেশি দিন সে রাজ্য টিঁকিয়া থাকে নি।

কৃতিত্ব

সাতবাহন যুগের অবদান ঃ সাতবাহন যুগের সর্বপ্রধান অবদান উত্তর ভারত ও স্থানীয় দাক্ষিণাত্যের সংহতির সমন্বয়-সাধন। কোলার স্বর্ণখণির সোনা তাহারা ব্যবহার করিত। করিমনগরে পোড়া ইটের দালানের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু সমৃদ্ধ নগরও সেখানে ছিল। এযুগে কারিগরি ও শিল্পের প্রসার ঘটায় বহু ব্যবসায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাহারা মুক্ত হস্তে বৌদ্ধ-ব্যাপারে দান ধ্যান করিত। সাতবাহন সমাজে মাতার প্রাধান্য ছিল বেশী এবং তাঁহার নামেই বংশ-পরিচয় ঘটিত। তবে সিংহাসন লাভ করিত জ্যেষ্ঠ পুত্র। সাতবাহন-রাজগণ ধর্মশাস্ত্র অনুসারে রাজ্যশাসনের চেষ্টা করিতেন। পাহাড় কাটিয়া অনেক চৈত্য ও বিহার এই যুগে নির্মিত হয়। সাতবাহন রাজাদের ভাষা ছিল প্রাকৃত।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস
[History of the Gupta Empire]

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধে গুপ্ত নামক একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। গুপ্তবংশীয় রাজগণের শাসনকাল ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। দীর্ঘকাল পর ভারতবর্ষ পুনরায় গুপ্ত সম্রাটগণের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ঐক্যের পথে অগ্রসর হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ সম্ভবত কোন নরপতির অধীনস্থ সামন্তরূপে মগধ বা বাংলার কোন ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঃ ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। প্রথম দুই জন গুপ্ত নৃপতি যেরূপ নিজেদেরকে সামন্ত পদমর্যাদাজ্ঞাপক 'মহারাজা' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রথম চন্দ্রগুপ্তও নিজেকে 'মহারাজাধিরাজ'-রূপে ঘোষণা করিয়া নিজের শক্তি ও প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করিয়া একটি সংবতের প্রবর্তন করেন। তাঁহার স্বর্ণমুদ্রা হইতে জানা যায় তিনি

বৈশালীর লিচ্ছবি রাজদুহিতা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা সঠিক জানা যায় নাই। কোন কোন পুরাণে প্রয়াগ (উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল), সাকেত (অযোধ্যা) এবং মগধ (দক্ষিণ বিহার) গুপ্ত শাসনাধীন ছিল বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। সমগ্র বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ ও বঙ্গদেশের কিয়দংশ লইয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্ত যে সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে একটি দৃঢ় পদক্ষেপস্বরূপ।

সমুদ্রগুপ্ত ঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তকে যোগ্যতম মনে করিয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্যবিস্তারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক দিগ্বিজয়ে বাহির হন। এলাহাবাদে একটি স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণ রচিত 'রাজপ্রশস্তি' সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের কাহিনী অমর করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর ভারতে তিনি রুদ্রদেব, মাতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মন, গণপতি, নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্মন প্রভৃতি রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য জয় করেন। এই সকল রাজগণ কে কোথায় রাজত্ব করিতেন তাহা সঠিকভাবে জানা না গেলেও সমুদ্রগুপ্তের আর্যাবর্ত অভিযানের ফলে অহিচ্ছত্রা, পদ্মাবতী, মথুরা, গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল এবং পূর্ব মালব গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাভূত চন্দ্রবর্মন পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। কোটবংশীয় জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত পূর্ব পাঞ্জাবের কিয়দংশ অধিকার করেন। পশ্চিম মালবের শক অধিপতি তৃতীয় রুদ্রসেন তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। গাজীপুর-জব্বলপুর অঞ্চলের অরণ্যরাজ্যগুলিও সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

দিগ্বিজয়, শক দমন

উত্তর ভারতে নিজের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত বিজয়ে অগ্রসর হন। তিনি বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করিয়া প্রথমে দক্ষিণ কোশলের (মধ্যপ্রদেশের রায়পুর, বিলাসপুর, রায়গড় ও উড়িষ্যার সম্বলপুর জিলা) রাজা মহেন্দ্রকে পরাজিত করেন। ইহার পর একে একে মহাকান্তার (দণ্ডকারণ্য অঞ্চল)-এর ব্যাঘ্ররাজ, কুরল (পশ্চিম গোদাবরী জিলা)-এর মণ্টরাজ, কোট্টুর (শ্রীকাকুলাম জিলার কোথুর)-এর স্বামীদত্ত, পিষ্টপুর (পশ্চিম গোদাবরী জিলা)-এর মহেন্দ্র গিরি, এরণ্ডপল্ল (বিশাখাপত্তনম জিলা)-এর দমন, কাঞ্চীরাজ বিষ্ণুগোপ, বেঙ্গী (এলোর অঞ্চল)-এর রাজা হস্তীবর্মা, পালক্ক (নেলোর জিলা)-এর রাজা উগ্রসেন, অবমুক্তের অধিপতি নীলরাজ, দেবরাষ্ট্ররাজ (বিশাখাপত্তনম জিলার কিয়দংশ) অধিপতি কুবের এবং কুস্থলপুররাজ ধনঞ্জয় সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। সুদূর পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণ ভারত শাসন করা অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া সমুদ্রগুপ্ত আনুগত্যের শর্তে নববিজিত রাজ্যগুলি পূর্বতন শাসকবর্গকেই প্রত্যর্পণ করেন। ইহা গুপ্ত সম্রাটের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

সমুদ্রগুপ্তের পরাক্রমে ভীত হইয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত রাজ্যগুলি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া করদরাজ্যে পরিণত হয়। এই সকল প্রত্যন্ত রাজ্যের মধ্যে

ছিল সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ), ডাবক (আসামের নওগাঁ জিলা), কামরূপ (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা), নেপাল এবং কর্তৃপুর (সম্ভবত উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন-আলমোড়া অঞ্চল)। ইহা ব্যতীত পাঞ্জাব, মালব এবং পশ্চিম ভারতের বহু উপজাতি তাঁহাকে করপ্রদানে স্বীকৃত হয়। ইহাদের মধ্যে পূর্ব রাজস্থান এবং মান্দাসোর অঞ্চলের মালব, জয়পুর-আলোয়ার অঞ্চলের অর্জনায়ন, শতদ্রু তীরবর্তী ভাওয়ালপুর অঞ্চলের যৌধেয়, শিয়ালকোট অঞ্চলের মুদ্রক এবং আভীর, প্রার্জুন, খরপারিক, সনকানিক ও কাকগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযান উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ ও শক-মুরুণ্ড রাজগণকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। উপঢৌকন প্রেরণ ও আনুগত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহারা গুপ্ত সম্রাটের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। সিংহল ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরাও অনুরূপভাবে গুপ্ত সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে যাহা উল্লিখিত আছে তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্কের নিদর্শনস্বরূপ এই সকল দেশ হইতে সমুদ্রগুপ্তের নিকট দূত প্রেরণ করাকেই প্রশস্তিকা আনুগত্যের প্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

বহু যুদ্ধ করিয়া যে-বিশাল সাম্রাজ্য সমুদ্রগুপ্ত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ সামরিক কৃতিত্বের ফল। পৃথকভাবে এই সকল যুদ্ধাভিযানের বিবরণ হরিষেণের প্রশস্তি হইতে পাওয়া না গেলেও উত্তর ভারতের নয়জন নরপতিকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা গুপ্ত সম্রাটের রণনিপুণতা ভিন্ন সম্ভব হয় নাই। দুর্গম অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি সুদূর দক্ষিণে অভিযান করিতে দ্বিধা করেন নাই। সম্পূর্ণ অপরিচিত অঞ্চলে সাফল্যের সহিত যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করিয়া তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে সার্বভৌমত্বসূচক এই অনুষ্ঠান পালন করিবার মতো অপর কোন যোগ্য নরপতিই তাঁহার পূর্বে কিংবা পরে আবির্ভূত হয় নাই। তিনি স্বীয় সামরিক কৃতিত্বের পরিচায়করূপে 'সর্বরাজচ্ছেত্তা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ান' আখ্যায় ভূষিত করিয়া গুপ্ত সম্রাটের যথার্থ পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বিশাল ভূভাগ একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রাখা সম্ভব নয়। এই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি গুপ্ত সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসনকে উত্তর ভারতের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। এই অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের প্রান্ত হইতে পূর্ব পাঞ্জাব ও পূর্ব রাজস্থান এবং হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বিন্ধ্যপর্বত বিস্তৃত ছিল। প্রত্যন্ত দেশগুলিকে করদ মিত্ররাজ্যে পরিণত করিয়া তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্তকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণের নরপতিগণও অনুরূপভাবে গুপ্ত সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া স্ব স্ব রাজপদ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঃ সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর আঃ ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি গুপ্তরাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি ৩৭৫ খ্রীঃ হইতে ৪১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক বিশেষ। 'দেবী চন্দ্রগুপ্তম' নামে একটি নাটকে দেখা যায়. সমুদ্রগুপ্তের পরে সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগুপ্ত। তিনি শকদের নিকট পরাজিত হইয়া স্ত্রী ধ্রুবদেবীকে শক রাজার হস্তে দান করিতে স্বীকৃত হন। চন্দ্রগুপ্ত তখন ধ্রুবদেবীর ছদ্মবেশে শকরাজার শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। ইহার পরে রামগুপ্তকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রধান যুদ্ধ ছিল শকদের বিরুদ্ধে। সেজন্য তাঁহার উপাধি হয় 'শকারি বিক্রমাদিত্য'। ২১ বৎসর যুদ্ধের পর শক অধিপতি তৃতীয় রুদ্রসিংহকে পরাজিত করিয়া শেষ শক রাজ্য গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারত হইতে তিনশত বৎসরাধিক ব্যাপী বিদেশী শাসনের অবসান হয়। অতঃপর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে, উজ্জয়িনীর অধিপতিরূপে যে বিক্রমাদিত্য প্রাচীন কিংবদন্তীতে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তিনি গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া আর কেহই নহেন। কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য কর্তৃক 'শকারি' উপাধি গ্রহণও এই মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করে। তিনি নাগরাজদুহিতা কুবের নাগকে বিবাহ করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। দক্ষিণ ভারতের কদম্বরাজ কাকুস্থবর্মনের কন্যাকেও তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সহিত মহারাষ্ট্র অঞ্চলের বাকাটক নরপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ দিয়া দাক্ষিণাত্যের একটি বৃহৎ শক্তির মিত্রতা অর্জন করেন। এইরূপে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিজ সাম্রাজ্যকে মিত্ররাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিমের শক অধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময়ে পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলি রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল। চন্দ্রগুপ্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বন্দরগুলি অধিকার করিতে না পারিলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সহিত পশ্চিম জগতের বাণিজ্য একটি বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া থাকিবে। সুতরাং, শকদিগের বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার নহে, জলপথে ভারতে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ কাথিয়াবাড়-সৌরাষ্ট্রের উপকূলাঞ্চল জয় করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

তাহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী

কিংবদন্তীর চরিত্র

দিল্লীর কুতবমিনারের নিকট সুপ্রাচীন লৌহস্তম্ভের গাত্রে চন্দ্র নামক এক নরপতির দিগ্বিজয়ের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। তিনিই প্রথম বঙ্গদেশের নৃপতিগণের একটি সম্মিলিত প্রতিরোধ ধ্বংস করেন। অতঃপর তাহার বিজয়বাহিনী নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তথা হইতে চন্দ্র বহ্লীক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এই দিগ্বিজয়ী নরপতি ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—একই ব্যক্তি।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে মগধে যে-একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সমুদ্রগুপ্ত বাহুবলে তাহাকে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সেই সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হইয়া অখণ্ড ভারতের সাধনাকে বহুলাংশে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

ফা-হিয়েন-এর সাক্ষ্য ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৪১০ খ্রীঃ) বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বৌদ্ধ তীর্থ দর্শনের জন্য ভারত পরিক্রমায় আসিয়াছিলেন। গুপ্ত যুগের সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থই নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকে তিনি মধ্যদেশ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, জনবহুল এই রাজ্যের লোকেরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবন কাটাইত, জনসাধারণ সরকারী হস্তক্ষেপ-মুক্ত জীবন যাপনে সক্ষম ছিল। জমির আবাদী ফসলের একাংশ তাহাদের রাজকোষে কর হিসাবে দিতে হইত। দণ্ডবিধি তেমন কঠোর ছিল না। সাধারণ অপরাধীদের জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তবে রাজদ্রোহের কঠোর শাস্তি বিধান হইত।

স্বাচ্ছন্দ্য জীবন

অধিকাংশ মানুষ ছিল নিরামিষাশী ও অহিংস। মাংস ভক্ষণ, মদ্য পান অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল। চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্ন জাতীয়েরা নগরের বাহিরে বাস করিত। সাধারণ লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। ধনীরা জনসাধারণের দাতব্য চিকিৎসাগার স্থাপন করিত। পথিকদের নিমিত্ত পান্থশালা ও বিশ্রামাগার ছিল। পথে দস্যু-তস্করের ভয় ছিল না।

রাজধানী পাটলিপুত্রে হীনযান ও মহাযান—উভয় পন্থার উপাসকদের বিভিন্ন বিহার ছিল। ফা-হিয়েনের মতে, প্রায় প্রতিটি মঠে ৫।৭ হাজার ভিক্ষু বাস করিত। নাগরিক জীবন ছিল আরামদায়ক। পাঞ্জাব, মথুরা ও বাংলায় বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় ছিল।

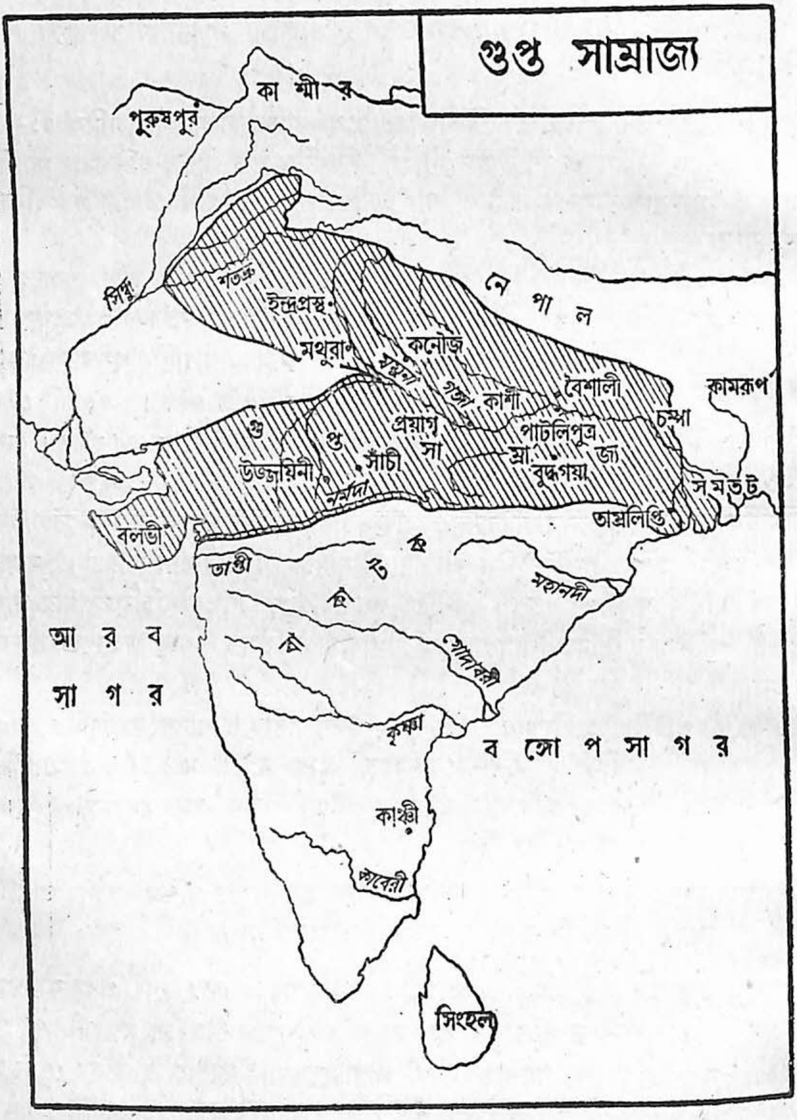
ধর্ম্মমত

এগারো বৎসর ভারতে কাটাইয়া ফা-হিয়েন অবশেষে বাংলার পশ্চিম অংশের তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক) বন্দর দিয়া জলপথে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রথম কুমারগুপ্ত ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত রাজা হন। তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া রাজত্ব করেন এবং নূতন রাজ্যজয় না করিলেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে পুষ্যমিত্র নামক এক উপজাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া পুষ্যমিত্রগণকে পরাজিত করেন। বিজয়ী রাজকুমার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই কুমারগুপ্তের মৃত্যু ঘটে।

স্কন্দগুপ্ত ঃ কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদের ইঙ্গিত কয়েকটি শিলালিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের

পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ হূণজাতির একটি শাখা হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং গুপ্ত



সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাহারা স্কন্দগুপ্তের সামরিক শক্তির নিকট সম্পূর্ণ পরাভূত হয়। এইভাবে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় তিনি দ্বিতীয় বার বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। একই সময়ে হূণ আক্রমণে বিপুল শক্তিশালী রোমক সাম্রাজ্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং রোম নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল,

ঠিক তখনই তাহাদের একটি শাখাকে পরাজিত করিয়া স্কন্দগুপ্ত কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই। ইহার ফলে ভারতবর্ষ হূণদিগের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পায় এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে রাজসিংহাসন লইয়া বিবাদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া দেয়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বুদ্ধগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন কিছুকালের জন্য রোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর রাজপরিবারের অন্তর্বিরোধ, হূণ আক্রমণ, সামন্ত নরপতিদের বিদ্রোহ প্রভৃতির ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

গুপ্তযুগে সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বিরাট উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহাতে যেন ভারতে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল। বহু ঐতিহাসিক সেইজন্য এই যুগকে ভারতের সুবর্ণযুগ বলিয়া বর্ণনা করেন। গুপ্ত যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবদমান প্রজাতন্ত্রগুলির বিলুপ্তি ঘটে; তাহার স্থলে দেখা দেয় প্রবল পরাক্রমশালী কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্র। রাজা দৈবপ্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করেন। গুপ্তযুগ ছিল সাম্রাজ্যবাদী। কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে ছিল আর্যাবর্ত; দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি ছিল কর-প্রদানকারী অধীন রাজ্যবিশেষ।

গুপ্ত সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

এই যুগ ন্যায় বিচারের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য তাঁহার ন্যায় বিচারের জন্যই ভারতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ভারতের বুকে বহু বিদেশীর সমাগম ঘটায় বহু নূতন নূতন জাতি সৃষ্টি হয়। সমাজে মহিলাদের ছিল মর্যাদার আসন। কখনও তাহাদের প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করা হইত। ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের ফলে বহু সমৃদ্ধ নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তবে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানে এযুগের তুলনা নাই। এই যুগেই অজন্তার অবিস্মরণীয় চিত্রাবলী অঙ্কিত হয় এবং কালিদাসের কাব্য, আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ জ্যোতির্বিদদের রচনা প্রকাশিত হয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘকাল ভারতের ইতিহাসে কোন প্রবল কেন্দ্রীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে নাই। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি, কনৌজের মৌখরী, মালবের গুপ্ত এবং কামরূপের বর্মনবংশীয় রাজগণ শক্তিশালী হইয়া ওঠে। গৌড়দেশেও শশাঙ্কের অধীনে দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি হইতে থাকে।

6

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম
[Struggle for Domination]

উত্তর ভারত

হূনদের প্রসঙ্গ - যশোধর্মন
[Reference to the Hunas—Yasodharmana]

হূণগণ আদিতে মধ্য এশিয়ায় বসবাস করিত। পারস্য হইতে মধ্য এশিয়ার খোটান পর্যন্ত তাহাদের শাসন বিস্তৃত ছিল। তাহারা দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহাদের মধ্যে বিশাল দেশত্যাগ শুরু হয়—একদল পশ্চিমে ইউরোপের রোমক সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। শ্বেতহূণ নামে পরিচিত অন্যদল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে প্রবেশ করে। বার্মিয়ানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহারা আফগানিস্থানে ঘাঁটি গাড়িয়া বসে। গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত তাহাদের ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া ভারত হইতে বিতাড়িত করেন। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ দুর্বল হওয়ায় ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর ন্যায় হূণদের স্রোত ভারতে আসিতে থাকে। হূণ নেতা তোরমান হিন্দুকুশের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মালব জয় করিয়া হিন্দুভাবাপন্ন মহারাজা তোরমান উপাধি ধারণ করে।

তোরমান

তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র মিহিরকুল হূণ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার মুদ্রা হইতে দেখা যায় যে, তিনি শৈব ছিলেন। তিনি পিতার মতোই নৃশংস এবং নিষ্ঠুর ছিলেন। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি এমন রক্তপিপাসু ছিলেন যে পর্বতচূড়া হইতে হস্তীকে নিম্নে ফেলিয়া তাহার মৃত্যু-যাতনার আনন্দ তিনি উপভোগ করিতেন। পাঞ্জাব হইতে মিহিরকুল মালব ও রাজপুতানা শাসন করিতেন।

মিহিরকুল

তাঁহার বিজয়-অভিযান রোধ করিতে গিয়া গুপ্তদের সামন্ত ভূপতি গোপরাজা মৃত্যুবরণ করেন। তবে যশোধর্মন নামে অন্য এক সামন্তপ্রভু যুদ্ধে ভীষণভাবে মিহিরকুলকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। যশোধর্মনের লিপি হইতে মিহিরকুলের সহিত সংগ্রামের কাহিনী জানা যায়।

যশোধর্মন

যশোধর্মনের মৃত্যুর পর মিহিরকুল আবার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে বালাদিত্য কর্তৃক প্রতিহত হন। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মিহিরকুলকে পরাস্ত করিয়া বালাদিত্য বা নরসিংহগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তখন মিহিরকুল পাঞ্জাব ও কাশ্মীরেই রাজত্ব করিতে

বালাদিত্য

থাকেন। এখানে তিনি একটি সূর্য মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত।

ভারতে হূণ অভিযানের ফল হইয়াছিল অতি সুদূরপ্রসারী। প্রথমত ক্রমাগত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে গুপ্ত সম্রাটদের শক্তি এত ক্ষয় হইয়া যায় যে, সামন্ত প্রভুরা স্বাধীন হইয়া ওঠে। গুপ্ত যুগের রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি গেল বিনষ্ট হইয়া। পশ্চিম ভারতে হূণ অভিযানের ফলে ভারতের সহিত রোমক সাম্রাজ্যের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহার ফলে পশ্চিম ও মধ্য ভারতের অর্থ নৈতিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল হূণদের সহিত আরও বিভিন্ন জাতির অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় জনসমাজে নানা পরিবর্তন ঘটে। রাজপুত জাতির অনেকেই হূণ বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ধারণা।

ফলাফল

শশাঙ্কের অধীনে গৌড়ের অভ্যুদয়

[Rise of Gouda under Sasanka]

গৌড়—শশাঙ্ক ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গদেশের সামন্ত নরপতিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পূর্ব ভারতের এই প্রান্তে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। সপ্তম শতকের প্রারম্ভে গৌড়রাজ শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙামাটি গ্রামের সন্নিকটে) রাজধানী স্থাপন করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প কিছুকালের মধ্যেই গৌড় উত্তর ভারতে এক বিশিষ্ট শক্তিতে পরিণত হয়। গঞ্জাম জিলার একটি তাম্রশাসন হইতে দেখা যায় ৬১৯ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গ হইতে উড়িষ্যার গঞ্জাম জিলা অবধি ভূভাগের সর্বময় অধীশ্বর ছিলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত মিলিত হইয়া উত্তর ভারতে ক্রমবর্ধমান পুষ্যভূতি-মৌখরী প্রাধান্য ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হন। মালবরাজ দেবগুপ্ত পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা কনৌজের মৌখরীরাজ গ্রহবর্মাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। কিন্তু প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধনের হস্তে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হন। ইতিমধ্যে শশাঙ্ক সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া রাজ্যবর্ধনের সম্মুখীন হইলেন। তিনি কূট-কৌশলে অথবা যুদ্ধে রাজ্যবর্ধনকে নিহত করেন। রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে সংকল্প করেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনও শশাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হইয়া শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কোনরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যুকাল (আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত শশাঙ্ক স্বাধীন নরপতিরূপে উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য মগধ এবং গৌড়বঙ্গ সহ উড়িষ্যার গঞ্জাম জিলা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যে সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহণে প্রায় সফল হইয়াছিল, তাহা পরবর্তীকালে বাংলার পাল নরপতিগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা

হর্ষবর্ধনের রাজ্য জয়
[Conquests of Harshavardhana]

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে) এবং ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ও ভগিনী রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধনের উদ্দেশ্যে কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হন। বাণভট্টের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি বিন্ধ্যারণ্য হইতে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কনৌজের সিংহাসন তিনি অধিকার করেন। তাঁহার অধীনে কনৌজ ও থানেশ্বর ঐক্যবদ্ধ হইয়া এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইল। অতঃপর হর্ষবর্ধন থানেশ্বর হইতে কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতে রাজ্যশাসন পরিচালনা করিতে লাগিলেন।


হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে নিহত না করিতে পারিলে তিনি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিবেন। কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মনও শশাঙ্কের শক্তি-বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া হর্ষবর্ধনের সহিত মিলিত হন। কিন্তু উভয়ের সম্মিলিত বাহিনী ও শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে সক্ষম হয় নাই।

হিউয়েন সাঙের বর্ণনা হইতে মনে হয় মৃত্যুকাল (৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত শশাঙ্ক স্বাধীন নরপতিরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন পূর্ব ভারত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মা-তোয়ান-লিন-এর রচনায় হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য কর্তৃক ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'মগধরাজ' উপাধি গ্রহণের উল্লেখ আছে। ইহার পর হর্ষবর্ধন বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন। তথা হইতে তিনি উড়িষ্যা অভিযানে অগ্রসর হন। চৈনিক

হিউয়েন সাঙ

পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ গমন করিবার পূর্বে হর্ষবর্ধন কর্তৃক উড়িষ্যার কোঙ্গদ (গঞ্জাম জিলা) পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল বিজিত হইতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের শাসন পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। রাজ্যের সমস্ত কার্য হর্ষ স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেন। দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। ফলে, দেশের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিত।

হর্ষবর্ধন পশ্চিম ভারত বিজয়ের উদ্দেশ্যে সুরাষ্ট্রের বলভী রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেন হর্ষবর্ধনের নিকট পর্যুদস্ত হইতে থাকেন। কিন্তু

বলভী রাজ্য

ভৃগুকচ্ছের গুর্জর-প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় দন্তী বলভীরাজের সাহায্যে অগ্রসর হন এবং হর্ষবর্ধনকে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। হর্ষবর্ধন নিজ কন্যার সহিত ধ্রুবসেনের বিবাহ দিয়া কনৌজ ও বলভীকে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করেন।

বাণভট্ট তাঁহার 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হর্ষবর্ধন সিন্ধু রাজ্যের সৌভাগ্য হরণ করিয়াছিলেন। এই উক্তি হইতে অনুমান করা যায়, কনৌজরাজ সিন্ধুদেশে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সিন্ধুরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হর্ষবর্ধনের সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। হিউয়েন সাঙ তাঁহার ভ্রমণকালে সিন্ধুদেশটিকে একটি স্বাধীন শক্তিশালী রাজ্যরূপে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবত কাশ্মীরেও হর্ষবর্ধনের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ভগবান লাল ইন্দ্রজী, বুহ্‌লার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, হর্ষবর্ধন নেপাল জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমানের স্বপক্ষে সঠিক কোন যুক্তি নাই।

হর্ষবর্ধনের জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তাঁহার দক্ষিণ ভারত অভিযান। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ হইতে জানা যায়, এই অভিযানের উদ্দেশ্যে কনৌজেরাজ এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে সমরনিপুণ সেনাপতিদের আনয়ন করিয়া স্বয়ং এই অভিযান পরিচালনা করেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি সসৈন্যে হর্ষবর্ধনকে বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। লাট মালব এবং গুর্জর-রাজও হর্ষবর্ধনের আক্রমণে ভীত হইয়া পুলকেশীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। নর্মদা তীরে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম হয়। আইহোল শিলালিপি অনুযায়ী চালুক্যরাজ পুলকেশী হর্ষবর্ধনকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। পুলকেশীর সাফল্য দক্ষিণ ভারতে উত্তর ভারতের প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য অভিযান

হর্ষবর্ধন নিজ বাহুবলে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। চালুক্য-লেখমালায় তাহাকে 'সকলোত্তরাপথনাথ' অর্থাৎ হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী ভূভাগের অধিপতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি ছিলেন আর্যাবর্তের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নরপতি। থানেশ্বর (পূর্ব পাঞ্জাব) কনৌজসহ সমগ্র উত্তরপ্রদেশ, মগধ এবং গৌড় হইতে উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ হর্ষবর্ধনের শাসনাধীন ছিল। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন তাঁহার অনুগত মিত্র ছিলেন। সিন্ধু ও কাশ্মীর এবং সম্ভবত নেপালও তাঁহার প্রভাবাধীন ছিল। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হর্ষবর্ধন ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশে রাজনৈতিক ঐক্য আনয়ন করিয়া কনৌজকে ইহার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে সকল উচ্চাভিলাষী সম্রাটই কনৌজ জয় করিয়া উত্তর ভারতে একচ্ছত্র অধিপতি হইবার স্বপ্ন দেখিতেন।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ও কৃতিত্ব

প্রতিহার ও পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান

[Rise of the Pratihara and Pala Empires]

ত্রি-শক্তি সংগ্রাম ঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ভারতের দুই প্রান্তে দুইটি প্রবল শক্তির অভ্যুদয় হয়। ইহারা হইল পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার এবং পূর্ব ভারতের পাল বংশ। একই সময়ে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-রাজগণ ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিয়া

উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। কনৌজের 'মহোদয়শ্রী' লাভের আকাঙ্ক্ষায় এই তিনটি শক্তি দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পরস্পরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

প্রথম নাগভট্ট

গুর্জর-প্রতিহার বংশ: গুর্জর-প্রতিহার বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য নরপতি প্রথম নাগভট্ট (৭২০-৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ) কচ্ছ, কাথিয়াবাড়, উত্তর গুজরাট, মালব এবং দক্ষিণ রাজপুতানায় যুদ্ধাভিযান করিয়া নিজ বংশের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইয়াছিল।

বৎসরাজ

প্রথম নাগভট্টের ভ্রাতার পৌত্র বৎসরাজ সমগ্র গুর্জর রাজ্যে প্রতিহার বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। বাংলার পাল সম্রাট ধর্মপালও আর্যাবর্ত বিজয়ের জন্য পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। উভয়ে গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই বৎসরাজ রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হন এবং রাজস্থানের মরু অঞ্চলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন এবং ধর্মপাল আপন প্রাধান্য বজায় রাখেন।

দ্বিতীয় নাগভট্ট

বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সিন্ধু অন্ধ্র বিদর্ভ এবং কলিঙ্গরাজকে তাঁহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করাইয়া কনৌজ জয় করিতে উদ্যত হন। এই সময় কনৌজে ইন্দ্রায়ুধ রাজত্ব করিতেছিলেন। পালরাজ ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। নাগভট্ট চক্রায়ুধকে আক্রমণ করিয়া সিংহাসনচ্যুত করেন। ধর্মপাল চক্রায়ুধের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলে নাগভট্ট কর্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটাধিপতি তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন এবং প্রতিহার বংশের অধীনে উত্তর ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসকে সাময়িকভাবে ব্যর্থ করেন।

ভোজ

দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র ভোজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কনৌজ পুনরুদ্ধার করেন এবং তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ভোজ পাঞ্জাবের কিয়দংশ, রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড এবং উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। সম্ভবত মালব, গুজরাট ও কাথিয়াবাড় তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার সৈন্যবাহিনী মগধের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং পাল সম্রাটকে পরাভূত করে।

মহেন্দ্র পাল

ভোজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র পাল পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া পাল নরপতি নারায়ণ পালকে পরাজিত করিয়া উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত প্রতিহার সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রতিহার সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকে। অবশেষে ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কর্তৃক কনৌজ ধ্বংস হইলে প্রতিহার বংশের পতন হয়।

গুর্জর-প্রতিহার বংশের পতনের পর আর কোন ভারতীয় রাজবংশের পক্ষে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নাই।

গুরুত্বপূর্ণ পাল ও সেন শাসকবৃন্দ
[Important Pala and Sena Rulers]

পালবংশ—গোপাল ঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে উত্তর ভারতে গৌড়ের প্রাধান্য বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রায় একশত বৎসরকাল এই অরাজকতা বা 'মাৎস্য ন্যায়' চলিবার পর 'প্রকৃতি বর্গ' গোপাল-দেবকে (আঃ ৭৫০—৭৭০ খ্রীঃ) রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করিলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

মাৎস্য ন্যায়

ধর্মপাল ঃ গোপালের পুত্র ধর্মপাল (আঃ ৭৭০—৮১০ খ্রীষ্টাব্দে) একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি পাল সাম্রাজ্যের সীমা বঙ্গ-বিহার অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারতের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করিতে প্রয়াসী হন। এই সময় পশ্চিম ভারতে গুর্জর-প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণও উত্তর ভারত বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিল। কনৌজের 'মহোদয়শ্রী' লাভের জন্য পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজগণ এক ত্রিশক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন।

কনৌজের 'মহোদয়শ্রী' লাভের ত্রিশক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ধর্মপাল প্রতিহার-রাজ বৎস কর্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের নিকট পরাজিত হইয়া বৎস রাজপুতানার মরু অঞ্চলে পলায়ন করিলে যখন রাষ্ট্রকূটরাজ স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া যান, তখন ধর্মপাল ভোজ, মৎস, মদ্র, অবন্তী, কুরু, যবন, গন্ধার, কীর প্রভৃতি রাজার আনুগত্য আদায় করেন। ইহার পরে কনৌজের ধর্মপাল-আশ্রিত রাজা চক্রায়ুধকে কেন্দ্র করিয়া যে ত্রিশক্তির যুদ্ধ হয়, তাহাতেও ধর্মপাল বৎসরাজের পুত্র নাগভট্টের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু এইবারেও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে পরাজিত করেন এবং ধর্মপালকে রাহুমুক্ত করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে ধর্মপাল পুনরায় উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভ করিলেন।

দেবপাল ঃ ধর্মপালের মৃত্যুর পর দেবপাল (আঃ ৮১০—৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি সর্ব-ভারতব্যাপী এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। কলিঙ্গরাজ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। প্রাগজ্যোতিষরাজ বিনাযুদ্ধে পাল সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হূণ ও কম্বোজ রাজ্যদ্বয় তাঁহার দ্বারা বিজিত হয়। তিনি দক্ষিণ ভারত অভিযান করিয়া দ্রাবিড়রাজকে পরাজিত করেন। পাল সম্রাট তাঁহার বংশানুক্রমিক শত্রু গুর্জর-প্রতিহার-রাজাকেও পরাজিত করেন। দেবপাল পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সুবর্ণ দ্বীপ অধিপতি শৈলেন্দ্রবংশীয় বালপুত্রদেব পালরাজের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

দিগ্বিজয়

দেবপালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে। পাল-

যুগের লেখমালায় তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। এই দাবি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও ভারতীয় নরপতিগণের আসমুদ্রহিমাচল জয় করিয়া সম্রাট হইবার বাসনাকে মূর্ত করিয়াছিল।

রাজ্য সীমা

দেবপালের মৃত্যুর পর তাহার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন হইতে থাকে। অবশেষে পাল বংশের পতন ঘটাইয়া সেনবংশীয় নরপতিগণ গৌড়দেশ জয় করেন।

প্রথম মহীপাল ঃ দশম শতাব্দীর শেষে প্রথম বিগ্রহ পালের পুত্র প্রথম মহীপাল রাজা হন। তিনি পাল বংশের হৃত গৌরব ও প্রতিপত্তি উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন এবং তাহাতে আংশিক সাফল্য অর্জন করেন। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশ উদ্ধার করিয়া তিনি সম্ভবত বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পরাক্রমশালী রাজা রাজেন্দ্র চোলের নিকট তিনি পরাজিত হন।

রামপাল ঃ পাল বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি রামপাল। তিনি কৈবর্ত্য-বংশীয় বিদ্রোহী নেতা দিব্বোককে দমনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ইহার পরে কৈবর্ত্য বংশীয় ভীমের বিরুদ্ধে তিনি সামন্ত রাজগণ ও মাতুল রাষ্ট্রকূট নায়ক মহত্তের সহায়তায় ভীষণ যুদ্ধে ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলা হইতে কৈবর্ত্য শাসন বিলুপ্ত করেন। তিনি পূর্ব সীমান্তে কামরূপ, পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় এবং উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। গাড়ওয়াল-রাজের প্রতিরোধের ফলে পাল সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিমদিকে আর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' নামক একটি কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থটি পাল যুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান।

সেনযুগ ঃ পালযুগের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন পরবর্তী রাজকুল সেনবংশ। এই সেনবংশই বাংলার শেষ স্বাধীন ও প্রতিপত্তিশালী হিন্দু রাজা। তাঁহারা বাঙালী ছিলেন না। সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিজয় সেন। তাঁহার পিতা হেমন্ত সেন ছিলেন রামপালের অধীনস্থ সামন্ত প্রভু। বিজয় সেনও প্রথম জীবনে পালরাজার সামন্ত প্রভুই ছিলেন। পরে রামপালের মৃত্যু হইলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি বর্মন-রাজ জাতবর্মাকে পরাজিত করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ এবং গৌড়রাজ মদনপালকে পরাজিত করিয়া উত্তর বঙ্গ জয় করেন এবং সমগ্র বাংলায় ঐক্যবদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি কলিঙ্গ, মিথিলা ও কামরূপ জয় করেন। কনৌজের গাড়ওয়াল-রাজের বিরুদ্ধে তিনি বাংলার নৌবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি 'পরম ভট্টারক' ও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিজয় সেন

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন ছিলেন সেন বংশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নৃপতি। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলার রাজ্যসীমা আরও বিস্তৃত হইয়াছিল।

বল্লাল সেন

সেনবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা লক্ষ্মণ সেন। পিতামহ এবং পিতার রাজত্বকালে তাঁহার বাহুবলেই বাংলার রাজ্যসীমা বর্ধিত হইয়াছিল। তিনি মগধ জয় করিয়া পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলায় তুর্কী-শাসন প্রতিষ্ঠা। সম্ভবতঃ ১২০২ খ্রীঃ ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী রাজধানী নবদ্বীপ জয় করিয়া বাংলাদেশ পর্যন্ত মুহম্মদ ঘোরীর রাজ্যসীমা প্রসারিত করেন।

লক্ষ্মণ সেন

দাক্ষিণাত্য

বাদামীর আদি চালুক্যগণ

[The Early Chalukyas of Badami]

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্যগণ পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে তাহাদের প্রথম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হয় বাতাপীতে। বাতাপীরই আধুনিক নাম বাদামী। ইহা কর্ণাটকের অধীনস্থ বিজাপুর জেলায় অবস্থিত। পরবর্তীকালে তাহারা আরও বহু শাখায় বিভক্ত হইলেও মূল শাখাটি প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বাদামীতে রাজত্ব করে। মধ্যযুগে বিজয়নগরের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলে এত পরাক্রমশালী দ্বিতীয় কোন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না।

২য় পুলকেশীর কৃতিত্ব

[Achievements of Pulakeshi II]

ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের প্রধান ঘটনা হইল অঞ্চলটির প্রাধান্য লইয়া কাঞ্চীর পল্লব ও বাদামীর চালুক্যের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পল্লব ও চালুক্যগণ উভয়েই ব্রাহ্মণ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের সম্পদ লুণ্ঠন ও রাজ্য-জয় হইতে বিরত হইতে পারে নাই। উভয়ের সংঘর্ষের মূলক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী উর্বরা দোয়াব। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিয়াছিল।

এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে বিখ্যাত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আমলে। সভাকবি রবিকীর্তি কর্তৃক রচিত 'আইহোল লিপি'র প্রশস্তি হইতে তাঁহার বিষয় জানা গিয়াছে। কদম্বদের রাজধানী বনবাসী দখল করিয়া মহীশূরের গঙ্গাদেরও আপন প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করে। নর্মদার ঘোরতর যুদ্ধে তিনি হর্ষবর্ধনের সেনাবাহিনীকেও পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে তাঁহার অগ্রগতি রোধ করিয়াছিলেন। পল্লবদের সহিত সংগ্রামে তিনি তাঁহাদের রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হইলে উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি পুলকেশীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

২য় পুলকেশী

পরবর্তীকালে (৬১০ খ্রীঃ) পুলকেশী পল্লবদের পরাজিত করিয়া বেঙ্গি নামে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করেন। অতঃপর এইখানে বেঙ্গির পূর্ব-চালুক্য বংশ নামে একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুলকেশীর দ্বিতীয়বার পল্লব রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন (৬৪২ খ্রীঃ) চালুক্য-রাজধানী বাতাপী অধিকার করিয়া 'বাতাপীকোণ্ড' (বাতাপী-বিজেতা) উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ সেই যুদ্ধেই পুলকেশী প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকূটগণ
[The Rashtrakutas]

চালুক্যরাজ্যের পশ্চিমাংশের আরব আক্রমণ প্রতিহত করাতে চালুক্যগণ যখন ব্যস্ত, তখন তাহাদের সামন্তপ্রভু দণ্ডীদুর্গ চালুক্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ জয়ের পর পল্লবরাজাদের পরাজিত করিয়া আরও দক্ষিণে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূটরাজা প্রথম কৃষ্ণ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিলে পল্লব সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেই দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রকূটগণের বাস ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে তাহারা চালুক্যদের সামন্ত প্রভুত্ব লাভ করে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রকূটদের

ইতিহাস

একটি শাখা রাজা ইন্দ্রের নেতৃত্বে ঔরঙ্গাবাদ বা ইল্লিচপুরের নিকট শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। পরে দণ্ডীদুর্গ ও প্রথম কৃষ্ণ সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে ঐ রাজ্যের অধীনে আনিয়াছিলেন।

তৃতীয় গোবিন্দ এবং তৃতীয় কৃষ্ণের কৃতিত্ব
[Achievements of Govinda III and Krishna III]

তৃতীয় গোবিন্দ ঃ ত্রি-শক্তি প্রতিদ্বন্দিতার অন্যতম রাষ্ট্রকূট-রাজ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ রাষ্ট্রকূটদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী রাজা। সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বড় ভাই স্তম্ভের বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি সমগ্র ভারতে আধিপত্য

দিগ্বিজয় : উত্তর ভারত

বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেন। উত্তর ভারতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় নাগভট্ট এবং বাংলার ধর্মপাল। দ্বিতীয় নাগভট্টকে তিনি সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ধর্মপাল ও তাঁহার আশ্রিত কনৌজ অধিপতি চক্রায়ুধের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে তাঁহারা গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করেন। গোবিন্দ তাহাদের স্বীয় রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া হিমালয় পর্যন্ত অগ্রসর হন। পরে স্বদেশে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দক্ষিণে ফিরিয়া তিনি বেঙ্গির বিদ্রোহী রাজা বিজয়াদিত্যকে কঠোর হস্তে দমন

দক্ষিণ ভারত

করেন। ইহার পরে গঙ্গ, পল্লব, পাণ্ড্য এবং কেরলদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়া পল্লব রাজধানী কাঞ্চী দখল করেন (৮০২ খ্রীঃ)। সিংহলের রাজা বিনাযুদ্ধেই তাঁহার আধিপত্য মানিয়া লন।

রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে তৃতীয় গোবিন্দই একমাত্র উত্তর ও দক্ষিণ—সমগ্র ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি জগত্তুঙ্গম্ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় কৃষ্ণ ঃ রাষ্ট্রকুট-শক্তিকে শেষবারের মতো পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ। তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী সেনাপতি এবং উত্তর ও দক্ষিণ—উভয় ভারতেই তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি মহীশূরের গঙ্গারাজকে পরাজিত করেন। উত্তর ভারত অভিযানে কালচর ও চিত্রকূট জয় করিয়া গুর্জর-প্রতিহারদের শক্তি ধ্বংস করেন। ইহার পরে বিদ্যুৎগতি অভিযানে তিনি সুদূর দক্ষিণের কাঞ্চী, তাঞ্জোর জয় করেন। ইহার ফলে চোল ও রাষ্ট্রকুটদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের সূত্রপাত হইয়াছিল। ৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণ যুদ্ধে চোলদের তাক্কোলামের যুদ্ধে বিপর্যস্ত করিয়া রামেশ্বরম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাণ্ড্য ও কেরলদের পরাজিত করিলে সমগ্র টোণ্ডাইমণ্ডলম্ তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। সিংহলরাজও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। উত্তর ভারতে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করিয়া তিনি মালব ও উজ্জয়িনী অধিকার করেন। তিনি বেঙ্গির শাসনকার্যেও হস্তক্ষেপ করিয়া আপন মনোনীত প্রার্থীকে সামন্তরূপে সিংহাসনে বসান। ডঃ আলটেকারের মতে, আর কোনও রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের মতো সমগ্র দাক্ষিণাত্য জুড়িয়া এমন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। অবশেষে, চালুক্য তৈল কর্তৃক রাষ্ট্রকূট শক্তি ধ্বংস হইবার পর কল্যাণ-এর চালুক্য শাখার প্রতিষ্ঠা হয়।

কল্যাণ-এর পরবর্তী চালুক্যগণ (আঃ ১০৭৬-১১২৮ খ্রীঃ)

[Later Chalukyas of Kalyan]

কল্যাণ বা কল্যাণীর চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা তৈল বা তৈলপ চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বংশধর। এই বংশের রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য। তাঁহার রাজত্বকালে চোল রাজগণ বারংবার এই রাজ্য আক্রমণ করিয়াও বিজয়ী হইতে পারেন নাই। কহ্লন বিরচিত 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' কাব্যে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সামরিক প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। তিনি জ্ঞানী-গুণীর সমাদর করিতেন এবং নিজেও চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ, রাজনীতি, রসায়ন প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

দক্ষিণ ভারত

কাঞ্চীর পল্লবগণ

[The Pallavas of Kanchi]

পল্লবদের উদ্ভব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ ঐক্যমত নহেন। তবে সাধারণ ধারণা, পল্লবগণ নাগজাতির বংশধর। তাহারা ছিল সাতবাহন রাজাদের সামন্ত প্রভু। সাতবাহন সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে তাহারা পূর্ব দাক্ষিণাত্যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আপন প্রাধান্য

বিস্তার করিয়াছিল। এই বংশের আদি রাজা ছিলেন শিবস্কন্দবর্মন। কাঞ্চীপুরে তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়া কৃষ্ণা নদী হইতে আরও দক্ষিণে পেনার ও বেলারী অবধি স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পল্লব বংশের বিষ্ণুগোপ নামে দ্বিতীয় রাজাকে সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় পরাজিত করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহবিষ্ণু নামে জনৈক শক্তিশালী নৃপতি 'মহাপল্লব' নামে এক নূতন শাখা প্রবর্তন করেন। তিনি বিরাট দিগ্বিজয়ী ছিলেন এবং সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্য ও চোল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। সিংহলের রাজাও তাঁহার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। পল্লবগণ বংশানুক্রমে বাতাপীর চালুক্যদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত।

সিংহবিষ্ণু

এই বংশের দুই উল্লেখযোগ্য নৃপতির নাম মহেন্দ্রবর্মন এবং তাঁহার পুত্র নরসিংহবর্মন। মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন শ্রীহর্ষের সমসাময়িক। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইলে বেঙ্গি প্রদেশটি চালুক্য অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। পরে তিনি দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত নিজ রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাহার কৃতিত্ব শুধু রণনিপুণ সেনাপতি রূপেই নহে। চৈত্য-গঠনকারী রূপেও তাঁহার পরিচয় আছে। ত্রিচিনোপল্লী চিংগলপেট উত্তর ও দক্ষিণ আর্কটের পাহাড়-কাটা মন্দিরগুলি তিনি উদ্ধার করেন।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মন

মহেন্দ্রবর্মনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নরসিংহবর্মন পল্লব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অধীনেই পল্লব শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি চালুক্য রাজধানী বাতাপী অধিকার করেন। পুলকেশী সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন। চালুক্যদের এইভাবে পরাজিত করিবার পর নরসিংহবর্মন মহীশূর, কুর্গ ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ইহা ব্যতীত তিনি চোল চের কলভ্র ও পাণ্ড্যদের বিরুদ্ধেও সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করেন। সিংহলের বিরুদ্ধে নৌবাহিনী প্রেরণ করিয়া সিংহল-রাজকেও তিনি দমন করিয়াছিলেন।

নরসিংহবর্মন

নরসিংহবর্মন যেমন দিগ্বিজয়ী সেনাপতি ছিলেন তেমনি ছিলেন শিল্পকর্মের পৃষ্ঠপোষক ও বিরাট নির্মাতা। মামল্লপুরমের রথ ও ত্রিচিনোপল্লীর পাহাড়-কাটা মন্দির তাঁহার কীর্তি। হিউয়েন সাঙ তাঁহার রাজত্বকালে কাঞ্চী পরিদর্শন করিয়া তথাকার শিল্পবিদ্যা চর্চার কেন্দ্রগুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

চালুক্যদের সহিত সংগ্রাম পল্লবদের কোনদিনই শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবরাজ পরমেশ্বরবর্মনকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী অবধি জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন রাষ্ট্রকূটগণ চালুক্যদের পরাজিত করেন এবং সুদূর দক্ষিণের চোল রাজন্য পল্লবদের পরাজিত করেন, তখনই এই সংগ্রামের শেষ হয়।

তাঞ্জোরের চোলগণ

[The Cholas of Tanjore]

তামিলনাড়ু নামে পরিচিত সুদূর দক্ষিণ ভারতে চোলগণ রাজত্ব করিত। তাহারা অতি প্রাচীন বংশোদ্ভুত হইলেও তাহাদের সম্পর্কে বিশদভাবে আমাদের কিছু জানা নাই। অশোকের শিলালিপিতেও চোলদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সঙ্গম যুগের প্রধান চোলরাজের নাম কারিকল (১৯০ খ্রীঃ) তিনি প্রায় সমস্ত তামিল রাজ্যগুলির উপর অধিকার বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সাফল্যের সহিত সিংহলেও অভিযান পরিচালনা করেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চোলগণের ভূখণ্ড কখনো পল্লব, কখনো চালুক্য, আবার কখনো বা রাষ্ট্রকূটগণ দ্বারা বিজিত হইয়াছে। চোলরাজ বিজয়ালয়ের নেতৃত্বে নবম শতাব্দীতে চোল শক্তি স্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়ালয়ের পুত্র পল্লব শক্তি ধ্বংস করেন। তাঁহার সময়ে চোলরাজ্য মাদ্রাজ হইতে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে চোলগণ পাণ্ড্যরাজ্যও অধিকার করিয়াছিল। তবে, চোল শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত রাষ্ট্রকূটগণ মহীশূরের গঙ্গারাজের সহায়তায় সাময়িকভাবে চোলশক্তি বিনষ্ট করে। ইহার পরে পিতা প্রথম রাজরাজা এবং পুত্র প্রথম রাজেন্দ্রের রাজত্বকালে চোল রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। চোল সাম্রাজ্য যেমন সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হয়, তেমনি চোল নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তাঁহাদের রাজত্বের পরেই ধীরে ধীরে চালুক্য শক্তির সাথে সংঘর্ষে চোলশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। কুলোতুঙ্গ চোল ও পূর্ব চালুক্য বংশের মিলন ঘটাইয়াও সে পতন রোধ করিতে পারেন নাই। অবশেষে আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর চোল রাজ্য অধিকার করিলে চোলরাজ্য ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হয়।

প্রথম রাজরাজা ও প্রথম রাজেন্দ্রের কৃতিত্ব

[Achievements of Rajraja I and Rajendra I]

চোল রাজাদের ইতিহাসে প্রথম রাজরাজা 'মহান' বিশেষণে ভূষিত। ৯৮৫ খ্রীঃ হইতে তাহার ত্রিশ বৎসরের রাজত্বে চোল সাম্রাজ্যবাদের গৌরব তুঙ্গে উঠিয়াছিল। সামান্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে তিনি বিরাট স্থায়ী দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী-নির্ভর বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। চের বা কেরল রাজ্য সত্ত উত্থিত আরবীয় মুসলমান বণিকদের সমর্থন দিয়া জলপথে পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে তাহাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতেছিল। মহান রাজরাজা কেরল দখল করিয়া আরব বণিকদের সে স্বপ্ন ব্যর্থ করিয়া দেন। ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনি পাণ্ড্য এবং সিংহল রাজ্যও জয় করেন। মালদ্বীপ জয় করিয়া তিনি সামুদ্রিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে সমুদ্র পথের বাণিজ্যে আরবীয়দের আধিপত্য হ্রাস পায়। তিনি পশ্চিম ও পূর্ব উভয় চালুক্যদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, কুর্গ সিংহলের কিছু

মহান রাজরাজা

অংশ, মহীশূর, মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপের দ্বীপগুলি জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। তাঁহার আরব সাগরের মধ্যস্থিত মালদ্বীপপুঞ্জ এবং সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর বিজয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর হইতে আরব বণিকদের ঘাঁটিগুলির উচ্ছেদ সাধন। কারণ, ঐ দুইটি ঘাঁটিকেই কেন্দ্র করিয়া আরব বণিকগণ ভারতীয় বণিকদের ব্যবসায়ে বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। তাঞ্জোরের শিবমন্দির তাঁহারই কীর্তি।

প্রথম রাজেন্দ্র চোল ঃ উপযুক্ত পিতা মহান রাজরাজার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন প্রথম রাজেন্দ্র চোল। তাঁহার রাজত্বকাল অসংখ্য দিগ্বিজয়ের কাহিনীতে সমৃদ্ধ। পাণ্ড্য চের রাজ্য জয়ের পর রাজেন্দ্র সিংহল জয় করেন। এই তিনটি রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ভারত হইতে আরব বণিকদের উৎখাত করিয়া চীনের সহিত দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য পথ সুরক্ষিত করা। ইহা ব্যতীত তিনি পশ্চিম চালুক্যদের ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করিয়া তুঙ্গভদ্রাকে চোল ও পশ্চিম চালুক্যদের সীমা চিহ্নিত করিয়া দেন। তাঁহার আর একটি দুঃসাহসী অভিযান ছিল ওড়িষ্যার ভিতর দিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহীপালকে পরাজিত করা। তাঁহার সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সেনবংশীয় সৈনিকগণই পরবর্তীকালে বাংলায় সেনবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই বিজয়ের স্মারক হিসাবে তিনি স্বয়ং "গঙ্গাইকোণ্ড" উপাধি গ্রহণ করেন এবং ত্রিচিনোপল্লী জেলায় "গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম" নামে একটি রাজধানী-নগর প্রতিষ্ঠা করেন। নগরটি অপরূপ অট্টালিকা শ্রেণীতে শোভিত হয় এবং তথায় বিরাট মন্দির ও জলাশয় নির্মিত হইয়াছিল।

দিগ্বিজয়

চীনের সহিত দক্ষিণী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য সম্পর্কে শৈলেন্দ্র রাজবংশের নির্দেশ ছিল ভারতের বাণিজ্য-পোত যেন মালয় উপদ্বীপের পরে আর না আসে। সেজন্য শৈলেন্দ্র রাজ্যের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ভয় দেখানো হইত। শৈলেন্দ্র রাজ্যের এই অন্যায় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্র চোল সে দেশে বিরাট নৌ-অভিযান প্রেরণ করিয়া ঐ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্য পথ সুরক্ষিত হইয়াছিল। তাহাতে সমগ্র ভারত মহাসাগর বিজয়ী চোলদের দ্বারা তাঁহাদের অধিকৃত হ্রদে পরিণত হইলেও এত দূরদেশ হইতে সুদূর শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য দখলে রাখা দীর্ঘকাল সম্ভব হয় নাই। শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য দীর্ঘ সংগ্রামের পর চোল অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালেই চোল সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল।

নৌ-অভিযান

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

[Social, Economic and Cultural Life from the 7th to 12th Century A. D.]

পাল ও সেন যুগ

[The Palas and Senas]

সমাজ

ধর্ম

সমাজ ঃ এই যুগেই বাংলার মনীষার চরম বিকাশ ঘটে। সমাজ, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিয়াছিল, আজও বাংলার সমাজ-জীবনে তাহার প্রভাব অপরিসীম। বাংলার সমাজে আজ যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদি ছত্রিশ জাতির বিভেদ, তাহার আরম্ভ পাল-সেন যুগেই। সমাজে কৌলিন্য প্রথার উদ্ভবও ঘটে সেন আমলে। সেই সামাজিক কাঠামোর বিন্যাস আজও কঠোরভাবেই অনুসৃত হইতেছে। পাল-রাজগণ বৌদ্ধ ধর্মের উপাসক হওয়ায় বিক্রমশীলা মহাবিহার, ওদন্তপুরী ও সোম-পুরীর মহাবিহার বহুবিশ্রুত ধর্ম ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীকালে বাংলায় বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে এবং তাহার ফলে লোকচক্ষুতে নানা ব্যভিচার ঘটে বলিয়া মনে করা হয়। সেইজন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন আমলে ঐসব বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার হয় এবং তাহারা নগরের বাহিরে বসবাস করিতে থাকে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

বাংলাদেশে বার মাসে তের পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। পাল-সেন উভয় যুগেই বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও বারব্রত নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইত। সেই সঙ্গে চলিত শরীর ও নৃত্যগীতাদি ললিতকলার চর্চা।

বাঙ্গালী চরিত্র

বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ বলেন, তাহারা সাধারণত শিক্ষানুরাগী ও সরল স্বভাব। স্থানীয় পরিবেশ অনুসারে সমতট বা নিম্ন বঙ্গের অধিবাসীরা ছিল কর্মঠ, শ্রমসহিষ্ণু ; কর্ণসুবর্ণবাসীরা সৎ ও সাহসী এবং তাম্রলিপ্তবাসীরা অস্থিরচিত্ত।

অর্থনীতি ঃ বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি ; তবে তাহার সহিত কারিগরি ও বাণিজ্য জড়িত ছিল। বাংলার বালাম নৌকায় তখন বৃহত্তর ভারতে বাণিজ্য চলিত। তাম্রলিপ্ত ছিল প্রথম শ্রেণীর বন্দর। বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, স্বর্ণ-রৌপ্যশিল্প কার্যে বহু লোক নিযুক্ত ছিল। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলার ঘরে ঘরে কিছুটা অর্থ-প্রাচুর্য দেখা দিত।

সংস্কৃতি ঃ এই যুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের প্রচুর উন্নতি ঘটিয়াছিল। পাল-রাজাগণের নির্মিত মহাবিহারগুলি শিল্পোৎকর্ষের চরম নিদর্শন। প্রস্তরগাত্রে খোদিত মূর্তিগুলিও পাল-সেন যুগের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ধীমান ও বীতপাল এই যুগের অমর শিল্পী। তাঁহাদের শিল্পরীতি বাংলার বাহিরের স্বর্ণ দ্বীপের শিল্পরীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। যবদ্বীপের বরবুদুর মন্দিরটি ইহাদের অক্ষয় কীর্তি।

শিল্প সাহিত্য

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নাম অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণের। আয়ুর্বেদাচার্য চক্রপাণিদত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালীই হস্তী আয়ুর্বেদ বিদ্যার স্রষ্টা। সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' রচনা করিয়া সেযুগের ইতিহাসের উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছেন।

সে যুগে স্বয়ং বল্লালসেন 'দানসাগর', 'অদ্ভুতসাগর' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব রচনা করেন গীত-গোবিন্দ। ধোয়ী, উমাপতি ধর, শরণ, হলায়ুধ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। পাল যুগের সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে জাগরণের সূচনা হইয়াছিল, তাহা সেনযুগেও অব্যাহত ছিল।

চালুক্য
[The Chalukyas]

সমাজ ঃ চালুক্য ও পল্লবদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ফলে সুস্থির রাজনীতির জীবন-ধারা চালুক্য সাম্রাজ্যে অব্যাহত থাকিতে পারে নাই। অবশ্য সমাজের উচ্চস্তরে রাজনীতির অভিঘাত ও সংঘাত যতটা অনুস্যূত হইত, ততটা নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌঁছাইত না। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে তখন সামন্ততন্ত্রের সূত্রপাত ঘটিতেছিল এবং চালুক্য রাজগণ ব্রাহ্মণ্যবাদী হওয়ায় সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। ব্রাহ্মণদের কোন কর দিতে হইত না বলিয়া ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামের প্রজাসমূহের সমৃদ্ধি ছিল লক্ষণীয়। 'দেবদান' গ্রামের খাজনা জমা হইত মন্দিরে। পরের যুগে মন্দিরগুলিই গ্রামের কেন্দ্র হইয়া ওঠায় এই ধরনের গ্রামগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া ওঠে।

আর্থিক জীবন ঃ গ্রাম অর্থে বুঝাইত গ্রামবাসীদের বাড়ী, উদ্যান, সেচ-পুষ্করিণী বা কূপ, গোশালা, পতিতভূমি, সাধারণের জমি, গ্রামের চারিপাশের বনভূমি, ছোট নদী, মন্দির, মন্দিরের জমি, শ্মশান এবং শুষ্ক ও সেচপ্রাপ্ত জমি। ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল ধানমাড়াই-এর মতো যৌথ বা সাধারণ সম্পত্তি। ধান ছিল প্রধান ফসল। বিনিময়ের মাধ্যমও ছিল ধান। ধান উদ্বৃত্ত হইলে তাহা বাণিজ্যিক ফসলরূপে কেনাবেচা হইত। আম ও কলাগাছের প্রচুর বাগান ছিল। তুলাবীজ, আদাজাতীয় ঝাঁঝালো বীজের তৈলের প্রচুর বাণিজ্যিক চাহিদা ছিল। গ্রামগুলি সেচের জন্য ছিল পুষ্করিণী-নির্ভর।

সংস্কৃতি ঃ রাজা ছিলেন জমির মালিক। তিনি ব্রাহ্মণদের জমিদান ও কর্মচারীদের কর আদায়ের অধিকার দিতে পারিতেন। তিনি নিজস্ব জমি বর্গাদার দিয়া চাষ

করাইতেন। সাধারণ মানুষ জমি কেনা-বেচা করিতে পারিত। চালুক্যরাজ্যে রাজকর্মচারীদের দৈনন্দিন কাজে বেশি জড়াইয়া পড়িতে হইত। শাসিত অঞ্চল বিভাগে রাজারা দশমিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন। উৎপন্ন শস্যের ১/৬ অংশ হইতে ১/১০ অংশ কর রাজাকে দিতে হইত। গ্রামের প্রয়োজনে ব্যয়ের নিমিত্ত আর এক প্রকারের কর ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিশেষ কর ধার্য হইত না।

চালুক্য রাজগণ ব্রাহ্মণ্যবাদী হইলেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। হিউয়েন সাঙ চালুক্যরাজ্যে বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিয়াছেন। তাঁহারা শিল্প-সাহিত্যেরও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রাজ্যমধ্যে তাঁহারা বহু দেবদেবীর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। অজন্তা ও এলিফ্যাণ্টার মনোরম চিত্র ও ভাস্কর্য তাঁহাদের স্থাপত্য-শিল্পের উজ্জ্বলতম নিদর্শন।



নটরাজ মূর্তি

রাষ্ট্রকূট

[The Rashtrakutas]

সমাজ ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্য, হর্ষের রাজ্যশাসন নীতি এবং চালুক্যদের ভাবধারা ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রকূট রাজ্যের শাসনপ্রণালী ও সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা এবং সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সম্রাটের সহিত থাকিত 'রাজ'-সরকারগণ। রাজা বিচারও করিতেন। রাজসভা শাসন ও বিচার ছাড়াও নৃত্যগীত, সঙ্গীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক জীবনের উৎস ছিল। উৎসব-অনুষ্ঠানে রাজপ্রাসাদের মহিলারাও অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় অংশগ্রহণ করিতেন।

রাজায় রাজায় এত যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত যে, সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্তে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা সম্ভব হইত না। সেইজন্য প্রত্যেকের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণের অধিকার ছিল। রাষ্ট্রকূট রাজাদের বহুসংখ্যক দুর্গ ছিল। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটদের নৌবাহিনী ছিল।

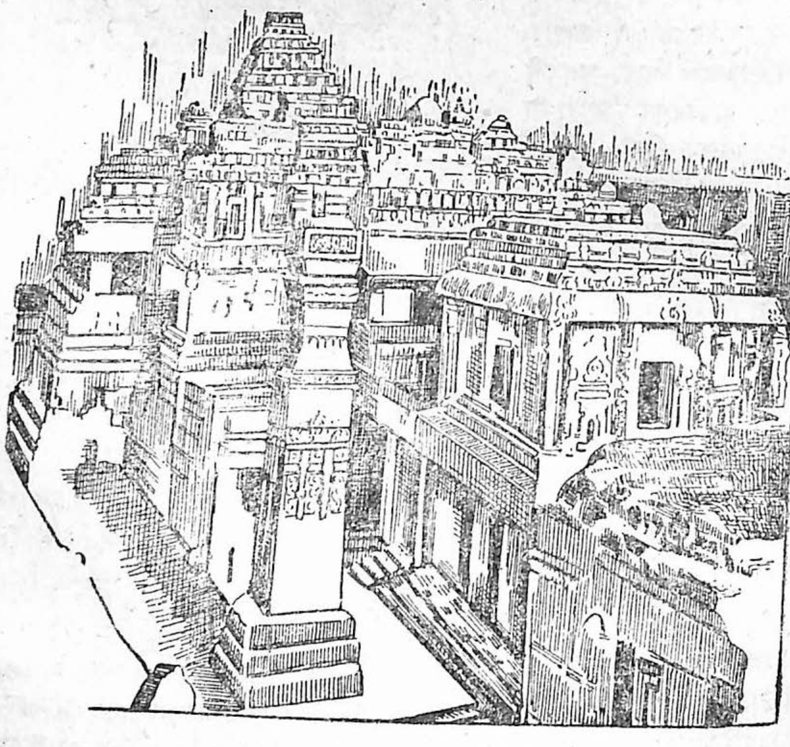
শাসন ব্যবস্থা

রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের স্বয়ংশাসিত অঞ্চলগুলি 'রাষ্ট্র' বা 'প্রদেশ', 'বিষয়' ও 'ভুক্তি'-তে বিভক্ত ছিল। বিষয় ছিল বর্তমান 'জিলার' মতো। ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশ ছিল 'ভুক্তি'। গ্রাম ছিল একেবারে নিম্নতম অংশ।

কর্ণাটকে 'গ্রামসভা' ছিল। এই সভা স্থানীয় বিদ্যালয়, পুষ্করিণী, মন্দির ও পথ-ঘাট দেখাশুনা করিত ; তাহার সহিত সভাগুলি স্থানীয় বিবাদেরও মীমাংসা করিত। রাজারা কেহ কেহ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধমঠ ও জৈন মন্দিরেও অকাতরে দান করিতেন। রাষ্ট্রকূটরাজারা মুসলিম ব্যবসায়ীদেরও নিজ রাজ্যে বসবাস করিয়া ইসলাম ধর্মপ্রচারের অনুমতি দিয়াছিলেন।

অর্থনীতি ঃ সংসার জীবনে রাজারা ধর্মশাস্ত্রের নীতি মানিয়া চলিতেন। রাজার ক্ষমতার উৎস ছিল 'অর্থশাস্ত্র' ও 'ধর্মশাস্ত্র'। রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হইত অর্থশাস্ত্রের বিধান দ্বারা। সে যুগে রাজারা পুরোহিত বা তাহাদের অনুশাসন দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়ায় এই কথা বলা চলে যে, তাঁহাদের রাষ্ট্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। চালুক্যদের ন্যায় রাষ্ট্রকূটগণও আরব সাগরের উপকূলের আরব বণিকদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইত।

সংস্কৃতি ঃ রাষ্ট্রকূট রাজগণ শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজশেখরের ন্যায় সংস্কৃত পণ্ডিত, অপভ্রংশ ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি স্বয়ম্ভু এই রাজসভা অলংকৃত করেন।



কৈলাসনাথ মন্দির

রাষ্ট্রকূটরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গুহামন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের প্রবেশমুখ ও দেওয়ালে যে ভাস্কর্য রহিয়াছে, তাহাকে অজন্তার পরবর্তী পর্যায় বলা যায়। উত্তর ও

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শিল্পের সংমিশ্রণে একটি মিশ্র স্থাপত্য রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা অমোঘবর্ষ শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজেও বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পাহাড়ের ধারে পাথর কাটিয়া এথেন্সের পার্থেনন অপেক্ষা দেড়গুণ উঁচু ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল।

চান্দেল্লগণ

[The Chandellas]

সমাজ ঃ বুন্দেলখণ্ডের যাজকভুক্তির অন্তর্গত খাজুরাহো অঞ্চলের চান্দেল্লগণ দশম শতাব্দীতে প্রভাবশালী হইয়া ওঠে। ইহারা রাজপুত জাতির একটি শাখা। প্রতিহার সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর ইহাদের রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই গোষ্ঠীর যশোবর্মন কালঞ্জর জয় করিয়াছিলেন। তিনি মাহারাতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের ধঙ্গ মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্য রাজা কীর্তিবর্মন চেদী-রাজ কর্ণকালচুরিকে পরাজিত করেন।

অর্থনীতি ঃ চান্দেল্লরাজারা প্রজাহিতৈষী ও মন্দির এবং দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন। কীর্তিবর্মনের স্মৃতি অমর হইয়া আছে কিরাতসাগর হ্রদ নির্মাণে। রাজাদের তখন সারাক্ষণ পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকিতে হওয়ায় বহির্বিশ্বের সহিত সম্পর্ক লুপ্ত হইয়া যায়। রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হইত স্থানীয় ঘটনা প্রবাহের ভিত্তিতে। চান্দেল্লরাজ্যেও জীবনধারা সামন্ততান্ত্রিক হইয়াছিল। অসামরিক ও সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ভূমিদান করা হইত। রাজা ধঙ্গ ও কীর্তিবর্মনের এমন ভূমি দানের উল্লেখ আছে। সামরিক কর্মচারীদের যে ভূমি দান করা হইত, তাহাতে কোনকালে কোন কর দিতে হইত না।

সংস্কৃতি ঃ খাজুরাহোর মন্দিরগুলি চান্দেল্লরাজাদের অক্ষয় শিল্পপ্রতিভার পরিচয় বহন করে। এই মন্দির রচনা ও মন্দির পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের ভিতর দিয়া রাজ্যটির আর্থিক সমৃদ্ধিও পরিস্ফুট।

ওড়িশার বৃহত্তর গঙ্গারাজগণ

[The Greater Gangas of Orissa]

সমাজ ঃ ওড়িশাতেও মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছিল বৃহত্তর গঙ্গারাজগণের আগমনে। আদিতে গঙ্গাবংশ মহীশূরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদেরই বৃহত্তর শাখাটি দীর্ঘকাল ওড়িশায় রাজত্ব করে। সামন্তবাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ভূমিদানের প্রচুর প্রমাণ এই রাজত্বে মেলে। "ভঞ্জ" তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, সাধারণ সুযোগসুবিধা সহ একটি সম্পূর্ণ গ্রামই দান করা হইতেছে। সন্তোষজনক সেবার পুরস্কার হিসাবে 'মহাসামন্ত'

উপাধিধারী সামরিক অধিনায়কদের ভূমিদান করা হইত। গণপতি নায়ক নামক এক বৈশ্য সামন্তকেও ভূমিদান করিতে দেখা গিয়াছে। ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন কুমারমহাপাত্র নামে এক মন্ত্রীকে গ্রামদান করিয়াছেন।

অর্থনীতি ঃ গঙ্গারাজগণের প্রখর দৃষ্টি ছিল রাজ্যের অর্থনীতির উন্নয়নের দিকে। সেজন্য তাঁহারা সুপারীর ব্যবসায়ী এক তাম্বুলী, তাম্রকার এবং অন্যান্য কারিগরদের ভূমিদান করিয়া গ্রামান্তর হইতে নিজ রাজ্যে লইয়া আসিতেন। ইহাই প্রমাণ করে যে, মধ্যযুগের প্রথমভাগে ওড়িশায় বেতনের পরিবর্তে কর্মচারীদের ভূমিদান করা হইত।

সংস্কৃতি ঃ এ বংশের মহত্তম শিল্পকীর্তি কোনারকের সূর্য মন্দির এবং ওড়িশার লিঙ্গরাজ প্রভৃতি অসংখ্য বিশাল বিশাল উচ্চ মন্দির।

সুদূর দক্ষিণের পল্লব রাজগণ
[The Pallavas of the far South]

সমাজ ঃ ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে পল্লব-রাজগণের যুগ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পল্লব-রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই যুগে সংস্কৃত-সাহিত্যের বিপুল প্রসার ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন রাজসভায় ভারবি, দন্ডী প্রমুখ সংস্কৃতাচার্যদের উপস্থিতির কাহিনী প্রচলিত আছে। তাহাদের রাজত্বকালে রাজধানী কাঞ্চী দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজারা তামিল সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতায় কার্পণ্য করেন নাই। তামিল ধ্রুপদী সাহিত্য 'তামিল কুরুল' পল্লব আমলেই রচিত হয়। পদুকোট্টাই রাজ্যে পল্লব-চিত্রকলার নিদর্শন রহিয়াছে।

পরবর্তীকালে সারা ভারত জুড়িয়া যে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ বহিয়া যায়, তাহার সূত্রপাত ঘটে পল্লব রাজত্বে। ভক্তিবাদের জন্মও পল্লব রাজত্বে ঘটে। নয়নারগণ ছিলেন শৈবভক্তিবাদী ; আর, আলওয়ারগণ বিষ্ণু উপাসক। ভক্তিধর্ম নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই প্রচারিত ছিল বেশী। উচ্চবর্ণের হিন্দুধর্ম ক্রমেই ব্রাহ্মণ্যবাদী গোঁড়ামির ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের পরিচালিত মন্দিরে শূদ্র অর্থাৎ কুম্ভকার, চর্মকার ও অস্পৃশ্যদের প্রবেশ অধিকার ছিল না। পল্লবযুগে তামিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রথম প্রথম ন্যাসপাতির আকারে বীণা বাজানো হইত। আরও ২০০ বৎসর পরে বর্তমান বীণার আকার গৃহীত হয়। মন্দিরের অনুষ্ঠানে নৃত্যের প্রচলন ছিল, পরে ভরত নাট্যমের শিক্ষাদান হইত। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন পাহাড়ে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ মন্দির নির্মাণের প্রতিযোগিতায় মাতিয়া ওঠে। পল্লব যুগের পাহাড়-কাটা মন্দিরগুলির মধ্যে মহাবলীপুরমের রথগুলি উল্লেখযোগ্য।

অর্থনীতি ঃ পল্লব যুগের সমৃদ্ধি নির্ভর করিত কৃষিকার্যের উপর। ধান ছিল প্রধান ফসল এবং তা দিয়া বিনিময়েরও কাজ চলিত। উদ্বৃত্ত ধান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত

হইত। বহির্বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাল ও সুপারীর উৎপাদন হইত। তাহা ব্যতীত প্রচুর আম ও কলার চাষ ছিল। জলসেচের নিমিত্ত পুষ্করিণী সংরক্ষিত করা হইত। রাজাকে উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{৬}$ অংশ হইতে $\frac{১}{১০}$ অংশ কর দিতে হইত। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বেশী কর ধার্য হইত না।

পল্লব যুগে সমুদ্রপথে নিকট ও দূর প্রাচ্যের সহিত বিস্তীর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। পশ্চিম সাগরের বাণিজ্য ততদিনে আরব বণিকদের হাতে চলিয়া যাওয়ায় দেশীয় বণিকদের কাজ ছিল তাহাদের প্রয়োজনমতো বাণিজ্য-কর ধার্য সম্ভার সরবরাহ।

সংস্কৃতি ঃ দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হইল পল্লব যুগের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য। নানা ধরনের স্থাপত্য রীতিতে পল্লব যুগের মন্দির নির্মিত হয়। একেশ্বরনাথ মন্দির নির্মিত হয় মহেন্দ্র রীতিতে ; সমুদ্র উপকূলের রথগুলি হইয়াছে মামল রীতিতে। ইহা ব্যতীত ত্রিমূর্তি, বরাহ, দুর্গা ইত্যাদির রীতি গুহা মন্দিরের। কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দিরে আছে রাজসিংহ রীতির ছাপ।

সুদূর দক্ষিণের চোলগণ
[The Cholas of the far South]

সমাজ ঃ চোল আমলে রাজাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁহার হাতেই ছিল সর্বময় কর্তৃত্ব। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রায়ই রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইতেন। তাঁহাদের বিরাট সেনাবাহিনী ছিল। নৌবলেও তাঁহারা ছিলেন অত্যন্ত বলীয়ান। রাজেন্দ্র চোলের নৌবাহিনীর সুদূর ভারত মহাসাগরের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিল। সমগ্র রাজ্যটি কয়েকটি 'মণ্ডলম্' বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি মণ্ডলম্ ছিল আবার 'বলনাড়ু' ও "নাড়ু"-তে বিভক্ত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা হইতেন রাজপরিবারের লোক। সরকারী কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে উপযুক্ত পরিমাণ রাজস্ব আদায়কারী ভূমিদান করা হইত।

শাসন ব্যবস্থা

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সৈন্য চলাচলের জন্য রাজ্যের চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর রাজপথ নির্মিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কয়েকটি বৃহৎ ব্যবসায়ী সংঘ ছিল। এই সকল সংঘ জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য করিত। কৃষিই সম্পদের অন্যতম প্রধান উপায় বলিয়া চোলগণ কৃষিতে জলসেচের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল। চোল রাজাদের অর্থাগমের অন্য উপায় ছিল পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাজ্যগুলির সম্পদ লুণ্ঠন, বাণিজ্যিক শুল্ক এবং পেষা কর। চোল রাজাদের সম্পদের অবধি ছিল না বলিয়া তাঁহারা কয়েকটি জমকালো নগর ও সৌধ নির্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন।

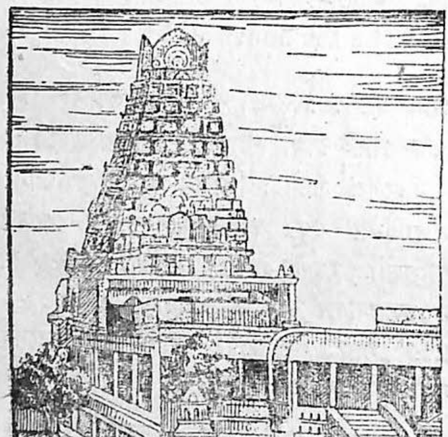
কৃষি ও লুণ্ঠন

স্বায়ত্ত্বশাসন

স্বায়ত্ত্বশাসনের স্তম্ভ ছিল 'উর' এবং 'সভা' বা 'মহাসভা'। গ্রামীণ সাধারণ লোকের সম্মেলন হইল 'উর' এবং অগ্রহার বয়স্ক ব্রাহ্মণদের পরিষদ হইল 'সভা' বা 'মহাসভা'। মহাসভা গ্রামের জন্য ঋণ সংগ্রহ বা কর ধার্য করিতে পারিতেন। গ্রামের সকল ব্যাপারে কার্যনির্বাহক সমিতি গ্রহণ করিত। ক্রমে ক্রমে সামন্ত প্রথা দৃঢ়মূল হইতে থাকিলে স্বায়ত্ত্বশাসন শিথিল হইতে থাকে।

অর্থনীতি ঃ সামাজিক জীবনের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চোল রাজ্যের অর্থনীতি পরিচালিত হইত। গ্রামীণ স্বায়ত্ত্বশাসনের পরিবেশে অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভরতার সূচনা হইয়াছিল। সমাজে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী, করদাতা, কৃষক ও চাষী এবং উচ্চবর্ণ ও নিম্ন জাতির মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ ছিল। কৃষকদের বাধ্য করা হইত বন কাটিয়া বসত ও চাষের জমি উদ্ধারে। গো-মহিষ পালন ও পশুচারণ দরিদ্রের বাড়তি আয়ের পথ ছিল। কোন কোন জমিতে দু-তিন ফসলও হইত। ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ছিল ফসলের $\frac{১}{৩}$ অংশ। ইহা ছাড়া আরও নানা খাজনা ও কর গ্রামবাসীদের দিতে হইত।

জনগণের জীবন ছিল সহজ সরল। কিন্তু দ্বাদশ শতকের পর বহির্বাণিজ্যে প্রভুত ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক নগর ও বন্দর গড়িয়া ওঠে। ঐ সব নগরের প্রয়োজন মিটাইতে হইত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিকে। নগরের লোক নগদ পয়সায় কেনা-বেচা করায় গ্রামের মধ্যেও মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি চালু হইয়াছিল। তাহাতে পূর্বের জীবনধারা পরিবর্তিত হইতে থাকে।



তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির

চোল-কারিগর ও উৎপাদকগণ প্রধানত স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইতে উৎপাদন করিলেও বহির্বাণিজ্যেও যোগ দিত। উন্নত প্রকৃতির তন্তুজ বস্ত্রাদি, ধাতুদ্রব্যাদি, লবণ ও মৃৎ পাত্র ছিল রপ্তানীর উপকরণ। মসলা, মূল্যবান প্রস্তর, চন্দন কাঠ, হাতীর দাঁত, কর্পূর প্রভৃতিও রপ্তানী হইত। চীনের সহিত চোল রাজগণের ব্যবসায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ব্যবসায়ী সঙ্ঘ এই সকল আমদানী-রপ্তানী ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত।

সংস্কৃতি ঃ চোল রাজগণ বিরাট নির্মাতা ছিলেন। তাঁহাদের নির্মিত স্থাপত্য-নিদর্শনগুলিও অতি বিরাট। প্রতিটি নগরের কেন্দ্রে সাধারণত থাকিত বিশাল শিব

মন্দির। মন্দিরগুলিও ছিল জনগণের মিলনতীর্থ এবং নৃত্যগীত উৎসবের আসর। প্রথম রাজেন্দ্র গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম মহানগর নির্মাণ করেন ও ত্রিচিনোপল্লীতে প্রতিষ্ঠিত করেন একটি অতিকায় মন্দির। চোল নৃপতি রাজরাজা কর্তৃক নির্মিত তাঞ্জোর মন্দির ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ।

জনহিতকর কার্যের মধ্যে চোল স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে বিরাট বিরাট জলসেচের বাঁধ, জলাধার ও সড়ক নির্মাণে। প্রথম রাজেন্দ্র নির্মাণ করেন ১৬ মাইল দীর্ঘ চোল-গঙ্গ হ্রদ।

চিত্রশিল্প

চোল চিত্রশিল্পের নিদর্শন রহিয়াছে তাঞ্জোরের মন্দির গাত্রে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, সেগুলি অজন্তার শিল্পকর্মকে মনে করাইয়া দেয়।

সাহিত্য

চোল যুগে সাহিত্যেরও অনেক উন্নতি ঘটিয়াছিল। বিখ্যাত পেরিয়া পুরানম্ গ্রন্থে দর্শনের ব্যাখ্যা করা হয়। কিছু কিছু বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রও এই যুগে রচিত হইয়াছিল। সাধারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম হইতেছে 'জীবক চিন্তামণি' এবং 'কলিঙ্গত্তু পরাণী'। পরের গ্রন্থটি তামিল সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। কুট্টল ছিলেন বিক্রমচোলের সভাকবি। তামিল রামায়ণ প্রচারিত হয় তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বে।

বহির্বিশ্বের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ
[Commercial and cultural contacts with outside World]

সাগর ও পর্বতবেষ্টিত হইলেও ভারতবর্ষ বাহিরের জগৎ হইতে কোনদিন বিচ্ছিন্ন ছিল না। সুপ্রাচীনকাল হইতেই প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত তাহার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এমনকি গ্রীস, রোম, মিশর প্রভৃতি পশ্চিমের দূরবর্তী দেশ-সমূহের সহিতও ভারতের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। মধ্য-এশিয়া, চীন ও জাপানে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিজয়কেতন উড়িয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের সহিত যোগাযোগ ঃ হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সহিত পশ্চিম এশিয়াতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সাদৃশ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূচনা হইতেই ভারতের সহিত পশ্চিম এশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা প্রমাণ করে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে ভারতের সহিত পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মৌর্য সম্রাটের ধর্মপ্রচারকগণ সিরিয়া, ম্যাসিডোনিয়া, এপিরাস, ঈজিপ্ট ও কাইরিন নামক পাঁচটি গ্রীক রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পণ্যবাহী জাহাজ পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও রোমের বন্দরগুলিতে ভিড় করিতে থাকে। জনৈক গ্রীক নাবিক রচিত 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী' গ্রন্থে ভারত-রোমক বাণিজ্যের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

পশ্চিমের সহিত ভারতের যোগাযোগ কেবলমাত্র বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রীক অধিপতিগণ এবং কার্থেজের শাসক হ্যানিবল সম্ভবত ভারতীয় প্রভাবেই যুদ্ধে হস্তীর ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, গ্রীক চিকিৎসক-গণ ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত ছিল। সাসানিদ বংশের রাজত্বকালে পারস্য দেশে বহু ভারতীয় চিকিৎসক সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ উইলিয়াম জোন্স গ্রীসের পিথাগোরাস-প্রবর্তিত দর্শনের উপর ভারতীয় সাংখ্যদর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশীয় 'নষ্টিক' দর্শনও সাংখ্যদর্শন হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। অশোক পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই। অল-বিরুণীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, খোরাসান, পারস্য, ইরাক ও মোসুল সহ সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল।

মধ্য ও পূর্ব এশিয়া ঃ ভারত ও চীনে যাতায়াতকারী বণিকদিগের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া মধ্য এশিয়া ও চীন পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক মধ্য এশিয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া এই অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব আরও প্রবল করিয়া তোলেন। স্যার অরেলস্টাইন কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে প্রমাণ হয় যে, কুষাণ যুগে মধ্য এশিয়ার খোটান, ইয়ারকন্দ, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন এবং ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ দেবালয় বিহার ও স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেবালয় ও বিহারের গাত্রে যে সকল চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা অজন্তার শিল্পরীতি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত। এখানে প্রাপ্ত ভাস্কর্যের নিদর্শনসমূহেও গন্ধার ও সারনাথের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক বিহার হইতে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ উদ্ধার করা হইয়াছে।

মধ্য এশিয়া

অতি প্রাচীনকালেই চীনের সহিত ভারতের যোগসূত্র রচিত হইয়াছিল। মহাভারত, মনুসংহিতা ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চীনাংশুকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় বস্ত্রও ইওনান ও ব্রহ্মদেশ হইয়া চীনের বাজারে প্রবেশ করিয়াছিল। এই বাণিজ্যের মাধ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতি চীনে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে হান সম্রাট মিঙ-তির রাজত্বকালে ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। পরবর্তীকালে কুমারজীব পরমার্থ প্রভৃতি কতিপয় শ্রমণের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম চীনের প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ফা-হিয়েন ভারত হইতে বহু সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি চীনা ভাষায় 'বিনয়পিটক' অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঙ সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক চৈনিক শ্রমণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে হিউয়েন সাঙ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রভাব চৈনিক শিল্পেও পড়িয়াছিল।

চীন

৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দো নামক জনৈক চৈনিক শ্রমণ কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই সমগ্র কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে রাজধর্মে পরিণত হয়।

কোরিয়া ও জাপান

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে তিব্বতের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্কের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রঙ-ৎসান গাম্পো তিব্বতের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর হইতেই ভারত-তিব্বত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। তাঁহার দুই মহিষী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে এই নরপতিও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধবিহার ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তিব্বতে ভারতীয় লিপির প্রবর্তন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

তিব্বত

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঃ প্রাচীন যুগে ভারতবাসীর নিকট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 'সুবর্ণভূমি' নামে পরিচিত ছিল। ভারতীয় বণিকগণ এই অঞ্চলকে ধনরত্নের আকর বলিয়া মনে করিতেন। তাই বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়া তাঁহারা সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, বলি প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ গড়িয়া তোলেন। স্থলপথে বাংলা, আসাম ও ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়াও ঔপনিবেশিকগণ অগ্রসর হন। উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহিত ভারতের এক গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

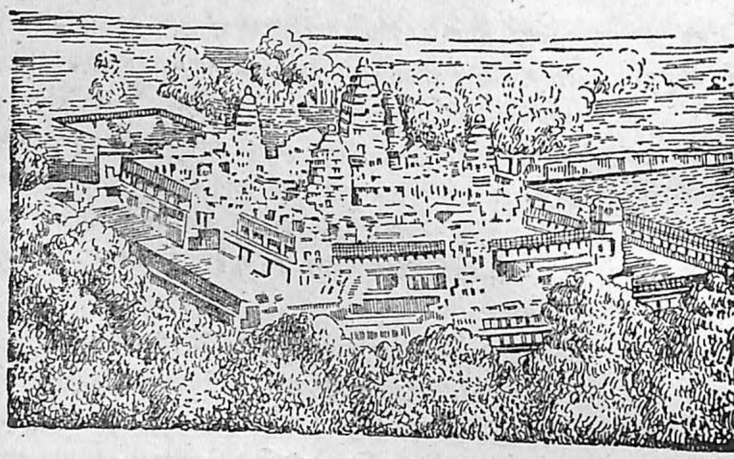
খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের মাধ্যমে ব্রহ্মদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই সময় সংস্কৃত ও পালি ভাষার চর্চা শুরু হয়। ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি স্থানীয় লিপিকে প্রভাবান্বিত করে। নবম শতাব্দীতে পাগানে একটি শক্তিশালী বৌদ্ধ রাজবংশের উদ্ভব হয়। এই রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়। পাগানে ভারতীয় স্থাপত্যরীতির অনুসরণে বহু স্তূপ ও মন্দির নির্মিত হয়।

ব্রহ্মদেশ

একটি প্রাচীন কিংবদন্তী অনুযায়ী কৌণ্ডিণ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কম্বোজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কম্বোজ একটি পরাক্রমশালী রাজ্যে পরিণত হয় এবং লাওস, কোচিন ও শ্যাম এবং মালয় উপদ্বীপের কিয়দংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। কম্বোজ-রাজগণ শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোন কোন নরপতি বৌদ্ধধর্ম অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেক শিলালিপি সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। কম্বোজ রাজগণের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি আঙ্কোরভাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ পরিখাবেষ্টিত মন্দিরটি বিভিন্ন ধাপে উন্নীত ; প্রতিটি ধাপের চতুর্দিকে কারুকার্যখচিত প্রাকার ও সুদৃশ্য তোরণ রহিয়াছে। সর্বোচ্চ ধাপে মূল মন্দির অবস্থিত। ভূমিতল হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট ; দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের রাজত্বকালে নির্মিত এই মন্দিরটি বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা

কম্বোজ (কাম্বোডিয়া)

হইয়াছিল। মন্দিরের দেওয়ালে মহাভারতের কাহিনী খোদিত রহিয়াছে। সপ্তম জয়বর্মন আঙ্কোরথোমে বেয়োন নামক একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরে প্রায় চল্লিশটি শিখর রহিয়াছে। মূল শিখরটি উচ্চতায় প্রায় ১৫৫ ফুট। শিখরের চারি পার্শ্বে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের মুখাবয়ব খোদিত আছে।



আঙ্কোরভাটের মন্দির

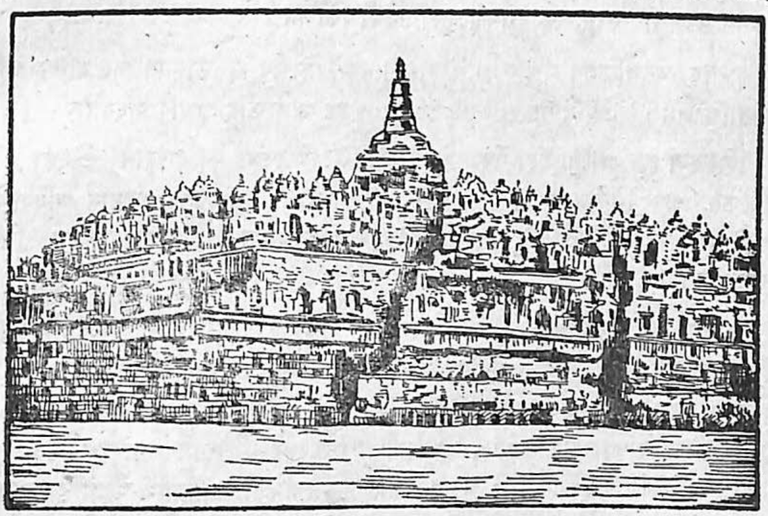
শৈলেন্দ্র বংশ

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপ এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সুমাত্রা জাভা, বলি ও বোর্ণিও লইয়া একটি বিরাট সাম্রাজ্য শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের নেতৃত্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শৈলেন্দ্ররাজগণ ছিলেন ভারতীয় অথবা ভারতীয় সভ্যতায় অনুপ্রাণিত।

শৈলেন্দ্র বংশের উত্থানের বহু পূর্বেই মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেসলী প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে রক্তমৃত্তিকা (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙা মাটি) হইতে আগত মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের সফল সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে। জাভায় কলিঙ্গ হইতে আগত ঔপনিবেশকগণ বসতি স্থাপন করেন। বোর্ণিওতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বলিদ্বীপও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দ্বারা বিজিত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে সুমাত্রায় শ্রীবিজয় নামে একটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্যের উদ্ভব হয়। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে মালয়, জাভা, বোর্ণিও এবং বলি এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শৈলেন্দ্র নরপতিদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে শৈলেন্দ্ররাজগণ বঙ্গদেশ হইতে আগত বৌদ্ধ দার্শনিক কুমার ঘোষকে তাঁহাদের ধর্মগুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে শৈলেন্দ্ররাজগণ মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকেন। শৈলেন্দ্র নরপতি বালপুত্রদেব পাল-সম্রাট দেবপালের রাজত্বকালে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শ্রীবিজয় রাজ্যেও বহু বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির নির্মিত হয়। ইহাদের গঠনশৈলী ভারতীয় স্থাপত্যরীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত; ভাস্কর্যও গুপ্তযুগীয় শিল্পকলা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। যবদ্বীপের বিখ্যাত বরবুদুরের স্তূপটি শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের শিল্পোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নয়টি স্তরে উন্নীত বেদীর উপরিভাগে অবস্থিত স্তূপটি বিশ্বপ্রকৃতিরূপে কল্পনা



বরবুদুরের মন্দির

করা হইয়াছে। সর্বনিম্ন সমচতুষ্কোণ স্তরটির দৈর্ঘ্য প্রায় চারিশত ফুট। বরবুদুর স্তূপের গঠন-প্রণালী এবং বৌদ্ধকাহিনী সম্বলিত প্রাচীরগাত্র ও বেদীস্তরগুলির ভাস্কর্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ৪৩২টি বুদ্ধমূর্তি সৌন্দর্যে অতুলনীয়। বরবুদুরের স্তূপটি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য ছিল ইন্দোনেশিয়ার প্রধান নৌশক্তি। কিন্তু নবম শতাব্দীতে জাভা শৈলেন্দ্ররাজের হস্তচ্যুত হয়। একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোল এই রাজ্যের একাংশে স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। হৃত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিলেও শৈলেন্দ্র রাজবংশের পূর্ব গৌরব আর ফিরিয়া আসে নাই।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ঔপনিবেশিকগণের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা শ্যামদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ইউনানের একটি কিংবদন্তী অনুসারে অবলোকিতেশ্বর ভারতবর্ষ হইতে এখানে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। আজিও

শ্যাম দেশ

শ্যাম দেশের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। শ্যামদেশীয় বর্ণমালাও ভারতীয় লিপি হইতে উদ্ভূত।

ভারত হইতে আগত ঔপনিবেশিকগণের প্রচেষ্টায় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ভিয়েৎনামের আন্নাম অঞ্চলে চম্পা নামক একটি হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চম্পা রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ই প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেখানে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত ভাষারও ব্যাপক চর্চা করা হইত। ভদ্রবর্মন নামক একজন নরপতি বৈদিক শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় ইন্দ্রবর্মন ষড়দর্শন ও সংস্কৃত ব্যাকরণে পারদর্শী ছিলেন।

চম্পা

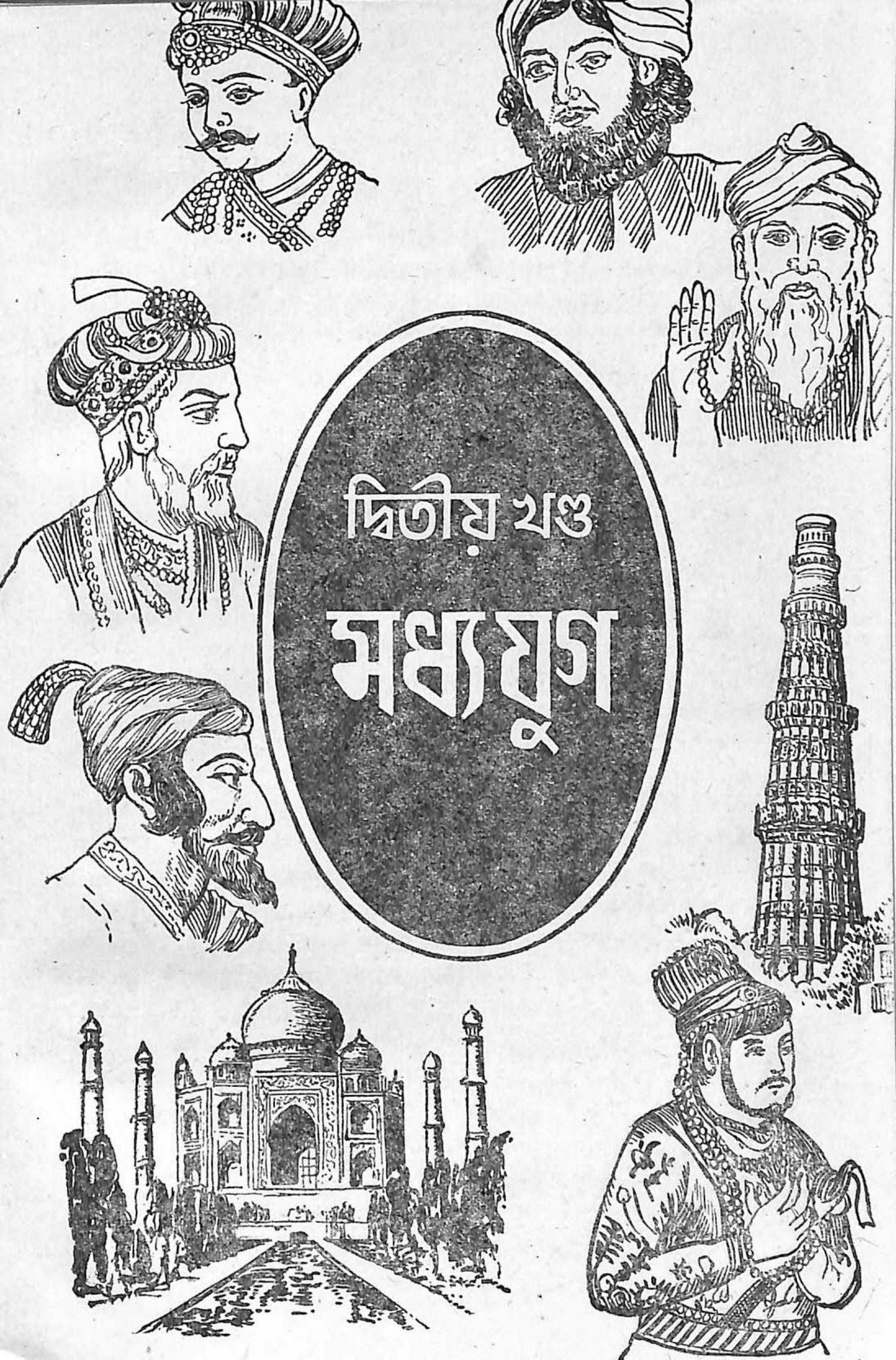
চম্পার নরপতিগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই মন্দিরগুলিতে গুপ্ত ও পল্লব স্থাপত্যের প্রভাব রহিয়াছে।

সিংহল ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই সিংহলের (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) সহিত ভারতের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। সিংহলের বর্তমান অধিবাসিগণের একটি বৃহৎ অংশ ভারত হইতে আগত ঔপনিবেশিকগণের বংশধর। তামিল—সিংহলের অন্যতম ভাষা।

কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধের জীবনকালে গুজরাট (মতান্তরে বঙ্গদেশ)-এর রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করিয়া নিজ নামানুসারে বিজিত রাজ্যের নামকরণ করেন সিংহল। সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক না হইলেও উপাখ্যানটি অতি প্রাচীনকালেই সিংহলে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের ইঙ্গিত দেয়। সম্রাট অশোক পুত্র (অথবা ভ্রাতা) মহেন্দ্র এবং কন্যা (অথবা ভগ্নী) সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহল দ্বীপে বুদ্ধদেবের বাণী প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। সেই সময় হইতেই সিংহল বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সিংহলরাজ মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়াতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহানামের রাজত্বকালে উত্তর ভারতের বিখ্যাত পালি ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ সিংহলে গমন করেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সিংহলে বহু বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনুরাধাপুর ও পোলোনারুবার স্তূপ দুইটি প্রসিদ্ধ। ভাস্কর্যে উৎকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ যে কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি আজিও অক্ষত রহিয়াছে, তাহাদের সব কয়টিই সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পরীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ। চিত্রশিল্পেও অনুরূপ প্রভাব দেখা যায়। সিগিরিয়ার গুহাচিত্রে অজন্তার আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে সিংহলে পালিভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়। বহু গ্রন্থ পালিভাষায় রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে মহাবংশ ও দ্বীপবংশ প্রধান। উত্তরকালে দক্ষিণ ভারতের তামিল রাজন্যবর্গ সিংহলে আধিপত্য বিস্তার করিলে এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে।


দ্বিতীয় খণ্ড
মধ্যযুগ

১

'মুসলিম ভারত' না বলিয়া কেন মধ্যযুগ বলা হইবে ?

["'Why should we call it 'Medieval India' rather than Muslim India" ?]

মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাস খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ৬০০ বৎসর অবধি বিস্তৃত এক বিরাট অধ্যায়। এই যুগের শাসনকর্তাগণ ছিলেন তুর্কী-পাঠান ও মুঘল বংশীয় মুসলমান রাজন্যবৃন্দ। তুর্কী-পাঠানগণ 'সুলতান' ও মুঘলগণ 'বাদশাহ' নামেই পরিচিত। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী কাল হইতে ইংরাজ ঐতিহাসিকদের একাংশ ভারতে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ঐ যুগকে মুসলমান-যুগ বলিয়া বর্ণনা করেন। ইংরাজ-রাজত্বকালেই ইহার প্রতিবাদে ভারতীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ ধর্ম উল্লেখ না করিয়া সুলতানী বা তুর্কী-পাঠান এবং মুঘল যুগের নামকরণ করিতে থাকেন। তখনো ভারতে ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার না ঘটায় এতকাল সাম্প্রদায়িকতা-সৃষ্টিকারী 'মুসলিম ভারত' নামকরণের পরিবর্তে গৃহীত হইয়াছিল 'সুলতানী' বা 'তুর্কী-পাঠান' এবং 'মুঘল-যুগ'—এইরূপ নামকরণ। অনেকের মতে, আকবরের উন্নত শাসনকাল হইতে ভারতে যে ঐক্যবদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো রচিত হইয়াছিল, তখন হইতেই আধুনিক ভারতের সূচনা।

কিন্তু আধুনিক ইতিহাস চর্চায় ঐ সকল মতই পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'মুসলিম-ভারত' নামটি বাতিল হইবার সুস্পষ্ট কারণ—ইহা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগবত বিরোধ উৎপাদন করিয়া পরবর্তীযুগে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। বহু তথ্যাদি অনাবিষ্কৃত থাকায় এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন লেখকের হাতে শাসক শ্রেণী ও শাসিতদের মধ্যে ব্যবধান অবলুপ্ত হইয়া মুসলমান শাসকমাত্রকেই অত্যাচারী ও হিন্দুবিদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জাতিগত ভিত্তিতেও নামকরণ ইতিহাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। কারণ শাসকশ্রেণীই তো সর্বদা সমগ্র দেশ ও জাতির প্রতীক হতে পারে না। সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের উপরে যাহারা জাতীয় জীবনধারা অব্যাহত রাখিয়া চলে, সেই জনসাধারণ তুর্কী-পাঠান-মুঘল জাতিভুক্ত নহেন। ভারতে বসবাস করিয়া ঐ সকল শাসকগোষ্ঠীর লোকও ভারতীয় চেতনা সম্পন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং, এই বিস্তৃত ভারত ইতিহাস কালের নূতন নামকরণের প্রয়োজন আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছিল। 'মুসলিম-ভারত' আখ্যাটি আরও অসম্পূর্ণ এই কারণে যে, ভারতজনের একটি খণ্ডাংশমাত্র গঠিত হইয়াছে মুসলিম জনগণকে লইয়া। ভারতজনের ইতিহাসধারা বা ঐতিহ্যকে কোনমতেই সম্পূর্ণরূপে মুসলিম প্রভাবিত বলা চলে না। দীর্ঘ ৬০০ শত বৎসরের রাজত্বকালে নিশ্চয়ই বিদেশী এবং বিধর্মী শাসকগোষ্ঠীর জীবনধারা নানাভাবে ভারত সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট

করিয়াছে। তাহাদের মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ার আরব সংস্কৃতি মধ্যযুগে উভয় দেশের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারে সাহায্য করিয়াছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষার আইন এবং দরবারী জীবন সম্পর্কিত বহু শব্দ—মুসলিম যুগের অবদান। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও তাহার যে ছাপ নাই, তাহা নহে। তথাপি, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে আমাদের পক্ষে এই ৬০০ শত বৎসরের ইতিহাসকে 'মুসলিম ভারতের' ইতিহাস বলা উচিত হইবে না।

কেন মধ্য যুগ ?ঃ আমরা দীর্ঘকাল ভারত-ইতিহাসকে বিশ্ব-ইতিহাসের ধারা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ঐ সময়ে ইউরোপীয় ইতিহাসের ধারা হইতে ভারত-ইতিহাসের ধারা একান্ত বিচ্ছিন্ন নহে। মধ্যযুগে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে যে সকল প্রভাব ও উপাদান কাজ করিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গেই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। পৃথিবীর অন্যত্র যেমন হইয়াছে ভারতেও তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ও বিভিন্ন ধর্মের লোকদের নানা অবদান রহিয়াছে। ইহাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতেই মধ্যযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং, একটি বিশেষ কালের পরিধি অবলম্বন করিলেই ইতিহাস-রচনার ভিত্তি সত্যের উপর প্রোথিত হইবে।

ইউরোপে এই যুগ 'অন্ধকার যুগ' বলিয়া দীর্ঘকাল পরিচিত ছিল। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর দাসশ্রমের বিরাট বিরাট চাষজমির বিলুপ্তি ঘটিয়া সেখানে ধীরে ধীরে সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি ঘটে। অনেক ভারতবিদদের মতে, আলোচ্য কালটিতে ভারতেও সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছিল। তবে ইউরোপ হইতে সেই সামন্ততন্ত্রের রীতির মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিবিধ ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান, সমাজে ব্রাহ্মণদের অখণ্ড প্রভাব, কোথাও বা বৌদ্ধ কিংবা জৈনদের প্রভাব ও সমাজে রক্ষণশীলতার প্রসার—বিদেশের সহিত সংস্রব হ্রাস ও তাহার ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধি হ্রাস। তৎকালীন ভারতের জমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার ধরনটি প্রধান হইলেও ভূসম্পত্তির অপর একটি অংশ ছিল—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্বাধীন অথবা সামন্ত ভূস্বামীদের অধীন।

রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে যেমন ওলটপালট ঘটিয়াছিল, ভারতে তাহা ঘটে নাই। ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সহিত বাণিজ্য হ্রাস পাইলেও মিশর, চীন ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশগুলিতে ভারতীয় পণ্য প্রচুর রপ্তানী হইত। ইহার ফলে ভারতে নানা বন্দর, নগর-নগরী গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং সেই সমস্ত নগরেই ছিল বড় বড় বাণিজ্য ও উৎপাদন-কেন্দ্র। তবে শহরের অধিকাংশ অধিবাসী তখনও কৃষিকার্য করিতেন। বণিকগণও নানা প্রভাবশালী সমবায় সঙ্ঘ গঠন করিয়া দেশের অর্থ নৈতিক জীবনে এবং স্বল্প হইলেও রাজনৈতিক জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিতেন। এ সমস্ত ভূ-সম্পর্ক যেমন সামন্ততন্ত্রের পরিচায়ক, তেমনি ঐযুগ ধরিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাজ্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও সামন্তজীবনধারারই একটি রূপ বিশেষ।

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বহুবিচিত্র নানা রাজ্য ও রাজার আবির্ভাব এবং যুদ্ধবিগ্রহের অন্তরালে ক্রমেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সামন্ততান্ত্রিকতার দীর্ঘ এবং ক্রমিক প্রক্রিয়া চলিতেছিল। খাজনা-প্রদায়িত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি ভূমিদানের তালিকাও বাড়িতে লাগিল। এই সকল জমির গ্রহীতা কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের উপর নির্ভরশীল কৃষকপ্রজাবৃন্দ উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে সুযোগ সুবিধা পাইতে লাগিলেও, গ্রাম্য মোড়লগণও ধীরে ধীরে কার্যত ছোট ছোট সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীতে পরিণত হইলেন। পরবর্তীকালে তাঁহাদের এই পদমর্যাদা রাজকীয় সনদবলে আইনসঙ্গত হইয়া উঠিল। এইভাবে ভারতীয় সমাজে যে নূতন ভূসম্পর্ক গড়িয়া উঠিল, তাহাই সামন্ততন্ত্র।

ইউরোপের সামন্ততন্ত্র বলিতে বুঝায় সামন্তপ্রধান নামে এক শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়। নিজ নিজ সেনাবাহিনীর সহায়তায় ইহারা বিরাট ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য করিতেন। রাজা ছিলেন অন্যতম শক্তিশালী সামন্ত। কালক্রমে রাজতন্ত্র অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিলে এই সকল সামন্ত-প্রধানদের ক্ষমতা সীমিত হইল। এইরূপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ভূসম্পত্তির অধিকারী অভিজাতবৃন্দই শাসন পরিচালনার কর্তৃত্ব করিতেন। মধ্যভারতের রাজপুতগণ যে শাসন পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত সামন্তপ্রথার বহু সাদৃশ্য দেখা যায়।

ইউরোপের সামন্তপ্রথার অন্য দুইটি বৈশিষ্ট্য ভারতে অনুপস্থিত ছিল। তাহার একটি 'ম্যানর' ও দ্বিতীয়টি 'সাফ'' প্রথা।

কিন্তু এই দুইটি প্রথা আনুষ্ঠানিকভাবে না থাকিলেও ভারতের জমিদাররা সামন্ত-প্রভুদের অধিকাংশ ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতেন। কৃষককূল সর্বতোভাবেই তাঁহাদের অধীন ছিল। কৃষকরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ছিল কিনা তাহা বড় কথা নহে; কিভাবে তাহাদের স্বাধীনতা প্রয়োগ করিতে পারিত, তাহাই ছিল আসল কথা।

সামন্তপ্রথা ছাড়াও এই যুগে ইউরোপের মানুষের জীবনযাত্রার উপরে খ্রীস্টান চার্চের বিশেষ প্রভাব ছিল। রাজা এবং সামন্ত প্রভুদের অনুদানে এবং বণিকদের আর্থিক আনুকূল্যে ইউরোপের মতো ভারতেও বহু ধর্মের মন্দির, মঠ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সামন্তযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচ্য ৬০০ শত বৎসরে ভারতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য এই বিস্তীর্ণ যুগকে সামন্তযুগের ধারক 'মধ্যযুগে ভারত' বলাই অধিকতর সমীচীন।

২

সুলতানী যুগের ইতিহাসের উপাদানের ধরনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

[A brief note on the types of sources The Sultanate Period]

১৮৪১ খ্রীঃ এলফিনস্টোনের 'ভারতের ইতিহাস' রচনায় সর্বপ্রথম উত্তর ভারতের ইতিহাসের একটি সামগ্রিক রূপ পাওয়া গিয়াছিল ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত। তাঁহার গ্রন্থটি রচিত হয় মূলত ফেরিস্তা ও কাফি খাঁর অনুসরণে। কিন্তু স্মিথের মতে, আধুনিক পাঠকদের পক্ষে সে গ্রন্থ ঐ যুগের ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটাইতে পারে নাই। দিল্লীর সুলতানী যুগের ইতিহাস রচনার সন্তোষজনক উপাদান নাই। যে সকল উপাদান আছে, তাহা প্রধানত চারি প্রকারের।

মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান ঃ মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ ; কারণ, ইহার উপযোগী পর্যাপ্ত উপাদান আছে। এ যুগের ইতিহাস রচনায় সরকারী দলিলপত্র, ফরাসী ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং জীবনীমূলক রচনা, মুদ্রা এবং বৈদেশিক-পর্যটকদের বিবরণ প্রভৃতি উপাদানের সাহায্য লইতে হয়।

(ক) **সরকারী দলিলপত্র ঃ** মুসলমান শাসকদের নির্দেশনামা, দলিল ও চিঠিপত্র ঐতিহাসিকদের মধ্যে মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনায় একটি প্রয়োজনীয় উৎস। তবে এই সকল দলিলপত্রের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইতস্তুতঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কিছু পাণ্ডুলিপি অবশ্য পাওয়া গিয়াছে।

(খ) **ফরাসী ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ ঃ** মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে মিনহাজউদ্দীন সিরাজের 'তবকাত্-ই-নাসিরী', জিয়াউদ্দীন বরণীর 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া আমীর খসরু, হাসান নিজামী, ফেরিস্তা প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের বিবরণসমূহ মধ্যযুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। বাবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বাদশাহদের আত্মজীবনী, আবুল ফজলের 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' এবং বদায়ুণী, কাফি খাঁ প্রভৃতি লেখকের গ্রন্থসমূহ হইতে মুঘলযুগের ইতিহাস ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ এবং বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া রাজস্থানী, মারাঠী ও বহুমুখী ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে মুঘলদের সহিত ঐ সকল জাতীয় সংঘর্ষের কাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। টড 'রাজস্থানের

ইতিহাস' (*Annals and Antiquities of Rajasthan*) রচনা করিতে চারণ-কবিদের রচনা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আরবীয়গণের সিন্ধু-বিজয় সম্পর্কে 'চাচনামা' নামক গ্রন্থখানি থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ইহা ছাড়াও স্থলতান মামুদের ভারত-আক্রমণ-কালে ভারতের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি বিবরণ পাওয়া যায় আল্-বেরুণীর 'তারিখ-উল-হিন্দ' নামক গ্রন্থখানি হইতে।

স্থলতানী আমলে প্রকাশিত আইন-সংক্রান্ত পুস্তকাবলী হইতে তৎকালীন মুসলমান শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায়। 'হিদায়াহ্ ও ওয়াকেয়াহ্'—সে যুগের বিখ্যাত আইন-সংক্রান্ত গ্রন্থ। অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল 'ফিকাহ্-ই-ফিরজশাহী'।

(গ) **মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন ঃ** মুদ্রা এবং শিল্পকলার নিদর্শন বিশেষ করিয়া স্থাপত্যশিল্প মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক জীবন এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধির অনেক সাক্ষ্য বহন করে। তবে রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় উহাদের বিশেষ মূল্য নাই।

(ঘ) **বৈদেশিক বিবরণ ঃ** মধ্যযুগে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। স্থলতানী আমলের ইতিহাস সম্পর্কে ইবন-বতুতা বিশেষ মূল্যবান বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তৎকালীন দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে নিকোলো কন্টি, আব্দুর রেজ্জাকের রচনাবলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল যুগ সম্পর্কে জেস্থইট ধর্মযাজকদের বিবরণ সমূহে অনেক অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়। ইউরোপীয় পর্যটক রাল্ফ ফিচ, স্থার টমাস রো, ট্যাভানিয়ে, বার্নিয়ে এবং মানুচী জনশ্রুতি অবলম্বনে অনেক বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

৩ ভারতে ইসলামের আগমন
[Advent of Islam in India]

আরবদের সিন্ধু বিজয় (৭১২ খ্রীঃ) ঃ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে (৬৩৭ খ্রীঃ) বোম্বাই-এর নিকট থানায় সর্বপ্রথম একটি আরব অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার পরে যথাক্রমে দেবল উপসাগর ও কেলাত জিলার চারিপাশে আক্রমণ ঘটে। ধীরে ধীরে অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত আরব আক্রমণের ফলে খলিফার সাম্রাজ্য আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বেলুচিস্থানে সাফল্য অর্জনের পরে আরবগণ সিন্ধু প্রদেশ জয়ে মনোনিবেশ করে। এই অঞ্চলটি পূর্বে শ্রীহর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণকালে রাজ্যটির রাজা ছিলেন শূদ্র বংশীয়। পরে চাচ্ নামে এক ব্রাহ্মণ বংশের রাজা সিংহাসন অধিকার করেন। তাহার পুত্র দাহির যখন সিংহাসনে, তখন ইরাকের শাসনকর্তা আল-হজ্জাজ্-এর নিকট সিংহল হইতে প্রেরিত কয়েকটি উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ সিন্ধুদেশের নিকট দেবল বন্দরে লুণ্ঠিত হইলে হজ্জাজ্ সিন্ধুদেশে কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন। প্রাথমিক কয়েকটি অভিযান ব্যর্থ হইবার পর হজ্জাজ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ ইবন্ বিন কাসিমের নেতৃত্বে এক বিরাট অভিযান প্রেরণ করেন। কয়েকজন বিশ্বাস-ঘাতকের সহায়তায় বিন কাসিম প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সিন্ধু জয় করেন। ক্রমে ক্রমে আরবগণ আব্বাসীয় বংশের অভ্যুত্থানের পর সমগ্র সিন্ধু, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, পশ্চিম রাজপুতানা, দক্ষিণ রাজপুতানা এবং ব্রোচের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ জয় করিয়া লইয়াছিল। দক্ষিণে চালুক্যগণ পূর্বে প্রতিহারগণ এবং উত্তরে কাকাতীয়গণ আরবদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়াছিল। আব্বাসীয় বংশের পতনের পর সিন্ধুদেশের আরবগণ খলিফার রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নানা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ৯৬২ খ্রীঃ আলপ্তগীন কর্তৃক গজনীতে একটি সাম্রাজ্য স্থাপনের পর আবার এই অঞ্চলের ইতিহাসের নূতন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রত্যক্ষ ফলের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে সিন্ধু-দেশে ইসলাম শক্তি প্রতিষ্ঠার তেমন কোন গুরুত্ব নাই। স্ট্যানলী লেন পুল-এর মতে, সিন্ধুবিজয় 'ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসের একটি ঘটনা মাত্র—একটি নিস্ফল বিজয় মাত্র'। আরব শাসন এই অঞ্চলে বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। মুসলমান অধিকারও তখন সিন্ধুদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিছুসংখ্যক ভারতীয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল মাত্র। তবে সাংস্কৃতিক দিক হইতে এই তুচ্ছ ঘটনাই বিরাট অর্থবহ। ভারত ও আরব অঞ্চলের মধ্যে ভাব বিনিময় ছাড়াও এই সংযোগের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি বিদেশে বিস্তার লাভের সুযোগ ঘটে। আরবগণ ভারতীয়দের নিকট হইতে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, ভেষজবিদ্যা, অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা এবং লোককথার জ্ঞানভাণ্ডার অর্জন করিয়া ইউরোপে প্রচার করে।

তুচ্ছ ঘটনা মাত্র

৪ মুসলিম শাসনের আরম্ভ

[Beginning of Muslim Rule]

মুসলিম অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অবস্থা ঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব অভিযাত্রীদের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। তবে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই সে অভিযান মহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সফল হইয়াছিল। এই সময়ে ভারত ছিল বহুধা বিভক্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত রাজ্যের সমষ্টি মাত্র।

উত্তর ভারতের সমসাময়িক রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান হইল উত্তর পশ্চিমের শাহী বংশ, কনৌজের গাড়ওয়ালগণ, দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশ, কাশ্মীর, কর্কট গুর্জর-প্রতিহার এবং পাল ও সেন বংশের বাংলাদেশ।

গৌরবের যুগে প্রতিহার-রাজগণ সাফল্যের সহিত আরব অভিযান প্রতিহত করিয়াছিলেন। তাহার পর সে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল পূর্ব আফগানিস্থান হইতে পশ্চিম পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাহী রাজবংশের উপর। গজনীর সুলতানদের আক্রমণে শাহী শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে একাদশ শতাব্দীতে উল্কার মতো গতিতে সুলতান মামুদ ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলির একক ও মিলিত প্রতিরোধ রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া সন্ত্রাস ও মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে মামুদের এই অভিযানের এলাকা ছিল বহু বিস্তৃত পশ্চিমে কাথিওয়াড়-এর সোমনাথ মন্দির হইতে গঙ্গা উপত্যকার কনৌজ পর্যন্ত। পাঞ্জাব তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর গজনী সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেখানে ঘুর বংশীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুলতান মামুদ ঃ ৯৯৮ খ্রীঃ মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে ইসলাম ধর্মের বীর নায়ক বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহাদের মতে, তিনি মধ্য এশীয় তুর্কী উপজাতীয় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মামুদ ইরাণীয় ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইরাণীয় স্বদেশ-প্রীতি, ফারসী ভাষা ও সংস্কৃতি-গজনী সাম্রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতিরূপে গৃহীত হইল। দুই শত বৎসর পরে তুর্কীরা ভারতে মামুদ প্রবর্তিত ইসলাম-পারসিক সংস্কৃতিই বহিয়া আনে।

তুর্কী উপজাতীয়দের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুসলিম রাজ্যগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থায় ও ইরাণীয় সংস্কৃতির নবযুগে মামুদের বিশেষ ভূমিকা থাকিলেও ভারতীয়দের নিকট তিনি এক হিংস্র লুণ্ঠনকারী হিসাবেই চিহ্নিত হইয়া আছেন। তিনি প্রায় সতেরো বার, প্রতিবৎসর শীতকালে ভারত আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিয়াছেন। লুণ্ঠনের পথে হিন্দু-মুসলিম রাজ্য বলিয়া কোন ভেদাভেদ রাখেন নাই। তাঁহার সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক অভিযান ছিল ১০২৫ খ্রীঃ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন। ইহাই ছিল তাঁহার শেষ অভিযান। গজনীতে ১০৩০ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ফলাফল : সেনাপতিরূপে যেমন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অজেয়, তেমনি ছিলেন বিরাট ও মহান এবং গজনী অঞ্চলের শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার উৎসাহে মহাকবি ফিরদৌসী কর্তৃক ফারসী ভাষার মহাকাব্য 'শাহনামা' রচিত হইয়াছিল। ভারতের লুণ্ঠিত অর্থে তিনি গজনীতে বিশাল পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তাঁহার আক্রমণের অন্য প্রত্যক্ষ ফল হইয়াছিল ভারতের পশ্চিমের প্রতিরোধের বাধা অপসারণ। পাঞ্জাব হইতে যে অঞ্চলে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন, পরবর্তী কালে সেই পথেই ভারত আক্রমণের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। আর যে একটি অমূল্য দান তিনি ভারতকে দিয়া যান, তাহা হইল মহাপণ্ডিত আলবেরুণী।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা

আলবেরুণী : সুলতান মামুদ খারাজিম অভিযানের সময় খিবা হইতে ঐ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে বন্দী করিয়া আনেন। তিনি সাধারণত আলবেরুণী নামে পরিচিত। তাঁহার প্রকৃত নাম আবু রিহান বিন্ আহম্মদ। ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্ম। গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মামুদ তাঁহাকে ভারতে লইয়া আসেন। তিনি মামুদের প্রত্যাবর্তনের পর দশ বৎসর থাকিয়া ভারত সম্বন্ধে নিজ, অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দুদের নানা দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। তাঁহার বিশিষ্ট বিষয়গুলি হইল জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্ক ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং খনিজতত্ত্ব। প্রতিটি গ্রন্থই এত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ যে, সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও তাহা সহজবোধ্য নহে। তাঁহার রচিত 'তহ্‌কক্-ই-হিন্দ' গ্রন্থটি তৎকালীন ভারত ইতিহাস রচনার একটি অমূল্য উপাদান। গ্রন্থটির অনুবাদকের মতে, তরবারির সংঘর্ষে ঝংকৃত, অগ্নিদাহে ভস্মীভূত নগরের পর নগর এবং অসংখ্য লুণ্ঠিত মন্দিরের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পরিবেশে যেন ম্যাজিকের মতো ধীর অচঞ্চল নিরপেক্ষ গবেষণা বিশেষ। প্রচলিত মুসলিম গোঁড়ামি উপেক্ষা করিয়া তিনি বিবেকবানের মতো একনিষ্ঠ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন সত্যের সন্ধানে।

আলবেরুণী ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতি গভীরভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। যে ভাবে ভগবদ্গীতাতে হিন্দু-দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহার প্রতি গভীর কৌতূহল ছিল আলবেরুণীর। সুলতান মামুদের হাতে শাহী-রাজগণের সংঘর্ষের সময় তিনি ভারতীয় রাজাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন।

তাঁহার মতে, এই সব রাজন্যবৃন্দ জলের মতো রক্ত বিসর্জন দিয়াছেন দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত। নিজে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিলেও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অতিশয় কঠোর। ভারতীয় পণ্ডিতেরা ছিলেন উদ্ধত, নির্বোধ, দাম্ভিক, আত্মাভিমানী ও অবিচলিত। তাঁহাদের স্বভাব হইল, তাঁদের অর্জিত জ্ঞান সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিতে চাহিতেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্ট জীবে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছিল না।

11 অভিযান হইতে সাম্রাজ্যগঠন
[From Invasion to Empire-building]

সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন : মহম্মদ ঘোরী : সুলতান মামুদের মৃত্যুর (১১৩০ খ্রীষ্টাব্দ) পর হিরাটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত রাজ্য ঘোরের অধিপতি গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ গজনী অধিকার (১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) করিয়া ভ্রাতা মুইজুদ্দীন মহম্মদকে তাহার শাসক নিযুক্ত করেন। এই মুইজুদ্দীনই ইতিহাসে মহম্মদ ঘোরী নামে খ্যাত। ভারতে স্থায়ী মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান অধিকার করেন। কিন্তু গুজরাট আক্রমণের সময় তিনি চালুক্যরাজ কর্তৃক পরাজিত হন (১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)। পর বৎসর তিনি পেশোয়ার জয় করেন এবং পরে সুলতান মামুদের বংশধরদের নিকট হইতে লাহোরও অধিকার করেন (১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহার পর দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশীয় নৃপতি পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ শুরু হয়। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

তরাইনের যুদ্ধ

১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রকে চান্দোয়ারের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মহম্মদ ঘোরী বারাণসী পর্যন্ত আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। অপরদিকে কুতবউদ্দীন কালিঞ্জর (১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ) ও গুজরাট (১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) অধিকার করেন। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর অধীনে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান আধিপত্য বিস্তার করেন। এইভাবে তরাইনের যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমে সিন্ধু নদ হইতে পূর্বে গঙ্গা নদী পর্যন্ত উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হইল।

চান্দোয়ারের যুদ্ধ

বঙ্গবিজয়

মহম্মদ ঘোরী ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। সুলতান মামুদের অভিযানের ফলে উত্তর ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম হইলেও মহম্মদ ঘোরীই ছিলেন তূর্কী সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা

কুতবউদ্দীন আইবক (১২০৬-১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ) : মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁহার ক্রীতদাস ও পরে সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক দিল্লীতে তুর্কী শাসন শুরু করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ দাস বংশ নামে খ্যাত, কারণ কুতবউদ্দীন ইলতুৎমিস ও বলবন প্রমুখ সুলতানগণ পরবর্তী জীবনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেও প্রথম জীবনে দাস ছিলেন।

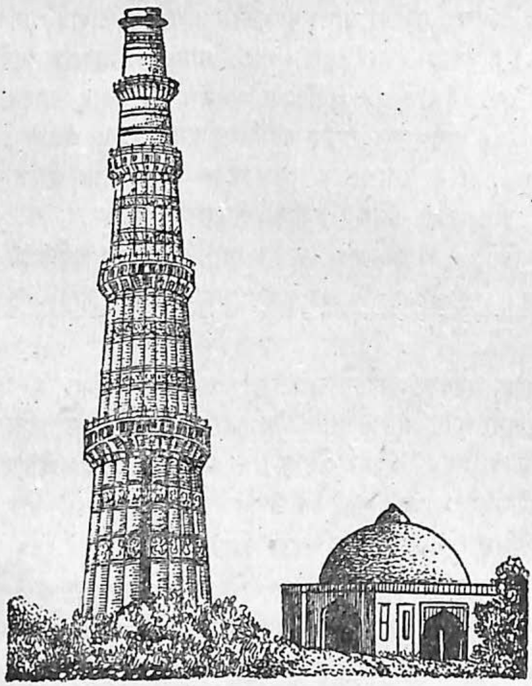
দাস বংশ

কুতবউদ্দীন প্রথমে ক্রীতদাসরূপে নিশাপুরের কাজীর নিকট বিক্রীত হন। পরে মহম্মদ ঘোরীর নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করা হয়। তাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা ও কর্তব্যপরায়ণতায়

মুগ্ধ হইয়া ঘোরী তাঁহাকে সেনাদলে নিযুক্ত করেন। পরে ঘোরীর উত্তর ভারত অভিযানে তিনিই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতবউদ্দীন-এর উপর ভারতের বিজিত রাজ্যগুলির শাসনভার অর্পিত হয়।

বাধাবিপত্তি

তাঁহার রাজত্বের অন্তরায় ছিল গজনীর শাসনকর্তার দিল্লীর উপর দাবী। তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া কুতবউদ্দীন ১২০৬ খ্রীঃ লাহোরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই ভারতের প্রথম সুলতান। দিল্লীর সুলতানী গজনীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করায় ভারতের পক্ষে মঙ্গলই হইয়াছিল; কেননা ভারতকে আর মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িতে হয় নাই। কুতবউদ্দীনের চরিত্রে দয়া ও নিষ্ঠুরতায় বিচিত্র সমাবেশ ছিল। দিল্লীর কুতবমিনারের নির্মাণকার্য তিনিই শুরু করেন। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে পোলো খেলিতে খেলিতে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার অপদার্থ পুত্র আরাম্ শাহ্ কিছু দিনের জন্য রাজ্য-শাসন করেন।



কুতব মিনার

ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ): শাসক হিসাবে আরাম্ শাহ্ ছিলেন অপদার্থ ও বিলাসপ্রিয়। ফলে দিল্লীর অভিজাত সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে কুতবউদ্দীনের জামাতা ইলতুৎমিস আরামকে পদচ্যুত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই ছিল ইলতুৎমিসের প্রধান কর্তব্য। ইলতুৎমিসকে উত্তর ভারতের তুর্কী বিজয়ের প্রকৃত ভিত্তি-স্থাপক বলা যায়। কারণ সদ্যগঠিত সাম্রাজ্যটির স্থিতি বিঘ্ন করিবার জন্য দেশের ভিতরে ও বাহিরে নানা শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কঠোর হস্তে দমন করিয়া ইলতুৎমিস আপন সিংহাসন সুরক্ষিত করেন। সিন্ধুদেশের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিন কুবাচা ও বাংলার আলিমর্দান কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। গোয়ালিয়র ও রণথম্ভোরের হিন্দু শাসকগণও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইলতুৎমিস অবিচলিত থাকিয়া বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন।

দেশী ও বিদেশী শত্রু

তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ সম্পূর্ণভাবে বিজিত হয়, রণথম্ভোর ও গোয়ালিয়র অধিকৃত হয় এবং উজ্জয়িনী লুণ্ঠিত হয়।

তাঁহার শাসনকালেই মধ্য-এশিয়ার দুর্দান্ত মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খাঁ তাহার পলাতক শত্রু খারাজম (বা খিবা)-এর নরপতির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধু পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু ইলতুৎমিস খারাজম রাজাকে আশ্রয় না দেওয়ায় চেঙ্গিজ ভারত ত্যাগ করেন ; ভারতও চেঙ্গিজের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।* ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদের খলিফা কর্তৃক ইলতুৎমিস সুলতান উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহারই রাজত্বকালে (১২৩১-১২৩২ খ্রীঃ) কুতবমিনারের নির্মাণকার্য শেষ হয়। খাজা কুতবউদ্দীন নামে এক মুসলমান সাধুর নামানুসারে কুতব মিনারের নামকরণ হইয়াছিল। শিশু তুর্কী-সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত করিয়া ইলতুৎমিস ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাম খাঁ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অপদার্থ বলিয়া অমাত্যগণ ইলতুৎমিসকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি আরাম শাহকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং তাহার সহিত দিল্লী সুলতানীতে বংশ পরম্পরায় সিংহাসন লাভের রীতি উঠিয়া যায়। তাহার মৃত্যুর পর কন্যা রাজিয়া—সুলতানা হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধেও নানা চক্র ও চক্রান্ত ঘটিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে নিহত হইতে হয়। রাজিয়ার মৃত্যুর পর দুই ভাই ছয় বৎসর রাজত্ব করার পর অমাত্যগণ ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিনকে সিংহাসন দান করেন।

গিয়াসুদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ তিনি প্রধান অমাত্য উলুঘ খাঁর জামাতা ছিলেন। ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় তিনি মারা গেলে (এন. সি. আর. টি. গ্রন্থ 'মধ্য যুগে ভারত' অনুসারে উলুঘ খাঁ কর্তৃক নিহত হইলে) উলুঘ খাঁ গিয়াসুদ্দীন বলবন নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বলবন রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে উদ্যোগী হন। প্রথমেই তিনি সামরিক সংস্কারের দ্বারা সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করিতে যত্নবান হন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার প্রচলন করা হয়। শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বলবন বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, বলবন তাঁহাদের জায়গীর কাড়িয়া লইয়া কঠোর হস্তে দমন করেন। দোয়াবের হিন্দু দস্যুদের ও মেওয়াটের রাজপুত দস্যুদের দমন করিয়া বলবন জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা করেন।

শাসন ও শৃঙ্খলা

১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে বলবন

* সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশিত চেঙ্গিজ খাঁর জীবনীতে অন্যরূপ দেখা যায়। চেঙ্গিজ বাহিনী দীর্ঘকাল মুলতান অবরোধ করিয়াও জয় করিতে পারে নাই। সেই সময় তিনি হিমালয়ের পথে দেশে ফিরিবার নিমিত্ত ইলতুৎমিসের অনুমতি প্রার্থনা করেন। যথাসময়ে সে অনুমতি না পাওয়ায় ব্যর্থ মনে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

তাঁহাকে দমন করিবার জন্য দুইবার সৈন্যদল প্রেরণ করেন। কিন্তু দুইবারই সুলতানী সৈন্যদল পরাজিত হইলে বলবন স্বয়ং তুঘরিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তুঘরিল পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সুলতানের সেনাদের হস্তে নিহত হন। তখন বলবন নির্মমভাবে তুঘরিলের অনুচরবর্গকে হত্যা করেন। এইরূপে বিদ্রোহ দমনের পর বলবন দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন।

তুঘরিল খাঁর বিদ্রোহ

বাংলার বিদ্রোহ দমনে বলবন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। বারংবার মোঙ্গলদের আক্রমণে পাঞ্জাবের অর্থনীতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিল। তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করিলে সুলতানী ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সম্ভাব্য মোঙ্গল আক্রমণের পথের মধ্যে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিয়া তথায় দুর্দ্ধর্ষ সুলতানী বাহিনী মোতায়েন করেন। স্থানীয় জনগণের মনে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তারূপে নিয়োগ করেন। তাহা বাড়া দ্বিতীয় পুত্র তুঘরা খাঁকে নিয়োগ করেন সামানার শাসনকর্তারূপে। রাজপুত্র দুইজনের অবস্থানে অঞ্চলটিতে শান্তি-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১২৮৫ সালের প্রচণ্ড মোঙ্গল অভিযান তাঁহারা প্রতিহত করিয়াছিলেন। অবশ্য সেই যুদ্ধে রাজপুত্র মহম্মদ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ পিতা সেই পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া দুই বৎসরের মধ্যেই মারা যান।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ

দিল্লীর পশ্চিমে অবস্থানকারী মেওয়াটগণ যুদ্ধপ্রিয় জাতি এবং প্রায়ই দিল্লী আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত। ইহার ফলে রাজধানীর শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সে যুগের দিল্লীর চারিপাশে ছিল ঘন জঙ্গল এবং সেই জঙ্গলে মেওয়াটগন আশ্রয় লইত। বলবন তাহাদের দমনের জন্য সমস্ত জঙ্গল কাটিয়া ফেলেন এবং ইতঃস্তত অনেক পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করিলেন। ইহার ফলে মেওয়াটদের অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছিল।

সুলতানী আমলের নরপতিদিগের মধ্যে নিঃসন্দেহে বলবন ছিলেন অনন্যসাধারণ। তাঁহার সময়ে দিল্লী মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। বলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কাইকোবাদ (১২৮৭-১২৯০ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অকর্মণ্য ও বিলাসী ছিলেন। খলজী আমীর জালালউদ্দীন ফিরুজ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করেন (১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ)।

বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ বিপদ ঃ মহম্মদ ঘোরী এবং দাসবংশের সুলতানগণ ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সত্য কথা। কিন্তু সে সাম্রাজ্য না ছিল সুসংহত না ঐক্যবদ্ধ। দূরদূরান্ত প্রদেশের শাসকগণ কদাচিৎ কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। জন্মমুহূর্ত হইতেই সুলতানী সাম্রাজ্যকে তিনটি বৃহৎ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমেই ছিল অভিজাতদের চক্র ও চক্রান্ত। তাহারা শুধুমাত্র পরস্পর কলহে লিপ্ত হইত না ; সুলতানের বিরুদ্ধে ওঅহরহ চক্রান্তে লিপ্ত হইত। দ্বিতীয় বিপদ আসিত হিন্দু রাজন্যবৃন্দের নিকট হইতে। তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষমতা

পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বদা বিদ্রোহের চেষ্টা করিতেন। তৃতীয় বিপদ ছিল বহিঃশত্রু মোঙ্গলদের আক্রমণ। কেবলমাত্র ইলতুৎমিস ও বলবনই একমাত্র সামরিকভাবে এই সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে সফল হইয়াছিলেন। তুর্কী সুলতানদের পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত কর্তৃত্ব স্থাপন প্রয়োজন ছিল; কারণ, মধ্য এশিয়া হইতে ঐ পথেই ভারতে সৈন্য, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত কিছু আসিত। পশ্চিম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতির জন্য দিল্লীর সুলতানী এই সমস্ত অঞ্চল দখলে রাখিতে সমর্থ হয় নাই। খারাজম (খিবা) সাম্রাজ্যের উত্থানে কাবুল, কান্দাহার ও গজনীর উপর হইতে ঘুরী আধিপত্য অতি দ্রুত লোপ পায়। খারাজাম সাম্রাজ্য সীমা তখন সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

এই সময় বৃহত্তর বিপদ আসে চেঙ্গিজ খাঁ-র নিকট হইতে। ইলতুৎমিস্-এর কুটনীতি ও সামরিক প্রতিভার ফলে ভারত চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইহার পর ক্রমেই ঐ অঞ্চলে মোঙ্গল আক্রমণের বিভীষিকা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য ইলতুৎমিস লাহোর সুলতানের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে মোঙ্গলগণ মুলতান অবরোধ করিলে বলবন অগ্রসর হইয়া তাহাদের প্রতিরোধ করেন। শাসক হিসাবে বলবনের ইহাই ছিল অন্যতম প্রধান সমস্যা। নিজে দিল্লীতে থাকিয়া অঞ্চলটির বিভিন্ন দুর্গের সংস্কার সাধন করেন এবং মোঙ্গলরা যাহাতে বিপাশা নদী অতিক্রম করিতে না পারে, তাহার জন্য ঐসব দুর্গের সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। ইহা ব্যতীত কূটনীতিক ক্ষেত্রে বলবন ইরান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মোঙ্গল শাসক ইলাও খাঁ-র দরবারে দূত-বিনিময় করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহাতেও কিছু হয় নাই। প্রায় প্রতি বৎসরই বলবনকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে হইয়াছে। দেশের অভ্যন্তরেও তাঁহাকে বাংলায় তুঘরিল খাঁর বিদ্রোহ এবং দোয়াব ও মেওয়াটের দস্যুদলকে দমন করিতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সুলতানী সুসংহতকরণ ঃ দাস সুলতানদের কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বহিরাক্রমণই নয়, দেশের নানা বিদ্রোহেরও সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সকল বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী মুসলিম প্রধানগণ ও রাজপুত রাজা এবং পরাক্রান্ত জমিদারগন। দিল্লী সুলতানীর বিরুদ্ধে বিহার ও বাংলাদেশের বিদ্রোহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলবন কঠোর হস্তে ঐ সকল বিদ্রোহ দমন এবং মঙ্গোলদের বহিরাক্রমণ রোধ করিয়া দিল্লীর সুলতানী সুসংহত করেন। অমাত্যদের আধিপত্য কাটাইয়া শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মোঙ্গল হানাদারদের আক্রমণ প্রতিরোধ ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের দস্যুদল দমন করিয়া দিল্লী সুলতানীর দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা—দাস বংশের প্রধান কৃতিত্ব। তাছাড়া রাজস্থানের সমগ্র অঞ্চলের উপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে দিল্লী সুলতানীর ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় রচনা সহজতর হইয়াছিল। বলবন কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা না করিলেও সুলতানীকে টিঁকাইয়া রাখেন। বলবন যে শক্ত ভিত্তিতে সুলতানীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া পরবর্তী খলজী সাম্রাজ্যবাদ বিকাশলাভের সুযোগ পাইয়াছিল।

৬ থলজী সাম্রাজ্যবাদ
[Khalji Imperialism]

আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্য বিস্তারঃ নিজের জীবদ্দশাতেই স্থলতান জালালউদ্দীন আলাউদ্দীনকে কোরা ও অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দীন ছিলেন অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী। দিল্লীর সিংহাসন-লাভ করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। আলাউদ্দীনের দেবগিরি জয়ের সংবাদ পাইয়া স্থলতান জালালউদ্দীন তাঁহার সহিত কোরায় সাক্ষাৎ করিতে আসিলে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। ইহার পর ওমরাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া বশীভূত করিয়া আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

মোঙ্গল আক্রমণ ও 'নব মুসলমানদের' বিদ্রোহ

আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের প্রথম ভাগে তাঁহাকে বারংবার মোঙ্গল আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়। আলাউদ্দীনের সেনাপতি জাফর খাঁ এই সকল আক্রমণ প্রতিরোধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আলাউদ্দীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বহু দুর্গ নির্মাণ বা সংস্কার করিয়া মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। এই সময় দিল্লীর উপকণ্ঠে বসবাসকারী 'নব মুসলমানগণও' বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। রাজকার্যে সুযোগ-সুবিধা না পাইয়া তাহারা স্থলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে আলাউদ্দীন অতি কঠোর হস্তে তাহাদের বিদ্রোহ দমন করেন।

রাজ্যবিস্তার

রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আলাউদ্দীন রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় নীতিতে প্রথমে বিশ্বাসী হইলেও পরে তিনি ভারত জয়ের বাস্তব নীতি গ্রহণ করেন। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট জয়ের উদ্দেশ্যে তিনি উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁর অধিনায়কত্বে এক অভিযান প্রেরণ করেন। গুজরাটরাজ কর্ণদেব পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তাঁহার রাণী কমলাদেবী বন্দিনী হইয়া পরে আলাউদ্দীনের মহিষী হন। অপর বন্দীদের মধ্যে মালিক কাফুর ছিলেন উল্লেখ্য।

রণথম্ভোর (১২৯৯-১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ)

চৌহান বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের বংশধর হামিরদেব আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 'নব মুসলমানদের' আশ্রয় দেওয়ায় আলাউদ্দীন ক্রুদ্ধ হইয়া রণথম্ভোর আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রথমে স্থলতান বাহিনী পরাজিত হয়। তখন আলাউদ্দীন স্বয়ং রণথম্ভোর অবরোধ করিয়া প্রতারণার সাহায্যে ঐ স্থান অধিকার করেন। হামির নিহত হন।

চিতোর

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন। রাজপুতগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হন। চিতোর আলাউদ্দীনের অধিকারে আসে। ইহার পর আলাউদ্দীন একে একে মালব উজ্জয়িনী মাণ্ডু বীর ও চন্দেরী জয় করিয়া প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন।

কিন্তু কেবলমাত্র উত্তর ভারত জয় করিয়াই আলাউদ্দীন ক্ষান্ত হইলেন না ; তিনি দাক্ষিণাত্য জয়ে মন দিলেন। এক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন মালিক কাফুর। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করিয়া যাদবরাজ রামচন্দ্রকে সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করেন। বরঙ্গলের কাকতীয়রাজ দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন (১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে দোরসমুদ্রের হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লাল এবং পাণ্ড্যরাজ দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন। রামচন্দ্রদেবের পুত্র শঙ্কর বিদ্রোহ করিলে কাফুর পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। মালিক কাফুর রামেশ্বরম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে খল্‌জী স্থলতানের আধিপত্য স্থাপন করেন।

দাক্ষিণাত্য জয়



আলাউদ্দীন খল্‌জী

শাসক হিসাবে আলাউদ্দীন স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মনীতির অথবা শরিয়তের বিধান না মানিয়া আপন মত অনুসারে তিনিই রাষ্ট্র শাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করেন। সৈন্যগণকে জায়গীরের পরিবর্তে বেতন দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হয়।

স্বৈর শাসন ও সামরিক বাহিনী

কেন্দ্রীয় শাসন সুসংহত করিবার প্রয়াস : অন্তর্বিদ্রোহ ও মোঙ্গলদের বহিরাক্রমণের পথ রুদ্ধ করিয়া আলাউদ্দীন একটি সুসংহত কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্রতী হন। এইভাবে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর দক্ষ কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

সিংহাসনে আরোহণকালে বারংবার বিদ্রোহে ব্যস্ত থাকায় তিনি বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেন। সেই যুগে কমিশনের নিয়োগ—একটি অতীব দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে তিনি আমীর ওমরাহের অর্থের প্রাচুর্য রোধের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের মদ্যপানের আসরেই সাধারণত বিদ্রোহের চক্র-চক্রান্ত হইত বলিয়া তাঁহাদের স্থলতানের অনুমতি ব্যতীত পারস্পরিক বৈবাহিক কিংবা অন্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয়। মদ্যপানের আসরে উপরেও স্থলতানের নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। আমীর-ওমরাহেরা যাহাতে স্থলতান ও রাজকর্মচারীর কর্তব্যে অবহেলা না ঘটাইতে পারে তাহারও নির্দেশ

অভিজাত বিদ্রোহ দমন ব্যবস্থা

দান করেন। ইহা ব্যতীত আমীর-ওমরাহের বিদ্রোহের আশংকা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি তাহাদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া যথাসম্ভব বেশী হারে রাজস্ব আদায়ের হুকুম দেন। স্থলতান স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করিয়া রাজকর্মচারী ও ওমরাহদের কাজের তদারক করিতেন। আমীর-ওমরাহ, রাজকর্মচারী, হিন্দু, এবং অন্যান্যদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য একটি দক্ষ গুপ্তচর বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছিল। আলাউদ্দীন নিযুক্ত গুপ্তচরের সংবাদ অনুযায়ী কেহ স্থলতানের নির্দেশ-বিরোধী কার্য করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইত। কেন্দ্রীয় শাসন সুসংহত করিবার নিমিত্ত আলাউদ্দীন নানা ধরনের কৃষি সংস্কারও করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনই স্থলতানদের মধ্যে প্রথম, যিনি কৃষকদের দেয় জমির খাজনা স্থির করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রধানরা যাহাতে কৃষকদের নিকট হইতে জোর করিয়া অর্থ বা শস্য আদায় না করিতে পারে, আলাউদ্দীন তাহার ব্যবস্থাও করেন। সেজন্য ঐসব অঞ্চলের ইকতা উচ্ছেদ করিয়া ভূমি-রাজস্ব সরাসরি সরকার কর্তৃক আদায় করিতে আরম্ভ করেন। তাহা ছাড়া পূর্বের আমলের সমস্ত দান, ধর্মীয় দান, মালিকানা স্বত্ব, বন্ধ মাসোহারা ব্যবস্থা বন্ধ হইয়াছিল। কৃষকদের ফসলের উৎপাদন পরিমাপ করাইয়া অর্ধেক রাজস্ব আদায় করা হইত। কৃষকদের দেয় রাজস্বের মোটা অংশ রাজকোষে জমা পড়ুক—ইহাই ছিল স্থলতানের লক্ষ্য। কৃষি ব্যতীত গোচারণ কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক প্রভৃতি ধার্য করিয়াও তিনি রাজকোষে অর্থাগম বৃদ্ধি করেন।

গুপ্তচর

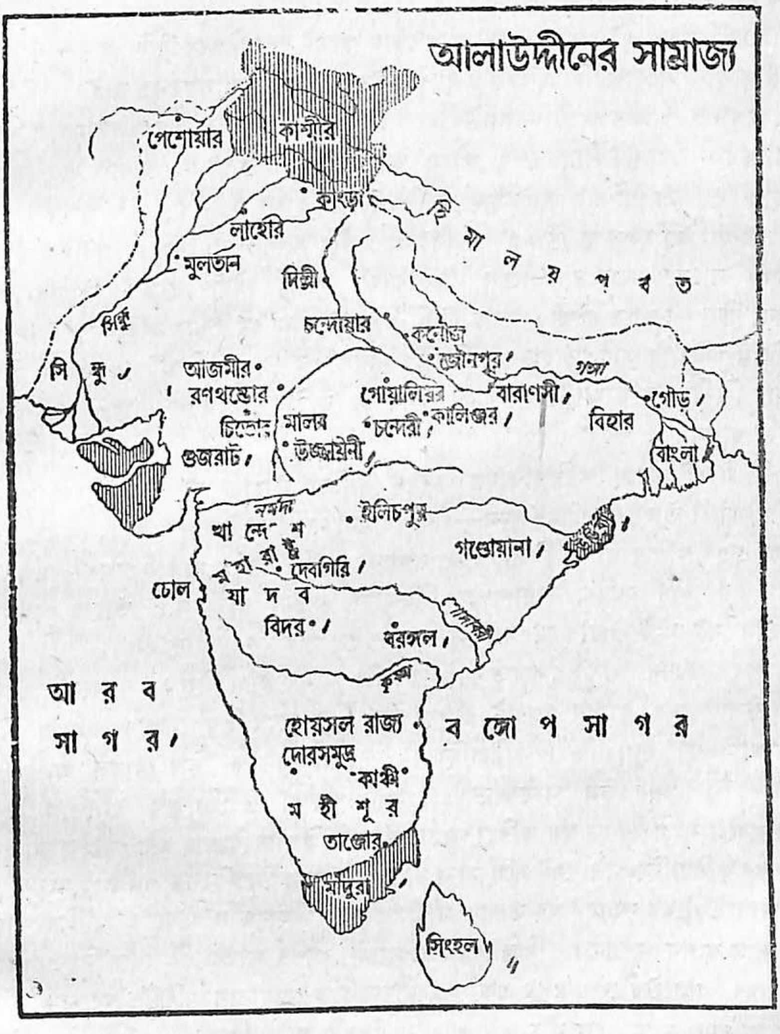
কৃষি সংস্কার

অর্থনৈতিক সংস্কার ও তাহার ফলাফলঃ আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রধানতমটি ছিল দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বা বাজার নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা। বর্তমানে ইংরেজী 'কণ্ট্রোল' ও বাংলা 'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটির সহিত আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক পরিচয় ঘটিলেও আজ হইতে প্রায় পৌনে সাত শত বৎসর পূর্বে ইহা নিঃসন্দেহে স্থলতানের এক অভিনব প্রয়াস।

চিতোর জয়ের পরে দিল্লীতে ফিরিয়া স্থলতান খাদ্যশস্য হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্ব, গবাদি পশু, ক্রীতদাস, আমদানী বস্ত্রাদি পর্যন্ত সমস্ত কিছুর মূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লীতে খাদ্যশস্য, ক্রীতদাস, অশ্ব ও গবাদি পশু এবং বিদেশী বস্ত্রের ন্যায় দামী দামী জিনিসের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বাজার স্থলতান নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণে ব্রতী হন। দিল্লী হইতে অযোধ্যা পর্যন্ত দোয়াব অঞ্চলের রাজস্ব কৃষকদের নিকট হইতে শস্যের মাধ্যমে আদায় করিয়া সরকারী শস্য ভাণ্ডারে জমা করা হইত। নির্দেশ যথাযথ পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য 'দেওয়ানী রিয়াসৎ' ও 'সাহানা-ই-মাণ্ডি নামে দুইজন বিশেষ কর্মচারী ছিল। কেহ বেশী দাম লইলে তাহার কঠোর শাস্তি হইত।

সৈন্য-বিভাগে সরবরাহের জন্য অশ্বের মূল্য নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক ছিল। এই সবের মূল্যও অত্যন্ত কড়াকড়ি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইত। তবে দামী বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদির মূল্য-নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক না হইলেও মনে হয় এই সকল দ্রব্যের উচ্চ মূল্য যাহাতে সাধারণ

দ্রব্যাদির মূল্যমানে কোন প্রতিক্রিয়া না ঘটায় কিংবা হয়তো আমীর-ওমরাহের খুশীর জন্যও এই মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।



স্থলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন খল্‌জীই প্রথম সৈন্যদের নগদ টাকায় বেতন দিতে থাকেন। বেতনের টাকা হইতেই অশ্বারোহীকে অশ্বের এবং নিজের ভরণপোষণ করিতে হইত। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, স্বল্প বেতনের ক্ষতিপূরণ উদ্দেশ্যেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস করিয়া তাহাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের প্রচেষ্টা হয়। ঐতিহাসিক বারণী মনে করেন যে, স্থলতানের

ফলাফল

আইনটি ছিল হিন্দুদের দমন করিবার জন্য। কেননা তখন অধিকাংশ ব্যবসায়ী ছিলেন হিন্দু এবং খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের উপর মুনাফা অর্জনের প্রতি তাহাদের ঝোঁক ছিল বেশী, তবে শুধু হিন্দুই নহে পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ার ব্যবসায়েও মুসলমানদের অংশ ছিল বেশী। তাহারাও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয়।

বারণী বলেন এই আইন-কানুন সাম্রাজ্যের সর্বত্রই পণ্য-নিয়ন্ত্রণ-বিধি রূপে চালু ছিল। কিন্তু অন্যান্য অনেকের মতে, দিল্লীর বাহিরে উহা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।

সুশাসক ও ভারতজয়ী আলাউদ্দীনকে ইবন বতুতা দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানরূপে আখ্যা দিয়াছেন। আলাউদ্দীনের শেষ জীবন কিন্তু অশান্তিতে কাটে। অনেকে মনে করেন, তাঁহার প্রিয় সেনাপতি কাফুরই তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন (১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

আলাউদ্দীনের কৃতিত্ব : সুলতানের গভীর উচ্চাকাঙ্খা ছিল। প্রাথমিক জীবনে সাফল্য লাভের ফলে সুলতানের উচ্চাকাঙ্খা অসীম হইয়া ওঠে। তাঁহার প্রথম বাসনা ছিল—হজরত মহম্মদের ন্যায় তিনিও একটি নূতন ধর্ম প্রচার করিবেন। ইসলামের চারিজন খলিফার ন্যায় তাঁহারও চারিজন সেনাপতির জগৎ জয় করিবার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় আকাঙ্খা ছিল—সমগ্র জগৎ জয় করিয়া আলেকজাণ্ডারের ন্যায় অক্ষয় কীর্তি স্থাপন।

তিনি এই বিষয়ে অভিজাতদের পরামর্শ চাহিলে তাঁহারা তাঁহাকে নিরস্ত করেন। দিল্লীর কাজী তাঁহাকে পরামর্শ দেন—প্রথম বাসনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে, কেননা কেহ সে ধর্ম গ্রহণ করিবে না। দ্বিতীয় ইচ্ছা সম্পর্কে তিনি উপদেশ দান করেন—আগে যেন ভারত জয় সম্পূর্ণ করেন, তাহার পরে বিশ্বজয়ের কল্পনা করিবেন। তাঁহার পরামর্শে সুলতান সেই দুইটি উচ্চাকাঙ্খা দমন করিয়া ভারত জয়ে মন দিয়াছিলেন।

তবে সুলতানী শাসন সুসংহত করিবার পক্ষে অনেক বাধা ছিল। বলবনের পরবর্তী দুর্বল সুলতানদের শাসনে গুজরাট, রাজপুতানা ও মালবের হিন্দু রাজাগণ পুনরায় নিজ নিজ আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহারা ব্যতীত ছিল মোঙ্গল আক্রমণের বিভীষিকা। আর ছিল অভিজাতদের গোপন শত্রুতা ও চক্রান্ত। সুলতান অপূর্ব প্রতিভাবলে সমগ্র ভারত জয় করিয়া কঠোর হস্তে অভিজাত বিদ্রোহ এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে সারা রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন শান্তি ও শৃংখলা।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র শিহাবুদ্দীন উমরকে মালিক কাফুর সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই কাফুর আততায়ী হস্তে নিহত হইলে ওমরাহগণ আলাউদ্দীনের অপর এক পুত্র মোবারককে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু মোবারক খসরু নামে এক নীচ বংশোদ্ভূত ব্যক্তির হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া নিজে ভোগবিলাসে মত্ত হন। খসরু তখন মোবারককে হত্যা করাইয়া নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু পাঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসক গাজি মালিক শীঘ্রই খসরুকে পদচ্যুত ও নিহত করিয়া স্বয়ং গিয়াসুদ্দীন তুঘলক নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩২৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্র জুনা খাঁ মহম্মদ বিন তুঘলক নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

7

মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন
[Short Assessment of Muhammad bin Tughluq's Rule]

মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রী)ঃ সুলতানী যুগে আলাউদ্দীন খলজীর পর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুলতান হইলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। কয়েকটি দিক বিচারে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় সুলতান। তাঁহার ন্যায় বিচিত্র চরিত্রের শাসক ইতিহাসে বিরল। তাঁহার চরিত্রে পরস্পর বিরোধী গুণের এক অভাবনীয় সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিক বারণী তাঁহাকে সৃষ্টির অন্যতম আশ্চর্য বলিয়াছেন। তিনি একাধারে অসমসাহসী, সেনাপতি, আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত, তর্কশাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন। দাতা আবার খামখেয়ালী ও অস্থিরচিত্ত। তাঁহার দান সম্বন্ধে বারণীর মন্তব্য, যে হাতেম তাই প্রমুখ দানবীরগণ যাহা দান করিতেন, তাহা ছিল সুলতানের এককালীন দানমাত্র। তিনি ফারসী ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল অতি সুন্দর। সুলতানের স্নেহ-পরায়ণতাও ছিল উল্লেখযোগ্য। ধর্মপ্রাণ মুসলমান হইলেও তাঁহার ধর্মান্ধতা ছিল না। হিন্দু নিপীড়নের কোন নীতি তিনি গ্রহণ করেন নাই। উলেমা ও মুফতিদের কোন নির্দেশ তিনি না মানিয়া নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে রাজ্য শাসন ও বিচার করিতেন। অভিজাত পরিবারভুক্ত হউক বা না হউক, যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি সকলকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অস্থিরচিত্ততা ও ধৈর্যহীনতাই তাঁহার সকল গুণ ঢাকিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে 'ভাগ্যহীন আদর্শবাদী' আখ্যায় ভূষিত করে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

রাজধানী স্থানান্তরঃ সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরেই সুলতান দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিতকরণের নির্দেশ দেন। দাক্ষিণাত্যের নব বিজিত অঞ্চলের শাসন-শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করা এবং মোঙ্গল আক্রমণ হইতে রাজধানী সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে সুলতান দক্ষিণ ভারতে মুসলিম শাসন বিস্তারের কেন্দ্রস্থল দেবগিরিতে নূতন রাজধানী নির্মাণের নির্দেশ দেন। ইহাই ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত পদক্ষেপ। সুলতান সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে দেবগিরিতে কয়েক বৎসর কাটাইয়াছিলেন বলিয়া নগরটির প্রতি তাঁহার বিশেষ মমত্ব ছিল। নূতন রাজধানীর নাম হয় 'দৌলতাবাদ'। এই উদ্দেশে তিনি বহু সরকারী কর্মচারী, অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধু-সন্তদের দেবগিরিতে যাইতে নির্দেশ দেন। দিল্লীর সমস্ত সাধারণ মানুষকে তিনি জোর করিয়া নিষ্ঠুরভাবে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া যে রটনা, তাহা অমূলক। দেবগিরিতে নূতন রাজধানী

হইলেও দিল্লী জনশূন্য হয় নাই। রাজধানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দিল্লী হইতে দেবগিরি পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মিত হয় এবং পথিকদের জন্য পথের পার্শ্বে বিশ্রামাগারও স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই অসুবিধা বুঝিয়া দৌলতাবাদ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইলে প্রজাদের অপরিসীম কষ্ট হয়। সুলতান বেশ বুঝিতে পারেন দৌলতাবাদ হইতে উত্তর ভারত শাসন অত সহজ নহে। তবে এই যাত্রার সবটাই অশুভ ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাইয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ব্যবধান সঙ্কুচিত করা হয়। তাহা ছাড়া উত্তর ভারতের সাধু-সন্তদের দৌলতাবাদে অবস্থানের ফলে এক নূতন সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচিত হইয়াছিল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে।



মহম্মদ বিন তুঘলক

মুদ্রা-সংস্কার: খ্রীষ্টীয় চৌদ্দ শতকে পৃথিবীতে রূপার ঘাটতি দেখা দেয়। আর্থিক অনটন দূর করিবার জন্য মহম্মদ বিন তুঘলক চীন ও পারস্যের অনুকরণে তামার নোটের প্রবর্তন করেন। কিন্তু ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই ভারতে ইতিপূর্বে অপ্রচলিত এইরূপ নোট লইতে অস্বীকার করে। তাহা ছাড়া জাল করার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বিত না হওয়ায় অবাধে নোট জাল হইতে থাকে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য অচল হইয়া পড়ে। বাধ্য হইয়া সুলতান তামার নোট প্রত্যাহার করেন এবং রাজকোষ হইতে জাল মুদ্রার পূর্ণ মূল্য শোধ করিয়া দেন। ইহার ফলে তাঁহার অশেষ আর্থিক ক্ষতি হয়।

উক্ত দুই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলেও সরকার শীঘ্রই ঐ আর্থিক সংকট কাটাইয়া ওঠে। ইবন বতুতা ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী আসিয়া সুলতানের ঐসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন কুফল দেখিতে পান নাই।

অন্যান্য পরিকল্পনা: পাঞ্জাব অঞ্চলে মোঙ্গলগণ আক্রমণ করিলে সুলতান তাহাদের আক্রমণ বিধ্বস্ত করিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন।

খোরাসান

ইহার পরে দেবগিরি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুলতান ভবিষ্যতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য খোরাসান বিজয়ের পরিকল্পনা করেন।

এই উদ্দেশ্যে বিরাট বাহিনী দীর্ঘকাল সীমান্ত অঞ্চলে রাখিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। অথচ ইতিমধ্যে মধ্য এশিয়ায় তৈমুর লঙের আবির্ভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা সুসংহত হওয়ায় এ আক্রমণ প্রচেষ্টা বিফল হইয়া যায়।

কারাজল

ভারত ও চীনের সীমান্তবর্তী কারাজল অঞ্চলেও সুলতান একটি অভিযান পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে প্রচুর লোকক্ষয় হইলেও সুলতানী সাম্রাজ্য পার্বত্য উপজাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। এই রাজ্যের রাজা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাৎসরিক কর দিতে রাজী হন।

মূল্যায়ন : লোকচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাবে শাসক হিসাবে মহম্মদ বিন তুঘলক ব্যর্থ হন। কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্য যে, সে যুগে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও মেধাবী ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহই ছিলেন না। বহু সদ্‌গুণের সমাবেশ থাকিলেও পরস্পর বিরোধী গুণেরও এক অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এইজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে 'পরস্পরবিরোধী গুণের অদ্ভুত সংমিশ্রণ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ফিরুজ তুঘলক (১৩৫১—১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) : দুর্ভাগ্য-সম্পন্ন সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুঘলক বংশের পতন শুরু হয়। তাহার পিতৃব্যপুত্র ফিরুজ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ফিরুজ ছিলেন দুর্বল ও রণবিমুখ; দিল্লীর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের সাধ্য তাঁহার ছিল না।

রাজ্য জয়

ক্ষমতালাভের পর ফিরুজ রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হন। বাংলার বিরুদ্ধে তিনি দুইবার (১৩৫৩ এবং ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) অভিযান করেন, কিন্তু পরিশেষে বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দান করিতে বাধ্য হন। ওড়িশা এবং পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাংড়া উপত্যকায় অবস্থিত নগরকোট দুর্গ তাঁহার অধিকারে আসে। সিন্ধুদেশকেও তিনি বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দাক্ষিণাত্যে তিনি আপন অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই।

শাসন সংস্কার

পরিবর্তনের রূপ : রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে তিনি মহম্মদ বিন তুঘলকের উদার ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসননীতি পরিহার করিয়া হিন্দু এমনকি সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের উপরেও নিপীড়ন চালাইলেন। শরিয়তের বিধানে শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া তিনি আলাউদ্দীন বা মহম্মদ তুঘলকের নীতি বিসর্জন দেন। ওড়িশা আক্রমণ কালে তিনি জগন্নাথ দেবের মন্দির অপবিত্র করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আলাউদ্দীন খল্‌জী কর্তৃক বিলুপ্ত জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজ্য বিস্তারে ব্যর্থ হইলেও ফিরুজ কতক-গুলি সংস্কার সাধন করেন। অনেক অনায্য কর রহিত করিয়া ও ভূমিকরের পরিমাণ হ্রাস করিয়া তিনি প্রজাদের আর্থিক দুর্গতির লাঘব করেন। আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক রহিত করিয়া ফিরুজ আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করেন। সেচ-ব্যবস্থা উন্নত করিয়া তিনি কৃষিরও উন্নতি সাধন করেন।

জনহিতকর কার্য : সামরিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইলেও ফিরুজ শাহ্ বহু জনহিতকর কার্য দ্বারা রাজ্যের কৃষির উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। চুরি ও অন্যান্য অপরাধের জন্য হাত-পা-নাক কাটিয়া দেওয়ার ন্যায় নিষ্ঠুর শাস্তিদান তিনি রদ করিয়া দিয়া কখনই শাস্তিস্বরূপ দৈহিক নির্যাতনের বিধান দেন নাই। দরিদ্রদের বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য বহু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র মেয়েদের বিবাহে পণের জন্য তিনি সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। মধ্যযুগেও যে রাষ্ট্রের প্রজাহিতৈষী ভূমিকা থাকিতে পারে ফিরুজ শাহ তাহা আপনার কার্য দ্বারা প্রমাণিত করেন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও সুলতান অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি বৃহদায়তন পূর্তবিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্যে গৃহ-নির্মাণ ব্যবস্থার তদারক করিতেন। সুলতানের অর্থনীতির সাফল্যে এবং আনুকূল্যে অনেক নগর তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হরিয়ানার হিসার এবং উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ আজও বর্তমান। তাঁহার আমলে ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের কারখানার উৎপাদন-কার্যে ও যুদ্ধে নিযুক্ত করায় রাজ্যের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কৃষকদের আরও মঙ্গল সাধনের জন্য ফিরুজশাহ্ যমুনা ও শতদ্রু নদী হইতে চারটি খাল খনন করান। তাহার সহিত অসংখ্য সেচখালের জাল বিস্তার করিয়া বৃহৎ অঞ্চলের চাষবাসের উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য তদারকের জন্য সরকার হইতে ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হইতেন। একটি খাল শতদ্রু হইতে ঘর্ঘরা পর্যন্ত গিয়াছিল; দ্বিতীয়টি সিমুর পর্বতমালা হইতে হানসী এবং হিসার; তৃতীয়টি ঘর্ঘরা হইতে হিরানী ঘেরা এবং চতুর্থটি যমুনা হইতে ফিরুজাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বহু পতিত জমিতে সুলতানের উদ্যোগে চাষবাস আরম্ভ করা হয় এবং তাহাতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সকল জমির আয়ের একটি অংশ শিক্ষা-প্রসারে ব্যয়িত হইত। রাজ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ায় কৃষক ও বণিকগণ সন্তুষ্ট ছিল; মূল্যস্তরও ছিল নিয়ন্ত্রণাধীন।

ফিরুজ শাহের উন্নত শিল্পরুচি ছিল। তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নগরগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ১২০০ উদ্যান ও পার্ক রচনা করেন। অনেক অট্টালিকা, মসজিদ, সরাইখানা, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ তাঁহার অন্যতম কীর্তি। উত্তর যমুনা অঞ্চল এবং মীরাট হইতে তিনি দুইটি অশোক স্তম্ভও দিল্লীতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

৮ তৈমুরের অভিযান
[Invasion of Timur]

তৈমুরের অভিযান (১৩৯৮ খ্রীঃ) : তৈমুর লঙ্ ছিলেন মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত সমরখন্দ-এর অধিবাসী। তিনি চাঘ্‌তাই বংশীয় এবং সমরখন্দ, ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্থান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করিয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন। তিনি খোঁড়া বলিয়া তাঁহাকে লঙ্ বলা হইত। খোঁড়া হইলেও তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ সমরকুশল সেনাপতি এবং দুঃসাহসী বীর। ফিরুজ তুঘলকের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে তৈমুর লঙ্ ভারত আক্রমণ করেন।

অভিযান

তিনি ১৩৭০ সালে বিজয় অভিযান আরম্ভ করিয়া সিরিয়া হইতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত সাম্রাজ্য জয় করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তৎকালীন সুলতান মামুদ শাহ ভয়ে ভীত হইয়া গুজরাটে পলায়ন করেন। তৈমুরকে বাধা দিবার কেহ ছিল না। তাহার সেনাবাহিনী দিল্লীর পথে বিভিন্ন নগর নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস এবং লুণ্ঠন করে। তাহার পরে দিল্লী প্রবেশ করিয়া নির্মমভাবে নগরটি ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিলেন এবং হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে হত্যা করেন। অবশেষে, বিপুল ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া এবং দিল্লীকে শ্মশানে পরিণত করিয়া তৈমুর সমরখন্দে প্রত্যাবর্তন করেন। যাইবার সময় খিজির খাঁকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। তৈমুরের এই আক্রমণে ভারত নিঃস্ব হইয়া গেল। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা প্রভৃতি প্রচুর ধনসম্পদ ভারতের বাহিরে চলিয়া গেল। ইহা ব্যতীত তৈমুর বহু কারিগরকে সঙ্গে লইয়া সমরখন্দে তাহাদের দিয়া নগরাদি নির্মাণ করেন।

ফলাফল

সুলতানীর ভাঙ্গন
[Disintegration of the Sultanate]

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১ খ্রীঃ) : ইহার পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তৈমুরের প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ। ইনি নিজেকে হজরত মহম্মদের বংশধর বলিয়া দাবি করেন। তাই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ 'সৈয়দ বংশ' নামে খ্যাত। তাঁহার আধিপত্য মাত্র দিল্লী ও তৎসন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ) : লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) জৌনপুর, দোয়াব প্রভৃতি অঞ্চলে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পুত্র সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ) পিতার মৃত্যুর পর ক্ষমতা লাভ করিয়া ত্রিহুত, বিহার প্রভৃতি স্থানে আপন আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হন।

কিন্তু তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইব্রাহিম লোদীর (১৫১৭-২৬ খ্রীষ্টাব্দ) অসদ্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের অধিপতি বাবরকে ভারত আক্রমণ করিতে আহ্বান জানান। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ) বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ভারতে মোগল শাসনের সূচনা করেন।

৯ | কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান
[Rise of Some Regional Powers]

ইলিয়াস শাহী শাসকদের অধীনে বাংলা ঃ সুলতানী শাসনের অবসানের পূর্বেই কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে ও দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলার ইলিয়াস্ শাহী বংশ, বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য।

বাংলার বিদ্রোহ দমনের জন্য মহম্মদ তুঘলক বাংলাদেশকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও বাংলার স্বাধীনতা স্পৃহা দমিত হয় নাই। হাজী ইলিয়াস শাহ নামে এক ব্যক্তি সমগ্র বাংলাদেশ নিজ অধিকারে আনিয়া সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। ইলিয়াস শাহী বংশ ৭২ বৎসর বাংলাদেশ শাসন করে। ইলিয়াস শাহ শক্তিশালী সুলতান ছিলেন। ওড়িশা জয় করিয়া তিনি নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু বিধ্বস্ত করেন।

সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ

পশ্চিমে বেনারস পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত হইলে ফিরুজ শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনি বিরাট বাহিনী লইয়া ইলিয়াসের নূতন রাজধানী পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। ইলিয়াস শাহ তখন একডালা দুর্গে আশ্রয় লইয়া দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবার পর তাঁহার সহিত ফিরুজের সন্ধি হয়। এই সন্ধির ফলে ইলিয়াস কামরূপ (আসাম)-এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহ ছিলেন জনপ্রিয় শাসক। ফিরুজ পাণ্ডুয়া জয়ের পর অভিজাত ও মোল্লাদের প্রচুর উপহার দিয়াও তাহাদের ইলিয়াসের বিরোধী করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকিত। তিনি শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরুজ তুঘলক তাঁহার বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালাইয়া সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার শাসনকালে বাংলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল এবং সিকান্দার শাহ তাহার রাজধানীকে দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। আদিনায় তাঁহার নির্মিত মসজিদ ভারতের মধ্যে অন্যতম।

সিকান্দার শাহ

ইলিয়াস শাহী বংশের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান সুলতান ছিলেন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। ন্যায়-নিষ্ঠার জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কথিত আছে, দৈবক্রমে তিনি এক বিধবার পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। বিধবা কাজীর নিকট নালিশ করিলে কাজীর সমন পাইয়া সুলতান বিনীতভাবে বিচারালয়ে

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ

উপস্থিত হন। তাহার পর কাজী কর্তৃক আরোপিত জরিমানা প্রদান করেন। বিচারের শেষে সুলতান কাজীকে বলেন যে, তিনি যদি ন্যায় বিচার না করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতেন।

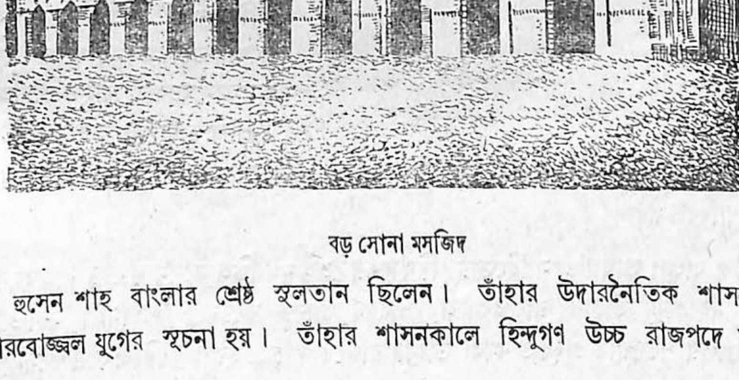
আজম শাহ বিশেষ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তৎকালীন সিরাজের মহাকবি হাফিজের সহিত তিনি পত্রালাপ করিতেন। চীন সম্রাটের দরবারেও তিনি দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীনের সহিত বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় সমুদ্রপথে বঙ্গদেশের বাণিজ্য অনেক বৃদ্ধি পায়। চট্টগ্রাম বন্দরও অত্যন্ত সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছিল।

রাজা গণেশের বংশধরদের সাময়িক রাজত্বের পর পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালে বাংলায় শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের আনুকুল্যে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচনা করেন। এই যুগেই সম্ভবত কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ
[Hussain Shah and Nasarat Shah]

ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালের শেষে বাংলায় কয়েক দশক ধরিয়া অরাজকতা চলিয়াছিল। এই অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাংলার অভিজাত ব্যক্তিরা আলাউদ্দীন হুসেন শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি বিদ্রোহী হাবসীদের কঠোর হস্তে দমন করিয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীর সুলতানের সহিত সম্মুখ যুদ্ধের পর তাঁহার সহিত দিল্লীর সুলতানের সন্ধি হয়। ইহার পর তিনি আপন রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। বিহারের উত্তরাংশ, ওড়িশা ও আসামের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)



বড় সোনা মসজিদ

হুসেন শাহ বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তাঁহার উদারনৈতিক শাসনে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা হয়। তাঁহার শাসনকালে হিন্দুগণ উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত

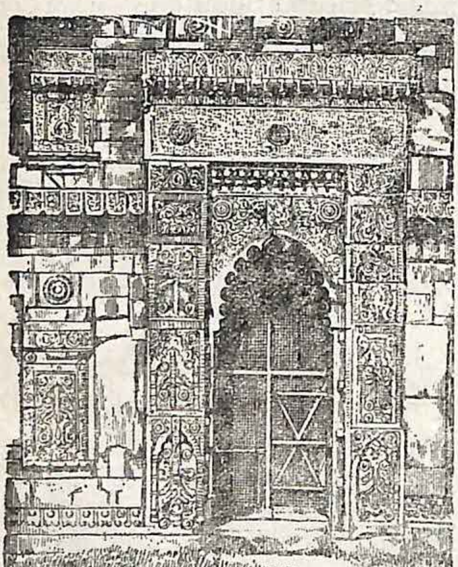
হইতেন। তাঁহার উজীর ছিলেন প্রতিভাবান হিন্দু; প্রধান চিকিৎসক, দেহরক্ষীদের প্রধান এবং টাঁকশালের অধ্যক্ষ সকলেই ছিলেন হিন্দু। বিখ্যাত বৈষ্ণব ভ্রাতৃদ্বয় রূপ ও সনাতন তাঁহার দরবারের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলতানের রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

সুলতান একাধারে বীর যোদ্ধা, সুশাসক ও শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল।

হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নসিব খাঁ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ত্রিহুত আক্রমণ করিয়া রাজাকে বধ করেন এবং অঞ্চলটির শাসনভার ভ্রাতা এবং শ্যালক-এর উপর অর্পণ করেন।

নসরৎ শাহ

নসরৎ শাহ বাবরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া ঘর্ঘরার নিকট সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যুদ্ধে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করিতে না পারিয়া বাবর তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।



ছোট সোনা মসজিদ

সাংস্কৃতিক উন্নতি

ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির নানা উন্নতি ঘটিয়াছিল। ইলিয়াস শাহী আমলে পাণ্ডুয়া ও গৌড় চমৎকার অট্টালিকায় শোভাময় হইয়া ওঠে। এই সকল অট্টালিকার এক নিজস্ব শিল্পরীতি ছিল, যাহা দিল্লীর শিল্পরীতি হইতে ছিল ভিন্নতর। প্রস্তর ও ইঁট উভয়ই এই সব অট্টালিকায় ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচয়িতা মালাধর বসুকে সুলতান বরবাক শাহ 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার পুত্রকে সম্মানিত করেন 'সত্যরাজ খাঁ' উপাধিতে।

কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের শ্রেষ্ঠ যুগ ছিল হুসেন শাহের রাজত্বকাল। চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার রাজত্বকালে প্রেমধর্ম প্রচার করেন। পরাগলী মহাভারত, বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ প্রভৃতি কাব্য তাঁহার রাজত্বে রচিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে হুসেন শাহ

আমলে গৌড়ে ছোট সোনা মসজিদ, জেলায় জেলায় মসজিদ ও বহু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নসরৎ শাহের আমলে বড় সোনা মসজিদ এবং কদম রসুল নির্মিত হইয়াছিল। আজও হুসেনশাহী যুগের গৌড় ও ইলিয়াস শাহী যুগের পাণ্ডুয়া এবং আদিনা পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু।

বাহমনী রাজ্য

[The Bahamani Kingdoms]

মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনের শেষ যুগে তাঁহার দুর্বলতার সুযোগে যে কয়টি মুসলিম রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল, তাহার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্য ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম হাসান বা জাফর খাঁ। ফেরিস্তার বিবরণ হইতে জানা যায়, হাসান প্রথম জীবনে গঙ্গু নামে এক ব্রাহ্মণের অধীনে কাজ করিতেন। প্রভুর চেষ্টায় হাসান জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি নিজেকে হাসান গঙ্গু বলিয়া পরিচয় দেন এবং রাজবংশের নাম রাখেন 'বাহমনী' (ব্রাহ্মণী শব্দটির অপভ্রংশ)। এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের সন্দেহ আছে। সে যাহাই হউক, তিনি আলাউদ্দীন বাহমন শাহ নামেই ইতিহাসে খ্যাত।

রাজ্য সীমা

বাহমন শাহের রাজ্য উত্তরে পেনগঙ্গা, দক্ষিণে কৃষ্ণা, পূর্বে ভন্‌গির এবং পশ্চিমে দৌলতাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাজ্যটি গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বিদর এবং বেরার—এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটির রাজধানী ছিল গুলবর্গা। বাহমনী রাজ্যের সীমা এক পাশে বিজয়নগর ও অপর পার্শ্বে তেলিঙ্গানা রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ফিরুজ শাহ

বাহমনী বংশে মোট চৌদ্দজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বের কাহিনী ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিজয়নগর রাজ্যের সহিত রক্তক্ষয়কারী সংগ্রামের ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফিরুজ শাহ ছিলেন বাহমনী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুলতান। যুদ্ধে তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারিলেও সুশাসক ও শিল্পানুরাগী হিসাবে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। গুলবর্গা শহরে তিনি বহু সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তখন আরব ও ইউরোপের সহিত বাহমনী রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত।

মামুদ গাওয়ান

বাহমনী রাজ্যের অপর যে ব্যক্তির নাম স্মরণীয়, তিনি সুলতান নন। তিনি ছিলেন প্রধান অমাত্য মামুদ গাওয়ান। তিনজন সুলতানের আমলে কাজ করিয়া তিনি বাহমনী রাজ্যের সীমা তেলেঙ্গানা ও ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। আমীর-ওমরাহের চক্রান্তে সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহ তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে বাহমনী রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীন হইয়া বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা, বেরার ও বিদর—এই পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য

স্থাপন করেন। বাহমনী বংশের রাজ্যের অবশেষ বিদরেই মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল। পরে বাহমনী বংশের শেষ সুলতানকে বিতাড়িত করিয়া আলিবদর স্বাধীন বিদর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শাসন-ব্যবস্থা

বাহমনী রাজ্যে সুলতানই ছিলেন সর্বপ্রধান শাসক। তাঁহার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম ও নিরঙ্কুশ। নামে কয়েকজন মন্ত্রী থাকিলেও তাঁহাদের প্রকৃত ক্ষমতা কিছুই ছিল না। রাজ্যটি কয়েকটি প্রদেশ বা তরফে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা তরফদার প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা চালাইতেন।

কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য জলসেচ প্রভৃতি উল্লেখ দেখা যায়। সুলতানদের অনেকে শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের আনুকূল্যে গুলবর্গায় ও বিদরে নির্মিত দুর্গ, মসজিদ ও প্রাসাদ ইত্যাদির শিল্পকার্য প্রশংসনীয়।

বাহমনী রাজ্যের পাঁচটি স্বাধীন বিভাগ

[Five Kingdoms of the Bahamani]

বিজাপুর : বাহমনী রাজ্যের ভগ্নস্তূপের উপর বিজাপুরে স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তোলেন ইউসুফ আদিল শাহ। তিনি পূর্বে মামুদ গাওয়ানের দাস ছিলেন। পরে আপনার কৃতিত্বে এই স্বাধীন রাজ্যে আদিলশাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুলতানও ছিলেন তিনিই। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না, ব্যক্তিগত জীবনে সকল দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন এবং ন্যায়নিষ্ঠ সুলতান রূপেই খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই প্রস্তর-শাহের নির্মিত বিজাপুর দুর্গ শিল্পকীর্তিরও পরিচারক। সেকালে গোয়া ছিল ইউসুফ আদিলের সুরম্য বিশ্রাম স্থল। পর্তুগীজ সেনাপতি আলবুকার্ক ১৫১০ খ্রীঃ গোয়া অধিকার করিলে সুলতান বন্দরটি অবরোধ করিয়া পর্তুগীজদের খুব বিপদে ফেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় গোয়া পর্তুগীজগণ পুনরুদ্ধার করে। সুলতান তাঁহার মহান চরিত্রের জন্য এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, মেড়োজ টেলারের মতে, তাঁহার সময়েও লোকে নিয়মিতভাবে তাঁহার সমাধিতে আলো দিত।

পরবর্তীকালেও বিজাপুর ও আহম্মদনগরের মিলিত বাহিনী কালিকটের নিকট পর্তুগীজদের পরাজিত করিতে পারে নাই।

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে বিজাপুরের ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঔরঙ্গজীব কর্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বিজাপুর আপন স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিল।

আহম্মদনগর : মালিক আহম্মদ নামে বাহমনী রাজ্যের এক অমাত্য আহম্মদনগরের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি দৌলতাবাদ জয় করিয়া নিজ রাজ্য সুদৃঢ় করেন। আকবর এই রাজ্য আক্রমণ করিলে চাঁদ সুলতানার নিকট প্রবল বাধা পাইয়াছিলেন। অবশেষে শাজাহানের আমলে রাজ্যটি মুঘল অধিকারে আসিয়াছিল।

গোলকুণ্ডা ঃ গোলকুণ্ডার মুসলিম রাজ্যটি গড়িয়া ওঠে বরঙ্গল হিন্দুরাজ্যের ধ্বংসের উপর। গোলকুণ্ডার প্রসার ছিল গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। পশ্চিম সীমান্ত গিয়া মিশিয়াছিল বিদর রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে। গোদাবরী এবং ওয়েন গঙ্গানদীর অববাহিকা পর্যন্ত উত্তর সীমান্ত বিস্তৃত ছিল। ইতিপূর্বেই ইহা বাহমনী রাজ্য কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। বাহমনী রাজ্যের কুতবশাহ নামে এক উচ্চকর্মচারী মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঔরংজীব তাঁহার দাক্ষিণাত্য অভিযানে রাজ্যটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীকালে গোলকুণ্ডার স্বাস্থ্যহানি ঘটায় সুলতান কয়েক মাইল দূরে—বর্তমান হায়দরাবাদে রাজধানী সরাইয়া আনেন। আজও গোলকুণ্ডায় কুতবশাহী রাজাদের কবর দেখিতে পাওয়া যয়ে।

বেরার ঃ বেরারের শাসনকর্তা বাহমনী রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সমগ্র প্রদেশে আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইমাদশাহী বংশ প্রায় একশত বৎসর বেরারে রাজত্ব করিয়াছিল। পরে রাজ্যটি আহম্মদনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

বিদর ঃ চারিদিকের প্রান্তিক প্রদেশসমূহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পরও বিদরে বাহমনী রাজ্যের শেষ শিখা টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছিল। পরে আমীর আলি বারিদ বাহমনী রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটাইয়া তথায় বারিদশাহী রাজ্যের প্রবর্তন করেন। অবশেষে, রাজ্যটি বিজাপুর কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল।

বিচ্ছিন্ন বাহমনী রাজ্যগুলির মধ্যে বিজাপুর শিল্পকার্যে অতি বিখ্যাত। এই বংশের চারজন সুলতান নানা অপূর্ব স্থাপত্য-নিদর্শন রূপে মসজিদ, পাঠাগার ও সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। তাজমহলের সমসাময়িককালে নির্মিত একটি সমাধির গম্বুজ আয়তনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পকার্য।

বাহমনী-বিজয়নগর সংঘর্ষের স্বরূপ

[The Conflict of the Bahamani-Vijaynagar and its nature]

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। উভয় রাজ্যের রাজারা কেবল জমকালো রাজধানী ও নগর স্থাপন করিয়া সুরম্য অট্টালিকায় তাহা সুসজ্জিত করেন নাই, তাঁহারা আইন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারেও সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বের পল্লব-চালুক্যদের বংশ পরম্পরাগত সংঘর্ষের মতো এই দুই রাজ্যের মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই ছিল।

সমস্ত রাজনৈতিক সংঘর্ষের পিছনেই কোন-না-কোন অর্থ নৈতিক কারণ থাকে। আলোচ্য রাষ্ট্র-দুইটির মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হইল—তুঙ্গভদ্রা দোয়াব, কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপ এবং মারাঠওয়াড়া দেশের পৃথক ও সুস্পষ্ট অঞ্চলের স্বার্থের সংঘাত।

সংঘর্ষের স্বরূপ

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল তুঙ্গভদ্রা দোয়াব। অর্থ নৈতিক সম্পদের জন্য এই অঞ্চল লইয়া বিরোধ চলিত পূর্বযুগে চালুক্য ও চোলদের

মধ্যে। কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকা ছিল অত্যন্ত উর্বর। অনেকগুলি সমুদ্রগামী বন্দর থাকায় এই অঞ্চলের বহির্বাণিজ্যের উপরও কর্তৃত্ব ছিল। তাই কৃষ্ণা-গোদাবরী দোয়াবের কর্তৃত্বের সহিত কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকার সংগ্রাম প্রায়ই একই সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িত। মারাঠাওয়াড়ার বিরোধের কারণ ঘটিত কঙ্কন ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রভুত্বকে কেন্দ্র করিয়া। পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র-ভূখণ্ড কঙ্কন ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং গোয়া বন্দরটি এখানেই অবস্থিত। গোয়া বন্দরের মধ্য দিয়াই এই অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানী হইত এবং ইরাক, ইরান হইতে ঘোড়া আমদানী হইত। ভারতে ভালো জাতের ঘোড়া না থাকায় দক্ষিণ অঞ্চলের ঘোড়া আমদানীতে এই বন্দরের গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশী।

বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত এবং সে সংঘর্ষ রাজ্য-দুইটির বিলুপ্তি পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই সকল সামরিক সংঘর্ষের ফলে বিতর্কিত অঞ্চলসহ চতুস্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটিত।

১৩৬৭ খ্রীঃ প্রথম বুক্ক তুঙ্গভদ্রা দোয়াব আক্রমণ করিলে বাহমনী রাজ্যের সুলতান প্রতি আক্রমণ করিতে বিজয়নগর রাজ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করেন। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর উভয়পক্ষে সন্ধি হয় এবং স্থির হয় যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে অসহায় ও নিরস্ত্র নরনারীকে হত্যা করা হইবে না। দক্ষিণ ভারতের এই সন্ধি মানবিকবোধকে জাগ্রত করার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। রাজ্য-দুইটির মধ্যে যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী কখনো একপক্ষে কখনো অন্যপক্ষের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ; ইহাতে উভয়পক্ষের অবস্থার কোন হেরফের হয় নাই।

বিজয়নগর-রাজ দেবরায় দুইবার বাহমনী-রাজ ফিরুজশাহের হস্তে পরাজিত হন। কথিত আছে দেবরায়ের কন্যার সহিত সুলতানের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও বিবাদ মেটে নাই। তৃতীয়বার বিজয়নগর আক্রমণ করিলে তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

যুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহমনী রাজাদের আধিপত্য ঘটিত। তাহার কারণ, বিজয়নগরের সেনাবাহিনী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে জানিত না। এই কৌশলে তুর্কীরা ছিল অধিকতর পারদর্শী। দ্বিতীয় দেবরায় নূতনভাবে অশ্বারোহী বাহিনী সুসজ্জিত করিয়া বাহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। উভয়ের মধ্যে তিনটি তুমুল যুদ্ধ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় রাজ্যই স্থিতাবস্থা বজায় রাখিয়া সন্ধি করে।

উভয় রাজ্যের মধ্যে শেষ সংগ্রাম ঘটে ১৫৬৫ সালে তালিকোটায়। বাহমনী রাজ্যের চারটি শাখা একত্রিত হইয়া বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। সে যুদ্ধে বিজয়নগরের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং রাজ্যটির বিলুপ্তি ঘটে।

বিজয়নগর সাম্রাজ্য
[Vijaynagar Empire]

প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ইতিহাস নানাভাবে বাহমনী এবং পরবর্তী সুলতানীগুলির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইলেও ভারতের ইতিহাসে এই

সাম্রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান থাকায় পৃথকভাবে ইহার আলোচনা অপরিহার্য। এই রাজ্যের নানাস্থানে প্রাপ্ত এত অসংখ্য লিপি রহিয়াছে যে, তাহা হইতে সাম্রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রায় পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া আছে পর্তুগীজ, রুশ প্রভৃতি বৈদেশিকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং ফেরিস্তার ন্যায় স্থানীয় মুসলিম লেখকদের রচনা। সমস্ত কিছু আলোচনা করিয়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে বিশিষ্ট স্থান না দিয়া পারা যায় না।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

১৩৩৬ খ্রীঃ সঙ্গম বংশীয় হরিহর ও বুক্ক নামে দুই ভ্রাতা তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্য তুঙ্গভদ্রা হইতে ত্রিচিনোপল্লী পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বুক্ক চীনদেশেও দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বুক্কের পুত্র দ্বিতীয় হরিহরের সময় বিজয়নগর রাজ্যের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহা সাম্রাজ্যের আখ্যা লাভ করে। তাঁহার আমলেই বাহমনী সুলতান ফিরুজশাহের সহিত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের সূচনা হইয়াছিল।

প্রথম দেবরায়

প্রথম ও দ্বিতীয় দেবরায়ঃ দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রথম দেবরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ফিরুজশাহের হস্তে দুইবার পরাজিত হইয়াছিলেন। নিজ কন্যার সহিত ফিরুজশাহের বিবাহ দিয়াও সে সংঘর্ষের অবসান ঘটে নাই। কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকার প্রশ্নে বিজয়নগর, বাহমনী রাজ্য এবং ওড়িশার রেড্ডী রাজ্যের সহিত পুনরায় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়; প্রথম দেবরায় ফিরুজশাহকে পরাজিত করিয়া পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। এইবার দেবরায় ফিরুজশাহকে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। দেবরায় দেশে শান্তিরক্ষায় উদাসীন ছিলেন না। তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীতে বাঁধ নির্মাণ করিয়া শহর পর্যন্ত খাল কাটিয়া শহরের পানীয় জলের অভাব ঘুচাইয়াছিলেন। ঐ খালের পার্শ্ববর্তী চাষের জমিতেও তিনি জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশের রাজস্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হরিদ্রা নদীতেও বাঁধ দিয়া তিনি জলসেচের উন্নতি করেন। তাঁহার পরেই উল্লেখযোগ্য রাজা হইলেন দ্বিতীয় দেবরায়। তিনিই সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

দ্বিতীয় দেবরায়

দূরদর্শী শাসক ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার সৈন্যদলে অনেক নিপুণ মুসলিম অশ্বারোহী তীরন্দাজ নিয়োগ করেন। নূতন সুসংগঠিত সেনাবাহিনী লইয়া দ্বিতীয় দেবরায় লুপ্তরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বাহমনী রাজার সহিত তিনটি তুমুল যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে চরম মীমাংসা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত উভয় রাজ্যই স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে স্বীকৃত হইয়া যুদ্ধ পরিহার করে। এই সময় বিজয়নগর সাম্রাজ্য সারা দক্ষিণ ভারত এবং সিংহলের সীমান্ত বরাবর বিস্তৃত হইয়াছিল। সঙ্গম বংশে বিজয়নগরের ইহাই ছিল চরম গৌরবের যুগ।

সাম্রাজ্যের অবস্থাঃ দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

সযত্নে সুসংগঠিত নানা বিভাগে বিজয়নগর প্রশাসনিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে সর্বদাই পার্শ্ববর্তী বাহমনী ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছে এবং সেজন্য এক সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী পালন করিতে হইত। তথাপি, তাহাকে মূলত সামরিক রাষ্ট্র বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সহিত শাসকগণ এত দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষত নিরাময় করিয়া রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধি স্থাপিত হইত।

শাসনতান্ত্রিক

রাজাই ছিলেন রাজ্যে সর্বেসর্বা। তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত একটি মন্ত্রিসভা ছিল। সমাজের সকল বর্ণের লোকের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিয়োগ করা হইত। পারস্যের রাজদূত আব্দুর রেজ্জাক এবং পর্তুগীজ পর্যটক নুনিজ-এর মতে, সরকারী কাজ চালাইবার জন্য একটি বিরাট দপ্তর ছিল। রাজদরবার ছিল অতিশয় বিলাস বহুল। সমগ্র সাম্রাজ্য কয়েকটি মণ্ডল বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলি আবার পর্যায়ক্রমে বিভক্ত ছিল ভেন্থী, নাডু এবং গ্রাম প্রভৃতি নানা বিভাগে। গ্রামগুলি ছিল শাসনের নিম্নতম বিভাগ।

ভূমি-রাজস্বই ছিল বিজয়নগর রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস। রাজস্ব আদায়ের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ ছিল। রাষ্ট্রের বিরাট ব্যয় নির্বাহের জন্য কর ভার অত্যন্ত অধিক ছিল। রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তাহা সত্ত্বেও দেশের সর্বত্র বিচারালয় ছিল।

পর্তুগীজ পরিব্রাজক নুনিজ-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বিজয়নগর রাজ্যে মহিলাদের সমাজে উচ্চাসন ছিল। বিদ্যাচর্চ্চা, শিল্পচর্চ্চা, শরীরচর্চ্চা, সরকারী কাজ সর্বত্রই মহিলা কর্মীর স্থান ছিল। ধনীদের মধ্যে পণপ্রথার প্রচলন ছিল; সমাজে সতীদাহের প্রচলনও ছিল। সমাজপতি ছিলেন ব্রাহ্মণরা। খাদ্যদ্রব্যে আমিষ নিরামিষ ভেদাভেদ বিশেষ ছিল না।

সামাজিক

বিজয়নগর সম্রাটগণ শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল, কাণ্ডড়া সকল ভাষারই উন্নতি সাধনে তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য, মাধবাচার্য এই যুগে বিজয়নগর রাজসভা অলংকৃত করিতেন। এক কথায় বলা চলে, বিজয়নগরের সংস্কৃতি ছিল দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির সমন্বয়িত রূপ। ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কণ্টি বিজয়-নগরের অপূর্ব বিবরণ দিয়াছেন—নগরটির পরিধি ছিল ৬০ মাইল, প্রাচীর ছিল পর্বতগাত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। কালিকটের সভায় পারস্যের রাজদূত আবদুর রজ্জাক বলেন যে, পৃথিবীতে তিনি যত জাঁকজমক পূর্ণ রাজধানীর কথা শুনিয়াছেন—বিজয়নগর তাহাদের অগ্রগণ্য।

সাংস্কৃতিক

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে জনসাধারণের অর্থ নৈতিক জীবন সকল যুগে প্রায় একই প্রকার ছিল। গ্রামাঞ্চলের লোক অধিকাংশ খড়ের চালের এক দরজার ঘরে বাস করিত। তাহারা খালি পায়ে চলাফেরা করিত, দেহের উর্দ্ধাঙ্গ রাখিত অনাবৃত। উচ্চশ্রেণীর লোক কখনো জুতা পরিত এবং মাথায় সিল্কের পাগড়ি পরিত। অলংকার সকল শ্রেণীর লোকেরই প্রিয় অঙ্গভূষণ ছিল। সাম্রাজ্যটি কৃষিকার্যে

অর্থ নৈতিক জীবন

এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। আবদুর রেজ্জাক বলেন যে, বিভিন্ন শিল্পের কারিগরীদের গিল্ড ছিল এবং অসংখ্য বন্দরপথে বিজয়নগরের বাণিজ্য চলিত বিদেশের সহিত, শিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল তন্তুজ, খনিজ এবং ধাতব জিনিসপত্র উৎপাদন। শস্যভেদে মৃত্তিকার তারতম্য অনুযায়ী জলসেচের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে কৃষকদের রাজস্বের হারের তারতম্য ছিল।

দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর কিছুকাল বিশৃঙ্খলা চলিবার পর তুলুঘ বংশীয় কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেক ঐতিহাসিক তাঁহাকে বিজয়নগরের সকল রাজবংশীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়া তিনি বিজয়নগরের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি রায়চুর, দোয়াব ও উদয়গিরি পুনরুদ্ধার করেন। বিজাপুর রাজ আদিল শাহকে পরাস্ত করিয়া তিনি বিজাপুর বিধ্বস্ত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য উত্তরে ওড়িশা ও বিজাপুর এবং দক্ষিণে সুদূর সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কৃষ্ণদেব রায়

কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ এবং উদার শাসক। সকল ধর্মের প্রতি তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ছিল। শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষাপ্রসারের প্রতি তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। সারা রাজ্যে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজব্যয়ে সেখানে পড়াশুনার ব্যবস্থা হইত। তিনি একজন মহান নির্মাতাও ছিলেন। বিজয়নগরের নিকট তিনি একটি নূতন নগর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। জলসরবরাহ ও জলসেচের জন্য সেখানে এক বিরাট দীঘিও খনন করেন। তাঁহার রাজত্বে তেলেগু সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছিল।

কৃষ্ণদেব রায়ের আমলের শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন

[Administrative Social Cultural and Economic life in the reign of Krishnadev Roy]

বিজয়নগরের শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্বন্ধে কৃষ্ণদেব রায় রচিত রাষ্ট্রবিষয়ক গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। তাহাতে তিনি রাজকর্তব্য সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়াছেন। সম্রাটই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাহাকে পরামর্শ দিবার জন্য ছিল অভিজাতবৃন্দ লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভা। সমগ্র রাজ্য কয়েকটি মণ্ডলম্ বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই সকল প্রদেশ আবার নাড়ু বা জিলা, স্থল বা মহকুমা এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রচুর স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন। রাজা সেনানায়কদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্বদেয় ভূখণ্ড দান করিতেন। সেনা প্রধানদের পলিয়গর বা নায়ক বলা হইত। রাজকার্যের জন্য তাহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য পালন করিতে হইত এবং রাজকোষেও অর্থ জমা দিতে হইত।

প্রশাসনিক

সম্রাট রাজ্যের সর্বপ্রধান শাসক, বিচারক ও সেনাপতি হইলেও স্বেচ্ছাচারী শাসক বলিতে যাহা বুঝায়, কৃষ্ণদেব রায় তেমন ছিলেন না। ধর্মের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া

তিনি রাজ্যশাসন করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকল শ্রেণীর পণ্ডিতদের মধ্য হইতেই তিনি মন্ত্রী মনোনীত করিতেন এবং চূড়ান্ত আদেশের ভার তাঁহার উপর থাকিলেও তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শমতো চলিবার চেষ্টা করিতেন।

প্রদেশের আয়ের ⅓ কর স্বরূপ নির্দিষ্ট ছিল। প্রজার উপর উৎপীড়ন করিলে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য কর দিতে আপত্তি করিলে বা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে প্রাদেশিক শাসন-কর্তার সে বিদ্রোহ দমনের অধিকার ছিল। তাঁহার আমলে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিলে প্রাদেশিক শাসন-কর্তারা স্বাধীন রাজার মতো থাকিতে পারিতেন। অবশ্য পরবর্তী দুর্বল রাজাদের আমলে এই স্বাধীনতা ক্ষতিকর হইয়াছিল।

তাঁহার আমলে বিজয়নগর রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ইতালীয় পর্যটক পায়েস, বারবোসা, প্রমুখ পর্যটকগণ নানা বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন পরধর্মমত-সহিষ্ণু এবং উদার।

সামাজিক

বারবোসার মতে, তাঁহার রাজত্বে সকলেরই যত্রতত্র চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল এবং নিজ নিজ ধর্ম পালন করিয়া শান্তিতে জীবন যাপনের সুযোগ ছিল। সমাজ-জীবনে সকল পর্যটকই তাঁহার ন্যায়-বিচারের প্রশংসা করিয়াছেন। মহিলারা এই যুগে মল্লযুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করিতেন। রাজ্যের সর্বত্র নৃত্যগীতাদির চর্চা হইত। রাজমহিষীরাও সঙ্গীত চর্চা করিতেন। তাঁহার আমলেও বিজয়নগরের সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা ছিলেন প্রধান। তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য এবং আচার ব্যবহারে অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে পৃথক ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ নিরামিষাশী ছিলেন এবং রাজনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিতেন। সমাজে পুরুষের বহু-বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। মুসলমানগণও তাঁহার শাসনকালে নিরুপদ্রবে স্বীয় ধর্মাচরণ করিতে পারিত।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাঁর যুগে নবজাগরণ ঘটে। সম্রাট স্বয়ং তেলেগুতে 'আমুক্ত মালয়ড়' নামে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রাজসভায় ছিলেন 'অষ্টদিগ্‌গজ'

সাংস্কৃতিক

নামে আটজন মহাপণ্ডিত। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য এবং তাঁহার ভ্রাতা মাধবাচার্য তাঁহার আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাকবি পেদ্দিন তেলেগু সাহিত্য জগতে ছিলেন বিরাট খ্যাতিসম্পন্ন। কৃষ্ণদেব রায়ের আমলের হাজারা মন্দির দক্ষিণী স্থাপত্য শিল্পকীর্তির অপূর্ব নিদর্শন।

কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে বিজয়নগরের ব্যবসায়ী জাহাজ মালদ্বীপে নির্মিত হইত বলিয়া বলিয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর জীবনের মান খুব উন্নত ছিল ; কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে

অর্থ নৈতিক

করের বোঝা ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, খনি-শিল্প প্রভৃতির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীসঙ্ঘ ও বণিক সঙ্ঘ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা অপেক্ষা অভিজাতদের অবস্থা ছিল অনেক উন্নত।

১০ | এই যুগে ভারতে ইসলামের প্রভাব [Impact of Islam on India in this period]

সমাজ জীবন
[Social Life]

রক্ষণশীলতার সংঘর্ষ ঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে দিল্লী সুলতানী প্রতিষ্ঠার সহিত এই দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইয়াছিল। এই সময়ে আরব পারস্যের উন্নত সংস্কৃতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল আফ্রিকার মরক্কো ও ইউরোপের স্পেন হইতে আরম্ভ করিয়া ইরাণ ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ পর্যন্ত। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এই নূতন সংস্কৃতির বিশেষ অবদান ছিল। তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস লইয়া আসে। এখানে আসিয়া তাহারা সম্মুখীন হয় ভারতীয়দের সুগভীর ধর্মীয় বিশ্বাস, সাহিত্য, শিল্প এবং সমুন্নত ধ্যানধারণার সহিত। এই উভয় উন্নত সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার সংমিশ্রণে শেষ পর্যন্ত এক সমৃদ্ধ নূতন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়াছিল। অবশ্য দীর্ঘদিনের সংঘাত ও বোঝাবুঝির মধ্য দিয়া এই মিশ্রণ ও সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। আত্তীকরণ ও সংঘাত শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীতে, প্রথা-উৎসবে, অনুষ্ঠানে পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

ভারতের সমাজ-জীবনে ইসলামের স্বাতন্ত্র্য

ইতিপূর্বে পারসিক গ্রীক, শক হুণদল যখন আসিয়াছিল তখন তাহারা ভারত জনসমাজে বিলীন হইয়াছিল। কিন্তু তুর্কী-শাসকগণও দীর্ঘদিন বসবাস করিয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। অনুদার তুর্কী আক্রমণকারীদের চক্ষে হিন্দুগণ ছিল 'জিম্মি' এবং 'কাফের'। অপরপক্ষে, ভারতীয়গণ তাহাদের 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন' বলিয়া ঘৃণা করিত। তুর্কী আক্রমণকারীদের অত্যাচার উৎপীড়ন এবং ধর্মবিদ্বেষের ফলে ভারতীয়দের মনে এই ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার অবক্ষয়ের যুগে এই ঘৃণা ও অনুদারতা প্রথা প্রথম উভয় সংস্কৃতির মিশ্রণের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দেখা দিয়াছিল। ইসলামী আগ্রাসী অভিযানের কবলে রাজধর্ম বলিয়া যখন ধর্মান্তরিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন হিন্দু সমাজ প্রধানতঃ ধর্ম সংস্কার অপেক্ষা রক্ষণশীলতার পথ বাছিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিলেন। ইহার ফলে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা অনেক বৃদ্ধি পায়। নানা প্রকার ধর্মীয় বাধানিষেধের শৃঙ্খলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে বাঁধিয়া ইসলামের প্রভাব হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা চলিল।

হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা
রঘুনন্দন মাধবাচার্য
বিশ্বেশ্বর কুলুক

এই প্রচেষ্টায় যাঁহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বাংলার রঘুনন্দন, বিজয়নগরের মাধবাচার্যের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাহা ব্যতীত ছিলেন

রাজা মদনপালের সভায় বিশ্বেশ্বর এবং কাশীর কুল্লুক ভট্ট। রঘুনন্দন ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক। মাধবাচার্য 'কালনির্ণয়' নামে পরাশর স্মৃতির ভাষ্য রচনা করেন ; বিশ্বেশ্বর রচনা করেন 'মদন-পারিজাত' নামে স্মৃতিশাস্ত্র এবং বাঙ্গালী শাস্ত্রকার কুল্লুক ভট্ট মনুর স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

ইসলামের প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজের পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া যে বাধানিষেধের প্রাচীর তাঁহারা গড়িয়া তুলিলেন, তাহাতে হিন্দু সমাজকে ক্রমশঃ আরও পঙ্গু করিয়া তুলিল।

রাজনৈতিক আধিপত্যের সংগ্রাম অনিবার্যভাবে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় সংঘর্ষে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তাহার পর দীর্ঘকাল বিজয়ী ও বিজিতগণের পাশাপাশি বসবাসের ফলে বিজয়ী অভিযাত্রীর গর্বোদ্ধত মনোভাব ও ধর্মীয় উন্মাদনা হ্রাস পাইলে মুসলমানগণ হিন্দুধর্ম ও সমাজকে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে আরম্ভ করেন। হিন্দুগণেরও পরাজয়ের গ্লানি কালের প্রভাবে কমিয়া আসিতে লাগিল। তখন উভয় সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

ক্রমিক সাংস্কৃতিক সমন্বয়

এই সমন্বয় প্রচেষ্টা ধর্মের ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম অনুসৃত হয়। হিন্দু-মুসলমানগণ উভয়ে উভয়ের ধর্ম সম্বন্ধে যত জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল, ততই বিদ্বেষের পরিবর্তে শ্রদ্ধা জাগিতে লাগিল।

আলবেরুণী স্বয়ং উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও ইসলামের একেশ্বরবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া হিন্দুধর্মের মূল সত্য উপলব্ধি করেন ও তাহা প্রচার করেন। ক্রমে ক্রমে ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রতিও হিন্দুদের মনে শ্রদ্ধা জাগিতে লাগিল। পরবর্তীকালে আমীর খসরুর রচনাবলীতেও এই সমন্বয়ের স্বর ধ্বনিত হইল। আরবী, ফারসী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষার সমন্বয়ে যেমন উর্দু ভাষা সৃষ্টি হইতেছিল, তেমনি খসরু হিন্দীতেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলিম পীর ফকির পরস্পরের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দুধর্মের কঠোরতার বিরুদ্ধে দেখা দিল 'ভক্তিবাদ' এবং মুসলিম সমাজে সমন্বয়ী সংস্কৃতির ভিত্তি রচিত হইল 'সুফীবাদ'-এ।

আলবেরুণী

আমীর খসরু

হিন্দু-মুসলিমদের পারস্পরিক প্রীতি স্থাপনে হিন্দু ও মুসলিম রাজন্যবৃন্দের ভূমিকাও তুচ্ছ নহে। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ, কাশ্মীরের জৈনুল আবেদীন, বিজাপুরের আদিলশাহ এবং হিন্দু রাজন্যবৃন্দের নাম ঐ ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কয়েকজন উদারচেতা মুসলমান ও হিন্দুশাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। ইঁহারা শুধুমাত্র পরধর্ম-সহিষ্ণু ছিলেন না। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম-সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির সমন্বয় সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ধর্মসংস্কারকগণের অবদান: যে সকল ধর্মসংস্কারক ও প্রচারকের আবির্ভাবে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সার্থক প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে সুফীসাধক

নিজামউদ্দীন আউলিয়া, মইনুদ্দিন চিশ্‌তি আর ভক্তিবাদের প্রচারক রামানন্দ, নামদেব ও কবীর, শিখগুরু নানক এবং কৃষ্ণসাধক শ্রীচৈতন্য, বল্লভাচার্য ও মীরাবাঈ-এর নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হয়।

ভক্তিবাদ ঃ ভক্তিবাদের মূল কথা হইল ধর্মের আচার আচরণের প্রতি আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠার পরিবর্তে ভগবানের প্রতি ভক্তি। ভক্তিবাদীদের কথা হইল আত্মার সহিত ভক্তির মাধ্যমে পরমাত্মার অতীন্দ্রিয় মিলন। বেদগ্রন্থে ভক্তির বীজ ছিল, তবে তাহার উপর জোর দেওয়া হয় নাই। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য ভগবানে ভক্তি চিন্তাধারার বিকাশ সাধিত হয়। গুপ্তযুগে রামায়ণ মহাভারত পুনর্লিখিত হইবার কালেও জ্ঞান ও কর্মের সহিত ভক্তিও মুক্তির উপায়রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভারতে প্রকৃত ভক্তি আন্দোলনের বিকাশ ঘটে খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতে।

শৈব নয়নার এবং বৈষ্ণব আলোয়ারগণ জৈন ও বৌদ্ধদের কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া ভগবানে ভক্তিই মুক্তির উপায় বলিয়া প্রচার করেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা বর্ণ-বিভেদও তাহার কঠোরতারও বিরুদ্ধতা করিলেন। ইঁহারা স্থানীয় ভাষায় নিজেদের বাণী প্রচার করিতেন বলিয়া উত্তর-ভারতে এঁরা তত পরিচিত নন। যে সকল পণ্ডিত ও সাধু-সন্তগণ দক্ষিণ-ভারতের ভক্তিবাদ উত্তর-ভারতে জনপ্রিয় করেন, তাঁহাদের মধ্যেও মহারাষ্ট্রের নামদেব ও রামানন্দ প্রধান।

রাজনীতিক্ষেত্রে দিল্লীতে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা এবং রাজপুত রাজ্যগুলির ক্ষমতা হ্রাসের ফলে উত্তর-ভারতে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছিল। তাহার ফলে নাথপন্থী কয়েকটি দল ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে তৎপর হইয়া ওঠে। ইহার সহিত সুফী মতবাদ ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার আরম্ভ করিলে দেশবাসী পুরাতন ধর্মীয় কঠোরতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে রাজী হয় নাই। তাহারা এমন এক ধর্মের জন্য লালায়িত হইল, যাহার ভিতর থাকিবে মুক্তি ও আবেগ—উভয়ের সংমিশ্রণ। ইহাদের দাবী মিটাইতেই ভক্তিবাদের প্রচার হইতে থাকে।

ভক্তিবাদের প্রচারকদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করিতে হয় রামানন্দের। চতুর্দশ শতকে প্রয়াগের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রামসীতার উপাসক ছিলেন তিনি। তাঁহার বাণীও ছিল ভগবৎভক্তি ও সর্বজীবে সম দৃষ্টি। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন। ভিন্ন জাতের রান্না করা খাদ্য গ্রহণ না করা, সকল জাতির একত্রে ভোজন না করা প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের কঠোর বিধিনিষেধ তিনি ভাঙিয়া দেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে রবিদাস ছিলেন মুচি, সেনা ছিলেন নাপিত এবং সাধন ছিলেন কসাই। কবীর ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য।

রামানন্দ

ভক্তিবাদের সমর্থকরূপে মহারাষ্ট্রে নামদেবও বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথম জীবনে

তিনি ছিলেন দর্জি এবং সন্ত হইবার পূর্বে করিতেন দস্যুবৃত্তি। ইনি মারাঠী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। জাতিতে দর্জি হইলেও নামদেব হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত ভক্তিবাদের সারকথা ছিল ভগবৎ-ভক্তি ও জীবে প্রেম।

নামদেব



কবীর

ভক্তিবাদীদের মধ্যে কবীরের নাম সমধিক বিখ্যাত। কবীরের রচিত ভক্তিগীতি আজিও ধর্মপিপাসু হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে অনুপ্রাণিত করে। কবীরের আদি পরিচয় সম্পর্কে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি মুসলমান তন্তুবায়ের সন্তান, আবার কাহারও কাহারও অভিমত, তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। অবস্থা-বৈগুণ্যে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। যাহা হউক, তন্তুবয়ন ছিল তাঁহার জীবিকা। তিনি রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অতি সরল ও সহজ ভাষায় ভক্তিবাদের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা প্রচার করেন। 'রাম' ও 'আল্লাহ্' এক এবং অভিন্ন—এই মতবাদ তিনি প্রচার করিতেন।

কবীর

সুফীবাদ ঃ ইসলাম ধর্মের বিকাশের প্রথম পর্বে ইহার উপর গ্রীক ও ভারতীয় ধ্যানধারণার কমবেশী স্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছিল। এই ধারণার পটভূমিকাতেই সুফী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পর সুফীবাদ ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

সুফীরা এক রহস্যবাদী সম্প্রদায়। সুফীদের অধিকাংশই ছিলেন গভীর ভক্তিমার্গের লোক। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের বসরার মহিলা সুফী রাবেয়া এবং দশম শতকের মনসুর-বিন্-হল্লাজ প্রেমের উপর জোর দিয়া বলিতেন—প্রেমই ঈশ্বর ও মানুষের মিলনসেতু। সুফীবাদ এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যের সাধনা। তাঁহারা সর্বভূতে ঈশ্বরের অনুভূতি বোধ করিতেন। সুফীবাদে গুরু বা পীর এবং শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

হিন্দু যোগী ও সুফী অতীন্দ্রিয়বাদীদের প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের, আত্মার, জড়বস্তুর সম্পর্ক সম্বন্ধে ধ্যানধারণার বহু মিল আছে। তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে সহনশীলতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তি গড়িয়া ওঠা সহজ হয়। সুফী সম্প্রদায় প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত—বা শরা অর্থাৎ যাঁহারা 'শরু' বা ইসলামী আইনকানুন মানিতেন এবং বে-শরু অর্থাৎ যাঁহারা ইসলামী আইন-কানুন মানিতেন না, ভারতে এই দুই দলেরই অস্তিত্ব ছিল।

ভারতে বাশরু স্থফী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার নাম খাজা মইনুদ্দীন চিশ্‌তি। পৃথ্বিরাজ চৌহানের পরাজয়ের ও মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই তিনি ভারতে আসেন। লাহোর ও দিল্লীতে অবস্থানের পরে তিনি আজমীরে চলিয়া আসেন, আজমীর তখন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং ততদিনে তাহার জনসংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পায়। তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ নাই, তবে উল্লেখযোগ্য অনেক শিষ্য তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিয়াছেন। চিশ্‌তি সন্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ছিলেন সন্ত নিজামুদ্দীন আউলিয়া এবং নাসিরুদ্দীন চিরাগ-ই-দিল্লী। প্রথম প্রথম এই স্থফী সন্তগণ নিম্নশ্রেণীর লোক ও হিন্দুদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন। তাহারা কঠোর আত্মসংযমপূর্ণ সহজ সরল জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী এবং কোনও রাজকার্যে যোগদানেরও বিরোধী ছিলেন। জনগণের সহিত তাঁহারা চলিত হিন্দী ভাষাতে কথা বলিতেন। স্থফী সন্তগণ ভগবানের সান্নিধ্যসূচক ভাব স্থষ্টির জন্য 'সমা' সঙ্গীত গাহিতেন। ঐ সঙ্গীত তাঁহাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। নিজামউদ্দীন আউলিয়া যোগসাধনা করিতেন বলিয়া কথিত আছে। এইজন্য যোগীরা তাঁহাকে 'সিদ্ধ' বলিতেন। আলাউদ্দীন খলজী তাঁহার সমাধির উপর জামাৎখানা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

খাজা মইনুদ্দীন চিশ্‌তি

নিজামুদ্দীন আউলিয়া নাসিরউদ্দীন চিরাগ-ই-দিল্লী

একদিকে নানক চৈতন্যের ন্যায় হিন্দুভক্তিবাদী সাধকবৃন্দ, অন্যদিকে স্থফীসন্তদের মতো মুসলমান ফকির এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুগামীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল।

ধর্মীয় প্রসঙ্গ ঃ ভক্তিবাদের প্রবক্তাগণ সর্বধর্ম সমন্বয়ের তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন বেশী। সমন্বয়ী প্রেমের ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের সেইসব আচার আচরণ যাহা এই সমন্বয় বিরোধী, তাহা বর্জন করিতে গিয়া তাঁহারা কেহ কেহ নূতন নূতন ধর্ম সম্প্রদায় স্থষ্টি করেন। এই নূতন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নানক প্রবর্তিত শিখধর্ম, শ্রীচৈতন্য, বল্লভাচার্য প্রমুখ প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম উল্লেখযোগ্য।

কোন নতুন ধর্ম স্থাপনের ইচ্ছা নানকের ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ দূর করিয়া শান্তি ও শুভেচ্ছা এবং সম্প্রীতি স্থাপন দ্বারা ভাব-বিনিময়ের পথ প্রশস্ত করাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। কালক্রমে নানকের ধ্যানধারণা হইতে জন্ম লইয়াছিল নূতন শিখ ধর্ম সম্প্রদায়। হিন্দু মুসলিম ভাব বিনিময়ের এমন এক স্থন্দর ও স্থস্থ আবহাওয়া নানক ও কবীর স্থষ্টি করেন, যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী অম্লান রহিয়াছে।

মধ্যযুগের ধর্মসংস্কারক ও প্রচারকদের মধ্যে নানকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শিখ' নামক নূতন ধর্মের প্রচার করিয়া তিনি ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত এই নূতন ধর্মে জাতিতে জাতিতে কোন প্রভেদ করা হইত না। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাহোর জিলায় তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নানক প্রথম জীবনে ব্যবসা এবং রাজকার্যে অতিবাহিত করেন। কিন্তু শৈশবাবস্থা হইতেই তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ধর্মের মূল সত্য উপলব্ধির

নানক

জন্য তিনি ভারতবর্ষের নানা তীর্থ এবং মক্কা ও বাগদাদে পরিভ্রমণ করেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া তিনি 'শিখ' ধর্মের প্রচার করেন। 'শিখ' শব্দের অর্থ হইল শিষ্য। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল সৎভাবে জীবনযাপন এবং ঈশ্বরে অনুরাগ। তিনি একেশ্বর-বাদে বিশ্বাসী ছিলেন শিখধর্ম প্রথমে হিন্দু ধর্মেরই অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। পরে শিখগণ হিন্দুধর্ম ও সমাজ হইতে পৃথক হইয়া যায়।



নানক

বৈষ্ণবধর্মের ও মানবপ্রেমের প্রচারকরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। তিনি নানকের সমসাময়িক ছিলেন। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল নিমাই। বাল্যাবস্থা হইতে চৈতন্য অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। পাণ্ডিত্যে তাঁহার অন্তরের তৃষ্ণা মিটিল না। ভগবৎপ্রেমে তিনি ব্যাকুল হইলেন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং

শ্রীচৈতন্য



শ্রীচৈতন্য

বাংলা, ওড়িশা, বৃন্দাবন ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করিয়া তাঁহার উদার ধর্মমত প্রচার করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ভগবানে ভক্তি ও ভালবাসা ছিল তাঁহার মূল বাণী। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিত। যবন হরিদাস ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য। উড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংকীর্তনের মাধ্যমে ভগবানে আত্মসমর্পণ ও ভগবৎ সাধনার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বল্লভাচার্য

অপর এক কৃষ্ণসাধক ছিলেন তেলেগু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বল্লভাচার্য। তিনি মুখ্যত দক্ষিণ ভারতেই তাঁহার প্রচারকার্য সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

মীরাবাঈ

কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ ভক্তিবাদ প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মেবারের রাজপরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া তিনি ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা তীর্থ পর্যটন করেন। ব্রজভাষায় ভজন গাহিয়া তিনি রাধাকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভজন আজিও ঘরে ঘরে সমাদৃত।

ভক্তিবাদ ও সুফীবাদের প্রচারকগণের উদার মতবাদ হিন্দু-মুসলমান সমাজ ও ধর্মের মধ্যে বিভেদ দূর করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্য সাধনের পথ সুগম করিয়াছিল। এই স্থলে লক্ষণীয় যে, ধর্মপ্রচারকগণ আঞ্চলিক ভাষায় ধর্মমত প্রচার করায় এই ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

সত্যপীর

বৈষ্ণব ধর্মের মতোই সমন্বয়ী আর একটি ধর্মাচরণ সে যুগে উত্তর ভারতের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইত। হিন্দুদের সত্যনারায়ণ এবং মুসলমানদের পীরের নামে ইহা সত্যপীরের পূজা নামে পালিত হইত।

তাঁহাদের বাণী: ভক্তিবাদী ও সুফী সন্ত নেতাদের জীবনই ছিল তাহাদের বাণী। কঠোর আত্মসংযমপূর্ণ অতি সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের চর্চাই ছিল তাঁহাদের ধর্ম। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংকীর্ণতা ছাপাইয়া মহত্তর মানবিকতাবাদী আদর্শ তাঁহারা জীবনের লক্ষ্যরূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রেমই ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। সর্বজীবে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই ভালবাসার মধ্য দিয়া ঈশ্বর-সান্নিধ্যলাভের পথ প্রদর্শন করেন তাঁহারা। ঈশ্বর, আল্লাহ সবই এক। সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথই তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ। তাঁহাদের বাণীর আর একটি সত্য দিক হইল জনগণের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। তাহাদের ভাষার উন্নতি বিধান এবং সর্বতোভাবে জনজীবনের উন্নয়ন।

সুলতানী আমলের শিল্প ও সাহিত্য: ধর্মসংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া যে সমন্বয় প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছিল, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহা প্রসারিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান শিল্পরীতির সংমিশ্রণে যে নূতন শিল্পনীতির উদ্ভব হইল, তাহা ইন্দো-স্যারসেনীয়

শিল্পরীতি নামে পরিচিত হইলেও ইহাকে ইন্দো-ইসলামী বলাই বোধ হয় বেশী সমীচীন। মুসলমান শাসকগণ সুলতানী যুগের প্রথম দিকে শিল্পে ইসলামের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু শিল্পকার্যে এদেশীয় স্থপতিগণকে নিয়োগ করা অপরিহার্য ছিল। কাজেই মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে ভারতীয় প্রভাব অতি সহজেই প্রবেশ করিয়াছিল। আবার মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হিন্দু উপকরণ মসজিদ নির্মাণের কার্যে ব্যবহৃত হইত। আবার অনেক সময় মন্দিরের সংস্কার করিয়া মসজিদ নির্মিত হইত এইভাবে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পে অতি সহজেই ভারতীয় প্রভাব পড়িয়াছিল।

দিল্লীতে নূতন শাসকদের প্রাথমিক প্রয়োজন হইল অনুচরদের নিমিত্ত উপযুক্ত বাসগৃহ এবং উপাসনালয় নির্মাণ। উপাসনালয়ের অভাব মিটাইবার জন্য তাহারা মন্দির ও অট্টালিকাসমূহকে মসজিদে পরিণত করে। যেমন দিল্লীর নিকট কুওয়াৎ-উল-ইসলাম-এর মসজিদ পূর্বে ছিল জৈন মন্দির, পরে উহা রূপান্তরিত হইয়াছিল বিষ্ণুমন্দিরে। দিল্লীর মসজিদে পূর্বের দেবগৃহ ভাঙ্গিয়া তাহার সম্মুখে বাহিরের দিকে তিনটি প্রশস্ত কারুকার্যমণ্ডিত খিলান নির্মিত হয়। খিলানগুলির রূপশয্যা ছিল আকর্ষণীয়। ইহাতে মূর্তির পরিবর্তে ফুলের সর্পিল অলংকরণ ও কোরাণের পদ অনুলিখিত ছিল।

তুর্কীদের আগমনে ভারতে খিলান ও উচ্চমানের আস্তরণের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

দিল্লী

রাজধানী দিল্লীই ছিল সুলতানী আমলে স্থাপত্যশিল্পের প্রাণকেন্দ্র। দিল্লী ও তাহার আশেপাশে বহু শিল্প নিদর্শন সুলতানী আমলের শিল্পোৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই সকল নিদর্শনের মধ্যে 'কুতব মিনার', 'আলাই দরয়াজা', 'নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধি মন্দির', ফিরুজ শাহের সমাধি সৌধ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুকুমার শিল্প

তুঘলক যুগেও নির্মাণকার্য কম হয় নাই। মহম্মদ বিন তুঘলক নির্মিত তুঘলকাবাদের প্রাসাদের চারিপাশে প্রকাণ্ড এক কৃত্রিম হ্রদ নির্মিত হইয়াছিল। গিয়াসুদ্দীনের সমাধি এক নূতন স্থাপত্যরীতির নিদর্শন। পারস্পরিক সমন্বয়ের প্রভাব সুকুমার শিল্পের উপরও প্রতিফলিত হইয়াছিল। তুর্কীদের সহিত এদেশে আসিয়াছিল আরবের সমৃদ্ধ সঙ্গীতের ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য ইরান ও মধ্য এশিয়ায় আরও যেভাবে বিকশিত হইয়াছিল তাহাই আসিয়াছিল ভারতে। সঙ্গীতের নূতন ঢং ও রীতি-নীতির সহিত তাহারা রববে ও সরবাদী সারঙ্গী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এদেশে লইয়া আসেন। আমীর খসরু, ইমন ঘোর শনম্ প্রভৃতি পারসিক আরবী রাগ এদেশে প্রবর্তন করেন। অনেকের ধারণা, তিনি তবলা ও সেতার আবিষ্কার করেন। ভিরুজ শাহের আমলে ভারতের 'রাগ দর্পণ' ফারসীতে অনুদিত হয়।

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঃ সুলতানী যুগে বহু আঞ্চলিক ভাষারও প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। হিন্দী, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষা মূল সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত অপভ্রংশের পথ বাহিয়া অষ্টম শতক বা তাহার কাছাকছি কোন সময়

উদ্ভূত হইয়াছিল। তামিল প্রভৃতি ভাষা অবশ্য বহু প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় চৌদ্দ শতকে আমীর খসরু বলেন, এই সকল ভাষা প্রাচীনকাল হইতে সর্বপ্রকার জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যবহৃত হইত। আঞ্চলিক ভাষার অনেকগুলির পূর্ণাঙ্গ পরিণতি এবং সাহিত্য গ্রন্থে তাহার রূপায়ণ মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

স্থানীয় সকল প্রাদেশিক ভাষার প্রচারে সুলতানী শাসকগোষ্ঠীর যথেষ্ট আনুকুল্য ছিল। বাহমনী রাজ্যের বিজাপুর সুলতানীতে সরকারী কাজে মারাঠী ভাষা ব্যবহৃত হইত। অনেক রাজ্যের শাসকগণ স্থানীয় লেখকবৃন্দকে উৎসাহ দিয়া আঞ্চলিক সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটাইয়াছেন। এই বিষয়ে বাংলার সুলতানদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুলতানী পৃষ্ঠপোষকতা ঃ বিতর্কিত হইলেও অনেকের ধারণা রুকনুদ্দীন বরবাক শাহের উদ্যোগে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। তেমনি মালাধর বসুও সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামে। ষোড়শ শতাব্দীই বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ—যখন মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়।

বাংলা

হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন। ছুটি খাঁর অনুরোধে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্বের বঙ্গানুবাদ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকে কেন্দ্র করিয়া বাংলায় এই সময় সর্বপ্রথম জীবনীকাব্য রচিত হইতে থাকে। আরাকান রাজসভার আনুকুল্যে আলাওল ও দৌলত কাজী অপূর্ব মানবিক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

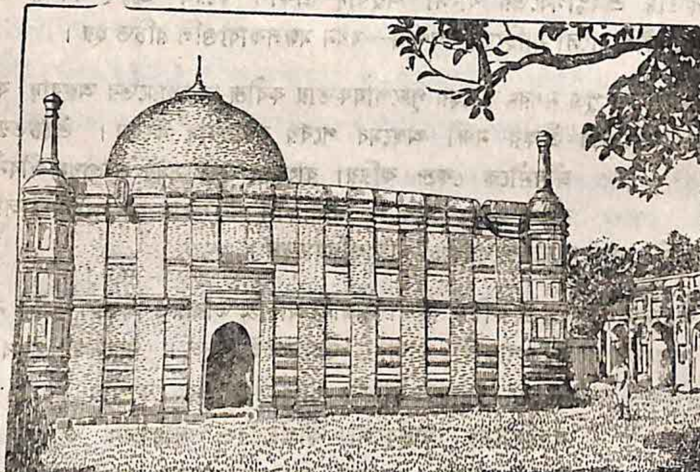
অন্যান্য

ধর্ম আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দী পাঞ্জাবী মারাঠী ভাষারও বিকাশ ঘটে। নানকও তাঁহার শিষ্যদের চেষ্টায় পাঞ্জাবী ভাষারও উন্নতি হইয়াছিল। জ্ঞানেশ্বর প্রমুখ মারাঠী সন্তদের রচনায় মারাঠী সাহিত্যের এবং কাশ্মীর রাজ জৈনুল আবেদীনের আনুকুল্যে কাশ্মীরেরও আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি ঘটিয়াছিল। ইঁহাদের রচনায় হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক ভাবধারার সহিত পরিচিত হইল। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথও সুগম হইল। সুলতানী আমলে হিন্দী সাহিত্যেরও অনেক উন্নতি হইয়াছিল। চাঁদ বরদৈ ও রামানন্দ, কবীর, গোরক্ষনাথ জয়সী প্রমুখের রচনায় হিন্দী সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।

উর্দু ভাষার বিকাশ ঃ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলশ্রুতিরূপে ভারতে নূতন এক সমন্বয়ী ভাষার উদ্ভব হয়। পারসিক, আরবী এবং তুর্কী শব্দ ও ভাবধারা বাহিত ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হইয়াছিল উর্দু ভাষা। ইহা শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের জন্যই প্রয়োজন ছিল তাহা নহে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা চালাইবার নিমিত্তও এমন একটি ভাষার প্রয়োজন ছিল। বহু মুসলিম লেখক হিন্দী শিখিয়া হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, আবার হিন্দু লেখকগণও ফারসী শিখিয়া সেই ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। ডাঃ ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে, 'উর্দু' শব্দটির উৎস হইতেছে সৈন্যদের শিবির-এর তুর্কী প্রতিশব্দ 'উর্দু'।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দী ভাষারই ফারসী রূপান্তর যেন উর্দু ভাষা। দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বেই ভাষাটি প্রধানতঃ প্রচলিত এবং ইহার ব্যাকরণ মূলত হিন্দী ঘেঁষা, তাহার শব্দগুলি অধিকাংশ ফারসী। মুসলিম বিজয়ের পর পারস্যের ভাষায় বহু আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। সেইজন্য উর্দুতেও আরবী শব্দের প্রাধান্য। ঠিক কবে হইতে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে ডাঃ স্মিথের মতে, সুলতানী যুগেই উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে বোধগম্য ভাষারূপে উর্দুর প্রচলন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কালক্রমে ভারতীয় মুসলমানদের ভাষা হইয়া দাঁড়ায় উর্দু এবং উর্দুতেও নানা কাব্য এবং সাহিত্য রচিত হইতে থাকে। আমীর খসরুকেও অনেকেই উর্দু ভাষার লেখক বলিয়া মনে করেন।

প্রাদেশিক শিল্পরীতির নিদর্শন ঃ বাংলা জৌনপুর গুজরাট প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প-নিদর্শনে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। বাংলার শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে গৌড়ের



কদম রসুল

বড় ও ছোট সোনা মসজিদ। দাখিল দরওয়াজা, কদম রসুল এবং পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ সমধিক প্রসিদ্ধ।

বাংলার স্থাপত্যশিল্পের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ইঁটের ব্যবহারে। জৌনপুর ছিল সে যুগের আর একটি শিল্পকেন্দ্র। এখানকার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে 'অতালদেবী মসজিদ', 'লাল দরওয়াজা' মসজিদ সর্বপ্রধান। জৌনপুরের স্থাপত্যশিল্পে হিন্দু প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইহার কারণ, জৌনপুরের স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণে বিষয়বস্তু, হিন্দু-মন্দিরের মালমসলা এবং হিন্দুশিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিল। গুজরাটে আমেদাবাদের 'জামই-ই-মসজিদ' এবং মালবের রাজধানী মাণ্ডুর 'হিন্দোল মহল' সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করিয়া থাকে। বাহ্‌মনী রাজ্যের সুলতানগণও বহু প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

সুলতানী আমলে হিন্দু রাজগণও শিল্পানুরাগে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। মেবারের রাণা কুম্ভ নির্মিত চিতোরের বিজয়স্তম্ভ স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিজয়-নগরের শাসকগণও বহু মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এইগুলির মধ্যে 'বিথলস্বামী মন্দির' সর্বাপেক্ষা সমাদৃত।

সুলতানী যুগে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ তৎকালীন ঐতিহাসিক সাহিত্য হইতে সুলতানী আমলের সমাজ ও অর্থনীতির পরিচয় লাভ করা যায়।

পদমর্যাদা এবং বৃত্তি অনুসারে সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, কৃষক, শ্রমজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল। সমাজে ধনৈশ্বর্যের অধিকাংশ ভোগ করিতেন সুলতান ও অভিজাত সম্প্রদায়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ অভিজাতদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা বা ধনদৌলতের অধিকারী ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায় মদ্যপান ও নানারকম বিলাসিতায় অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিকগণ এই সকল দোষ হইতে মুক্ত ছিল ; নারীজাতি পুরুষদের উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহারা সাধারণত গৃহকার্যেই নিযুক্ত থাকিতেন, বহির্জগতের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পর্দা-প্রথার প্রচলন ছিল। অবশ্য অভিজাতশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ কলাবিজ্ঞান শিক্ষা করিতেন। হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাস প্রথা মুসলমান সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। আলাউদ্দীন খল্‌জী, ফিরুজ শাহ্ তুঘ্‌লক প্রভৃতি সুলতানের অসংখ্য ক্রীতদাস ছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয়ে পরস্পরের উৎসবে অংশগ্রহণ করিত।

সামাজিক অবস্থা

কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল প্রধান উপজীবিকা। সরকারী চাকরি ও বিভিন্ন শ্রমশিল্পে বহু লোক নিযুক্ত ছিল। কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে প্রচুর অর্থাগম হইত। কিন্তু উৎপাদনকারী কৃষক ও শ্রমিকগণ এই সম্পদের অতি সামান্য অংশই ভোগ করিতে পারিত। করভারও অনেক ক্ষেত্রেই অত্যধিক ছিল। দরিদ্রকে শোষণ করিয়া সুলতান ও তাঁহার আমীর ওমরাহ্‌দের বিলাসব্যসনে অজস্র অর্থ ব্যয় হইত। আমীর খসরু লিখিয়াছেন, 'রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা শোষিত দরিদ্র শ্রেণীর রক্তবিন্দুর এক একটি দানা।'

অর্থ নৈতিক অবস্থা

শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নে বাংলা ও গুজরাটের তাঁতীদের সারা পৃথিবী জুড়িয়া সুনাম ছিল। ইহা ছাড়া, কাগজ, চিনি, মদ্য, চর্ম প্রভৃতি শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছিল। বস্ত্র নীল গন্ধ ও কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হইত। অশ্ব অশ্বেতর ক্রীতদাস ও নানাপ্রকার বিলাস-সামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। মোটের উপর দেশের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু সমাজ দারিদ্র্যমুক্ত ছিল না।

১ মুঘল যুগ (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীঃ)
[The Mughal Age (1526-1707)]

ইতিহাসের উপাদানের বিভিন্নতা ঃ ভারতে মুঘল যুগের ইতিহাস রচনা প্রাচীন যুগ অপেক্ষা সহজ। এই যুগের শাসকগণের অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহারা আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া সমসাময়িক দরবারী ঐতিহাসিকদের ও নানা রচনা হইতে মুঘল যুগের জীবনযাত্রা ও শাসন পদ্ধতির পরিচয় লাভ করা যায়। ইঁহাদের রচনার তথ্যাদি যথাবিধি সংকলিত করিয়া গেলেই মুঘল যুগের ইতিহাস রচিত হইতে পারিবে। প্রাচীন যুগের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত টুকরা-টুকরা ঘটনাপঞ্জী গাঁথিয়া একত্রিত করিবার প্রয়োজন হইবে না।

এই যুগের ইতিহাস রচনায় নির্ভর করিতে হয় সরকারী দলিলপত্র, ফারসী ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ, জীবনী, আত্মজীবনীমূলক রচনা, মুদ্রা, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ ইত্যাদির উপর।

সরকারী দলিলপত্র ঃ বাদশাহদের নির্দেশনামা, দলিল, চিঠি-পত্রাদি যত্ন সহকারে রক্ষিত হইবার জন্য মহাফেজখানা থাকিত। এখনও যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতে ঐ যুগের মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগৃহীত হয়।

ফারসী ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় গ্রন্থাদি ঃ মুঘল যুগের ইতিহাস রচনায় বাবর, জাহাঙ্গীর-এর আত্মজীবনী, বাবরের কন্যা গুলবদন রচিত হুমায়ুন নামা প্রভৃতি গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। আকবরের আমলের ইতিহাসের অপরিহার্য গ্রন্থ আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' এবং 'আকবরনামা'। ইহা ভিন্ন বদাউনী, নিজামুদ্দীন, আবুল হামিদ লাহোরী, কাঁফি খাঁ-র গ্রন্থাবলীতেও বিভিন্ন মুঘল বাদশাহের যুগের ইতিহাস ও শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা তথ্য অবগত হওয়া যায়।

ইহা ব্যতীত বাংলা, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্য হইতেও সমসাময়িক ইতিহাসের কিছু উপাদান পাওয়া যায়। বিশেষতঃ জনজীবনের চিত্র ঐ সকল সাহিত্যেই প্রকট।

মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন ঃ মুদ্রা ও শিল্পকলার নিদর্শনের মধ্যে বিশেষ করিয়া চিত্রকলা, স্থাপত্যশিল্প ও সংস্কৃতির এবং অর্থ নৈতিক ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় ইহাদের তেমন গুরুত্ব না থাকিলেও সংগৃহীত তথ্যাদির সত্যাসত্য নির্ধারণে ইহাদের সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়।

বৈদেশিকদের বিবরণ ঃ মুঘল যুগের ইতিহাসের নানা উপকরণ সমসাময়িক জেসুইট ধর্মযাজকদের বিবরণ হইতে মেলে। ইউরোপীয় পর্যটক র‍্যালফ্ ফিচ্, স্যার টমাস রো, তাভার্নিয়ে, বার্নিয়ে, মান্থুচি—প্রভৃতি লেখকগণ মুঘল যুগ সম্বন্ধে নানা তথ্য ও কাহিনী এবং জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকলই সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনার উপযোগী।

মুঘলদের উৎপত্তি
[Origins of the Mughals]

মোঙ্গল শব্দ হইতে মোগল বা মুঘল শব্দটির সৃষ্টি। মোঙ্গল জাতির আদি বাসস্থান ছিল মঙ্গোলিয়ায়। মোঙ্গল জাতি বহু উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এক দলের নেতা ছিলেন চেঙ্গিস খাঁ, অপর এক দলের নেতা তৈমুর লঙ্।

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে—তথাকথিত মুঘলগণ ছিল প্রকৃতপক্ষে চুঘ্‌তাই নামে তুর্কীদের একটি শাখা বিশেষ। চুঘ্‌তাই খাঁ ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি মধ্য এশিয়া ও তুর্কীদের আবাসস্থল তুর্কীস্থান-এর উপর আধিপত্য করিতেন। ইহার পরে মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। তখন চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈমুর লঙ্ চেঙ্গিস্ খাঁর সাম্রাজ্য আবার ঐক্যবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে ইউরোপের ভল্গা নদীর পার হইতে পূর্বে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার মধ্যে ছিল আধুনিক তুরস্ক, ইরাণ, ট্রানস্-অক্সানিয়া, আফগানিস্থান ও পশ্চিম পাঞ্জাবের একাংশ। তাঁহার সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অটুট ছিল এবং রাজধানী সমরখন্দ এবং হিরাত পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হইত। ইহার পর উজবেক নামে মোঙ্গলদের অপর এক শাখা ঐ অঞ্চল হইতে চুঘতাই মোঙ্গলদের উৎখাত করিতে থাকে। মধ্য এশিয়ায় তখন উজবেক ইরাণ ও অটোমান তুর্কীদের প্রাধান্যের প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে ভারতে মুঘল বংশ প্রতিষ্ঠাতা বাবরের জন্ম হইয়াছিল।

বাবর শব্দের অর্থ 'সিংহ' কিংবা 'ব্যাঘ্র'। বাবরের পিতার নাম ওমর শেখ মির্জা, তিনি ছিলেন তৈমুর লঙ-এর বংশধর এবং মাতা দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ-র বংশের কন্যা। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া হইতে যে সকল যাযাবর জাতি ভারতে আসিয়াছে, তাহাদেরই মোগল বা মুঘল বলা হইত। এইজন্যেই চুঘতাই বংশের বাবর যখন ভারতে একটি নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই রাজবংশের নাম হইল মোগল বা মুঘল বংশ।

বাবর কর্তৃক পাদশাহী প্রতিষ্ঠা
[Foundation of the Padashahi by Babar]

সমগ্র এশিয়ার ইতিহাসে বাবর এক অনন্য সাধারণ, রোমান্টিক ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তিত্ব। মাত্র এগারো বৎসর বয়সে (মতান্তরে চৌদ্দ—সতীশচন্দ্র) তিনি ক্ষুদ্র ফেরগানা রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি বারংবার সিংহাসনচ্যুত ও নিরাশ্রয় হইয়া নানা স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে বাবর কাবুল অধিকার করিয়া (১৫০৪ খ্রীঃ) ইরাণের শাহের সহায়তায় সমরখন্দ দখল করেন। কিন্তু পরে উজবেকদের আক্রমণে আবার রাজ্যচ্যুত হইয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন।

আত্মজীবনীতে বাবর লিখিয়াছেন, 'কাবুল অধিকার করিবার পর হইতে আমি হিন্দুস্থান জয়ের চিন্তা হইতে কখনো বিরত হই নাই।' অন্যান্য অসংখ্য অভিযাত্রীর

ন্যায় বাবরও ভারতের ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কাবুল জয়ের পর হইতে বাবরের মনে হয়, তৈমুরের ভারত সাম্রাজ্যের উপর তাঁহার ন্যায্য অধিকার আছে। ইহা ব্যতীত ভারত-জয়ের অন্য কারণও ছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেন যে, কান্দাহার, কাবুল হইতে বাবরের সৈন্যবাহিনীর ব্যয় মিটাইবার মতো অর্থ সংগৃহীত হইত না। সেইজন্যও বটে এবং উজবেক আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেও ভারতকে উপযুক্ত ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করিবার জন্য বাবর ভারত আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন।

ভারত জয়ের কারণ

সিকান্দর লোদীর মৃত্যুর পর পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদীর আমন্ত্রণে বাবর ভারত অভিযানে বাহির হন এবং পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ) দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। অতঃপর উত্তর ভারতে তাঁহার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী মেবারের মহারাণা সংগ্রামসিংহকে খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ) পরাজিত করিয়া বাবর চান্দেরী দুর্গ কাড়িয়া লন। বাংলা ও বিহারের আফগান সুলতানগণ তাঁহার বিরোধিতা করায় তিনি গোগ্‌রার যুদ্ধে (১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ) তাহাদের পরাস্ত করেন। উত্তর ভারতে কার্যত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর সাম্রাজ্য সুসংগঠিত করার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ)।

আক্রমণের পটভূমি

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)

খানুয়া (১৫২৭ খ্রীঃ) এবং গোগ্‌রার যুদ্ধ (১৫২৯ খ্রীঃ)

বাবরের ভারতে আগমনের তাৎপর্য ঃ বাবরের ভারতে আগমন নানা দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। কুষান সাম্রাজ্যের দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম আবার কাবুল ও কান্দাহার উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের একটি ঘনিষ্ঠ অংশে পরিণত হয়। এই অঞ্চল দিয়াই ইতিপূর্বে যত অভিযাত্রীদলের ভারত আক্রমণ ঘটায় সমগ্র অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ভাবী ২০০ বৎসরের জন্য বাবর ভারতকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চীন ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের স্থলপথের যত বাণিজ্য সব ঐ অঞ্চলের মধ্য দিয়া হওয়ায় কাবুল ও কান্দাহারের আধিপত্য ভারতের বহির্বাণিজ্য বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এইভাবে এশিয়া পারের দেশের সহিত ভারত ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

বাবর উত্তর ভারতে রাজপুত ও লোদীদের ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া ঐ অঞ্চলের শক্তি সাম্য নষ্ট করিয়া দেন। তাহার ফলে পরবর্তী কালে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনের সুবিধা হইয়াছিল। বাবর এক নূতন যুদ্ধকৌশল প্রবর্তন করিয়া স্থায়ী দুর্গের গুরুত্ব হ্রাস করিয়াছেন। তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। নূতন সামরিক কৌশল প্রবর্তন করিয়া এবং আপন ব্যক্তিত্বে বাবর সম্রাটের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বাবরের আগমনের সহিত ভারতে এক সাহিত্য ও শিল্প-রসিক ও জ্ঞানদীপ্ত রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে। ইহার সহিত তিনি হন ধর্মীয় সংকীর্ণতা মুক্ত শিল্প-সাহিত্যানুরাগী রাজবংশের পথিকৃৎ।

বাবরের স্মৃতিকথা
[Babar's Memories]

পারসিক ও আরবী ভাষায় বাবরের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। মাতৃভাষা তুর্কীতেও তিনি দুইজন খ্যাতনামা লেখকের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত। গদ্য লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। 'তুজুক-ই-বাবুরী' বলিয়া তাঁহার স্মৃতিকথা বিশ্বসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।

আত্মজীবনীতেই বাবরের চরিত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। আকবরের নির্দেশে খান খানান তুর্কী হইতে সেই স্মৃতিচারণ ফারসীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এর্স্কিন, লিডেল ও শ্রীমতী বিভারিজের অনবদ্য ইংরাজী অনুবাদ পাঠক সমাজে সমাদৃত। স্মৃতিচারণ হইতে দেখা যায়, বাবর ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র। প্রচণ্ড জীবনীশক্তি সম্মত এক অপূর্ব শিল্প-রসিক ব্যক্তিত্ব। যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে হিন্দুকুশের মতো প্রাকৃতিক পরিবেশেও তিনি অপূর্ব তুর্কী কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণোচ্ছলতা ছিল অনুগামীদের প্রেরণার উৎস, সেই অনুগামীদের তিনি ছিলেন সকল সুখ-দুঃখ-কঠোরতার ভাগীদার। সহচরদের সহিত যেমন সুরাপানে ছিল তাঁহার অকুণ্ঠ সহযোগিতা, তেমনি সুন্দর সুন্দর উদ্যানরচনায় ও তাহাদের সৌন্দর্য উপভোগে ছিল বাবরের আনন্দ। তবে, ভারতে ঐশ্বর্য ব্যতীত খুব কম জিনিসেই ছিল বাবরের আগ্রহ। বিশেষ করিয়া মধ্য-এশিয়ার তরমুজ ও ফুটির শোক তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "তাহারা সম্প্রতি আমাকে একটি তরমুজ আনিয়া দিল। সেটি কাটিতে কাটিতে আমাকে একান্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল, আর মনে জাগিল আমার মাতৃভূমি হইতে নির্বাসনের অনুভূতি, খাইতে খাইতে আমি অশ্রুরোধ করিতে পারি নাই।'


বাবর

নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে তিনি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ লাভ করেন

নাই। মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। রাজত্বের এই চারি বৎসর কাটিয়াছে শুধু যুদ্ধ বিগ্রহে। অল্প বয়সে পিতৃহীন এই বালক আত্মীয়-স্বজনের চক্রান্তে পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াও যে অক্সাস নদী হইতে পূর্বে বিহার পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি তৈমুর লঙ্ ও আকবরের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন। একদিকে তৈমুর লঙের লুণ্ঠন-সর্বস্ব অভিশপ্ত ভারত ও আকবরের উদারনৈতিক দৃঢ়-ভিত্তিক ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাঝখানে বাবরের আবির্ভাব সেতুবন্ধনের কাজ করিয়াছে।

কৃতিত্ব

মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা
[Mughal-Afgan Contest]

প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকৃতি: বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রীঃ)। পিতার বীরত্ব ও সুরুচিবোধের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাবর প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিতে ব্যর্থ হন। সিংহাসন লাভের পর পরেই ভাইদের সহিত কাবুল কান্দাহার লইয়া মনোমালিন্যে ঐ অঞ্চলের উপর তিনি আধিপত্য হারান। ইহারসহিত যুক্ত হয় গুজরাটের নবাব বাহাদুর শাহের এবং পূর্বাঞ্চলের পাঠানদের বিদ্রোহ। পরবর্তীকালে হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে দমন করিলেও পূর্বাঞ্চলের পাঠান বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন।

সমস্যাবলী

শেরশাহের অভ্যুত্থান
[Rise of Shershah]

ভারতের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত পাঠান শক্তিসমূহ উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রতীক্ষায় ছিল মাত্র। শেরশাহ স্বয়ং সেই নেতৃত্ব দান করিলে সকলে তাহার পতাকাতলে সমবেত হইয়া এক তীব্র মুঘল-পাঠান প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করে। শের খাঁর সামরিক প্রতিভা ও যুদ্ধকৌশল বিষয়ে হুমায়ুনের সম্যক্ জ্ঞান ছিল না। তিনি যে আফগান সৈন্যদলের সম্মুখীন হইতেছিলেন পূর্বের আফগান সেনানী হইতে ইহাদের সামরিক শিক্ষা ও কৌশলের নৈপুণ্য ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। মুঘলের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া ইহারা মুঘল যুদ্ধ কৌশল সম্বন্ধে অবহিত হইয়া তাহা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতে শিখিয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার সহিত পরপর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের পরে হুমায়ুনকে ভারত ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

শেরশাহের অভ্যুত্থান

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া হুমায়ুনকে পারস্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। শের খাঁ 'শেরশাহ' নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শীঘ্রই রাজ্যবিস্তারে মন দেন। তিনি সহজেই সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করিলেন। হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরান বিনা যুদ্ধে পাঞ্জাব শেরশাহের হস্তে অর্পণ করেন। এই সময় বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে শেরশাহ বাংলার শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করিয়া তথাকার শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিলেন।

শেরশাহের রাজ্যবিস্তার

অতঃপর গোয়ালিয়র মালব রণথম্ভোর রায়সিন মারবার প্রভৃতি একে একে শেরশাহের হস্তগত হইল। শাসক হিসাবে শেরশাহ উত্তর ভারতে মহম্মদ বিন তুঘলকের পরে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্বে বাংলা হইতে পশ্চিমে সিন্ধু এবং আজমীর হইতে আবু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করা তাহার ভাগ্যে ছিল না। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন, তখন এক বিস্ফোরণের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়।


শেরশাহ

সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে শের-শাহের ন্যায় অদ্ভুত করিতকর্মা ও উদারনৈতিক সম্রাট বিরল।

কেবলমাত্র সমরবিজেতা হিসাবেই নহে, শাসক হিসাবেও শেরশাহ ছিলেন অনন্য-সাধারণ। মাত্র পাঁচ বৎসর কাল তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই স্বল্পকালের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে সমরাঙ্গনে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও সাম্রাজ্য শাসনের যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উহা তাঁহার অপূর্ব মনীষার পরিচায়ক। প্রজা-সাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ছিল তাঁহার শাসন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

শাসন-ব্যবস্থা : শাসক হিসাবে তিনি যে ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকলেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ঐ মধ্যযুগেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমদৃষ্টি এবং শাসিতের হিতসাধনই সুশাসকের প্রধান কর্তব্য। সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রয়োজন তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই। শাসন ব্যবস্থাকে তিনি জাতীয় মর্যাদা দানের জন্য ধর্ম বিচার না করিয়া যোগ্যতা অনুসারে দক্ষ ব্যক্তিকে রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রধান সেনাপতি।

শেরশাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শূর সাম্রাজ্য কতকাংশে পূর্বের দিল্লী সুলতানীরই সম্প্রসারিত রূপ বলা চলে। শাসন ব্যবস্থায় শেরশাহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন। তাঁহার রাজত্বকালের ঐতিহাসিক আব্বাস খাঁ সরওয়ানী বলেন যে, তিনি জমিদারের প্রতি এত কঠোর ব্যবহার করিতেন যে, তাঁহাদের পক্ষে নিয়মিত রাজস্ব না দিয়া উপায় ছিল না কিংবা তাহাদের বিদ্রোহের চিন্তা করাও অসম্ভব হইত।

শাসন-বিভাগ

সুলতানী শাসন ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন তিনি করেন নাই। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি 'পরগণা' এবং তাহা থাকিত একজন সিকদারের অধীনে। তিনি শাসন ও শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি দিতেন এবং 'মুন্সিফ' দিতেন রাজস্ব ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি। হিসাব



রাখা হইত হিন্দী এবং ফারসী ভাষাতে। পরগণার উপরে ছিল শিক বা সরকার। তাহার কর্তৃত্ব থাকিত 'শিকদার-ই-সিকদারান' এবং 'মুনসিফ্-ই-মুনসিফান্-এর উপর। ৪৭টি সরকারে শেরশাহের সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল। সরকার-এর শাসক ও রাজস্ব সংগ্রাহকগণ সরাসরি সম্রাটের নিকট দায়ী থাকিতেন। যাহাতে দীর্ঘকাল একই চাকরীতে থাকিয়া

লোকে দুর্নীতিগ্রস্ত না হইয়া পড়ে, সেজন্য শেরশাহ রাজকর্মচারীদের নিয়মিত বদলীর ব্যবস্থা করেন।

শেরশাহ বিশেষভাবে রাজস্ব, সামরিক এবং বিচার বিভাগের সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যৌবনে পিতার জায়গীর এবং পরবর্তীকালে কার্যত বিহারের শাসনকর্তারূপে তিনি ইতিপূর্বেই ভূমি-রাজস্বের সর্বস্তরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করাইয়া জমির সীমা নির্দেশের সুব্যবস্থা করেন। তাহার পরে জমির উর্বরতা অনুসারে ভালো, মন্দ এবং মাঝারি এই তিন প্রকারে জমি বিভাগের নির্দেশ দেন। জমির উর্বরতা অনুসারে উৎপন্ন ফসলের উপর রাজস্ব নির্ধারিত হইত সাধারণতঃ $\frac{১}{৩}$ হিসাবে। আমিন, কানুনগো, মুকাদ্দাম পাটোয়ারী প্রমুখের উপর রাজস্ব বিভাগের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। সরকার ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করিবার জন্য শেরশাহ 'কবুলিয়াৎ' ও 'পাট্টা' প্রথা প্রবর্তন করেন। প্রজাকে প্রদত্ত পাট্টাতে উল্লিখিত থাকে প্রজার জমির পরিমাণ ও স্বত্ব এবং কবুলিয়তে নির্দিষ্ট থাকে প্রজার পক্ষে রাজস্বদান করিবার অঙ্গীকার পত্র। জায়গীর প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া শেরশাহ নগদ টাকায় বেতন দিবার ব্যবস্থা করেন। খরা দুর্ভিক্ষের মোকাবিলার জন্য শেরশাহ কর্তৃক প্রতি বিঘায় ২$\frac{১}{২}$ সের শস্য সংগ্রহ করিয়া শস্য-ভাণ্ডার গড়া হইত। কৃষকদের হিতসাধনের প্রতি শেরশাহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, 'কৃষকরা নির্দোষ, তাহারা সর্বদাই শাসকের অনুগত, আমি অত্যাচার করিলে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।'

রাজস্ব ব্যবস্থা

সম্রাট বিচার-ব্যবস্থা সংস্কারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তিনি বলিতেন, 'ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ন্যায় বিচার।' ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচু, হিন্দু-মুসলমান, কোনরূপ ভেদাভেদ করা হইত না। বিচার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। রাজধানীর বিচার ব্যবস্থার প্রধান ছিল কাজী। পরগণায় পরগণায় বিচারের ভার ছিল আমিন, কাজী, মীর আদল প্রভৃতি কর্মচারীর উপর। গ্রাম-প্রধানদের উপর স্থানীয় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। শেরশাহের আমলে **পুলিশ** ব্যবস্থারও নানা সংস্কার সাধিত হয়। প্রজাদের উপর যাহাতে উৎপীড়ন না হয়, সেদিকে কর্মচারীদের উপর বিশেষ নির্দেশ ছিল।

বিচার ব্যবস্থা

সমস্ত সাম্রাজ্য জুড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে শেরশাহ নানা সংস্কার সাধিত করেন। সারা সাম্রাজ্যের মধ্যে বাংলাদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশ—দুই জায়গাতেই মাত্র শুল্ক দিতে হইত। অন্যত্র কোথাও কেহ রাস্তাঘাটে ফেরীতে বা সহরে শুল্ক আদায় করিতে পারিত না। প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং আমিনদের উপর তাঁহার সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল কেহ যেন ব্যবসায়ীর সহিত কোনরূপ দুর্ব্যবহার না করে। তাহার সাম্রাজ্যে কোন ব্যবসায়ী মারা গেলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে তিনি রাজী ছিলেন না। পথে ঘাটে কোন ব্যবসায়ীর ক্ষতি হইলে মুকাদ্দাম ও জমিদারদের সেজন্য দায়ী করিতেন। পণ্য দ্রব্যাদি চুরি হইলে মুকাদ্দাম ও

ব্যবসা-বাণিজ্য

জমিদারদের তাহা ফিরাইয়া দিতে হইত, নতুবা জরিমানা দিতে হইত। ইহার ফলে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল অটুট।

মুদ্রা-সংস্কার

শেরশাহের মুদ্রা-সংস্কারও রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। পূর্বের নিম্ন মানের মিশ্রধাতুর মুদ্রার পরিবর্তে শেরশাহ চমৎকার সোনা, রূপা এবং তামার সুন্দর সুন্দর আকারের মুদ্রাঙ্কণ করেন। তাঁহার প্রবর্তিত রৌপ্য-মুদ্রা এত সুন্দর ছিল যে, পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহার চলন ছিল। সারা সাম্রাজ্য জুড়িয়া একই প্রকার ওজন ও মাপ প্রচলন করিয়া তিনি রাজ্যব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়াছিলেন।

সড়ক নির্মাণ

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যে উন্নতমানের সড়কের প্রয়োজন সে বিষয়েও শেরশাহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সেইজন্য তিনি বাংলার সোনার গাঁ হইতে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করেন। ইহাই বর্তমানে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে খ্যাত। আগ্রা হইতে চিতোর দিয়া গুজরাটের বন্দরগুলিতে যাইবার উপযুক্ত রাস্তাঘাটও তাহারই নির্দেশে নির্মিত হইয়াছিল। পশ্চিম এবং মধ্য-এশিয়ায় যাইবার বিশ্রামস্থল ছিল তখন মুলতান। সেইজন্য উটের কাফেলা চলিবার মতো তৃতীয় পথ নির্মাণ করেন লাহোর হইতে মুলতান অবধি।

সরাইখানা

যাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রতি দুই ক্রোশ (৮ কি. মি.) অন্তর এই সব সড়কে সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সরাইখানাগুলি পথিকদের আশ্রয়ের উপযুক্ত এবং সুরক্ষিত ছিল। সেখানে তাহারা মালপত্র লইয়া নিরাপদে রাত্রি যাপন করিতে পারিত। হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরাইখানা ছিল। আব্বাস খাঁর মতে, যে-কেহ ঐ সকল সরাইখানাতে আশ্রয়ের নিমিত্ত গেলে সমাজে নিজের মর্যাদা অনুযায়ী আহার্য লাভ করিতেন। সরাইখানাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গ্রাম-সংগঠনের চেষ্টা হইত। সরাইখানা-এর খরচ চালাইবার জন্য গ্রামে জমির ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক সরাইখানায় কয়েকজন চৌকিদার থাকিত। কথিত আছে, ঐরূপ ১৭০০ সরাইখানা তাঁহার আমলে নির্মিত হইয়াছিল। আজও তাহার কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। অনেক সরাইখানা ধীরে ধীরে খামবা বা ব্যবসায়ী গঞ্জে পরিণত হইয়াছিল।

ডাকব্যবস্থা

রাস্তাঘাটের উন্নতির সহিত শেরশাহ সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্তে অবস্থিত বিভিন্ন অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ও সংবাদ আদান প্রদানের জন্য ঘোড়ার ডাক-এর প্রবর্তন করেন। সরাইখানাগুলিকে ডাক চৌকী হিসাবে ব্যবহার করা হইত। বর্তমানে এইগুলিই পোস্ট অফিস বা ডাকঘরে রূপান্তরিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র কোথায় কি ঘটিতেছে, কেহ কোথাও বিদ্রোহের চক্রান্ত করিতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য শেরশাহ এক বিশাল গোয়েন্দা বাহিনী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বলা হইত 'দারোগা-ই-ডাক-চৌকী' এই বিশাল সাম্রাজ্যের স্থিতি সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভর

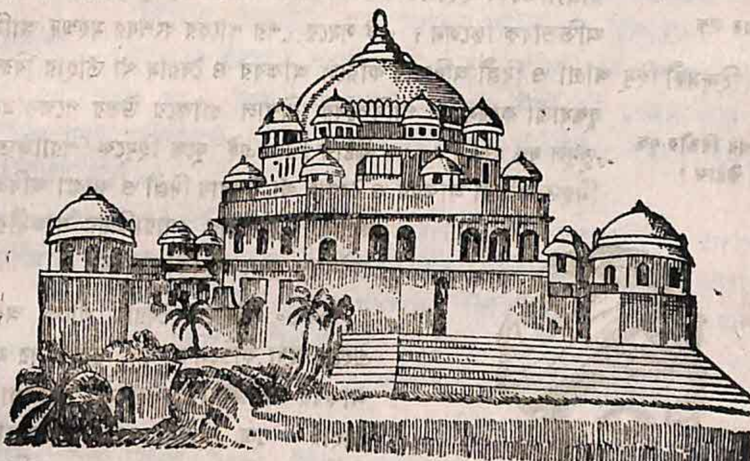
সমরবিভাগ

করিত বলিয়া শেরশাহ এক বিশাল সামরিক বাহিনী সংরক্ষণ করিতেন। তিনি সরাসরি

সৈন্য সংগ্রহ করিতেন ; নিয়োগের সময় প্রত্যেকের চরিত্র খুঁটিয়া দেখা হইত, প্রত্যেকটি সৈনিকের নাম খাতায় উঠাইয়া, ঘোড়ায় বিশিষ্ট রাজকীয় ছাপ দেওয়া হইত যাহাতে কেহ নিরেস ঘোড়া ব্যবহার না করিতে পারে। সম্ভবতঃ এই 'দাগ' ব্যবস্থা শের শাহ আলাউদ্দীন খিলজীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার বাহিনীতে ছিল দেড় লক্ষ অশ্বারোহী, পঁচিশ হাজার পদাতিক, পাঁচ হাজার হাতী ও বিরাট গোলন্দাজ বাহিনী।

শেরশাহের অবদান

সৈন্য চলাচলের অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত শেরশাহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ক্যান্টনমেণ্ট স্থাপন করেন। অসাধারণ সামরিক প্রতিভা, প্রশাসনিক নৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি অশোক-শ্রীহর্ষের ন্যায় পিতৃপ্রতিম দৃষ্টি, উদারনৈতিক চেতনা শেরশাহকে মধ্যযুগের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিয়াছে। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তাহার সুশাসনই শেরশাহের একমাত্র কৃতিত্ব নহে। শেরশাহ ছিলেন বিরাট নির্মাতা।



শেরশাহের সমাধি (সাসারাম)

নিজের সমাধির জন্য তিনি সাসারামে যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন, তাহা স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। প্রাচীন ও নবীন স্থাপত্যের মিশ্রণের উদাহরণ এই অপূর্ব সৌধ। দিল্লীর নিকটে যমুনা তীরে তিনি এক নূতন নগরও নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা পুরাণ কেল্লা রূপে পরিচিত। হিন্দী সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যেমন মালিক মহম্মদ জৈসীর 'পদ্মাবত' তাঁহার শাসন কালেই রচিত হইয়াছিল। ভারতে জাতীয় রাষ্ট্র গড়িবার জন্য যে-যে গুণের প্রয়োজন, তাহার সব কয়েকটিই শেরশাহ স্বয়ং আত্মস্থ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথই পরবর্তীকালে আকবরের জাতীয় মর্যাদা সম্পন্ন রাষ্ট্রের পথ সুগম করিয়াছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : শেরশাহের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় পুত্র ইসলাম শাহ কঠোর হস্তে সাম্রাজ্যে শাসন, শৃংখলা ও পূর্বের ন্যায় নীতি বজায় রাখেন। কিন্তু অতি অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় শূর সাম্রাজ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন দুর্বল ও বিলাসপ্রিয়। ইহার সুযোগ লইয়া পারস্যরাজ্যের সহায়তায় হুমায়ুন ভারতে প্রবেশ করিয়া দিল্লী ও আগ্রা পুনরাধিকার করেন (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়।

আকবর কর্তৃক সাম্রাজ্য বিস্তার ও সুসংগঠন

[Widening of the Empire and its consolidation by Akbar]

শের শাহের নিকট পরাজিত হুমায়ুন যখন আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরিতেছিলেন, তখন অমরকোট নামক স্থানে আকবরের জন্ম হয় ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইলেও ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁ তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। এই সময়ে শের শাহের বংশধর মহম্মদ আদিল শাহের হিন্দুমন্ত্রী হিমু আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিলে আকবর ও বৈরাম খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এই যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আকবর ও বৈরাম খাঁ পুনরায় দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। ইহার পর গোয়ালিয়র আজমীর ও জৌনপুর মুঘল অধিকারে আসে।

আকবরের জন্ম

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)



আকবর

১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে বৈরাম খাঁকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করিলেও আর দুই বৎসর কাল আকবর ধাত্রীমাতা মাহম আনাগা ও তাঁহার পুত্র আদম খাঁর প্রভাবাধীন ছিলেন। এই সময় মালব মুঘল অধিকারে আসে।

সাম্রাজ্য বিস্তার : ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতে মুঘল আধিপত্য স্থাপনে উদ্যোগী হন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সেনাপতি আসরফ খাঁ মধ্যপ্রদেশের গণ্ডোয়ানা রাজ্যের রাজমাতা রাণী দুর্গাবতীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ঐ রাজ্য অধিকার করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে রাজপুত মৈত্রী প্রয়োজনীয় বুঝিয়া আকবর রাজপুতদের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি নিজে জয়পুরের রাজা বিহারী মলের কন্যাকে বিবাহ করেন।

গণ্ডোয়ানা জয়

ক্রমে বিকানীর, জয়শলমীর প্রভৃতি রাজপুত নরপতিগণ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু মেবারের রাণা উদয়সিংহ মুঘলের আনুগত্য অস্বীকার করিলে আকবর চিতোর আক্রমণ করেন। রাজপুতগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হয় এবং চিতোর মুঘল অধিকারে আসে। অতঃপর আকবর রণথম্ভোর ও কালিঞ্জর দুর্গ জয় করেন (১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)। বিকানীরের রাজাও এই সময়ে (১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ) আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। আকবর রাজপুতদের সহিত বৈবাহিক ও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যবিস্তার ও সংগঠনে রাজপুত জাতির সহায়তা বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল।

রাজপুত নীতি : চিতোর ও রণথম্ভোর জয়

১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাট অধিকার করেন। গুজরাট অধিকারের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভূত আর্থিক উন্নতি হয় এবং আকবর পর্তুগীজ শক্তির সান্নিধ্যে আসেন।

গুজরাট জয়

ইহার অল্পকাল পরে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাতেও মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলেমান কররাণীর পুত্র সুলতান দাউদ খাঁ রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) পরাজিত ও নিহত হইলে পূর্বে বঙ্গদেশ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের অভ্যন্তরে ঈশা খাঁ কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য প্রমুখ জমিদারগণ (ইহারা বারো ভুঞা নামে পরিচিত) মুঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যান।

বিহার-উড়িষ্যা জয়

ইতিমধ্যে উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন; হলদিঘাটের যুদ্ধে (১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) রাণা প্রতাপ সিংহ পরাজিত হন। তৎসত্ত্বেও তিনি সংগ্রাম চালাইয়া যান, এবং মৃত্যুর (১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) পূর্বে বহু স্থান পুনরুদ্ধার করেন। এই অমর দেশপ্রেমিকের পুত্র অমরসিংহ মুঘলের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন (১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

হলদিঘাটের যুদ্ধ (১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)

ইতিমধ্যে ক্রমে কাবুল (১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ) কাশ্মীর (১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ), সিন্ধু (১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দ) ও বেলুচিস্তান (১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) মুঘল অধিকারে আসে। অতঃপর আকবর দাক্ষিণাত্য জয়ে উদ্যোগী হন। আকবর আহম্মদনগর আক্রমণ করিলে নাবালক সুলতানের মাতা চাঁদ সুলতানা বাধা দেন ও পরে সন্ধি করিয়া বেরার মুঘলদের হস্তে সমর্পণ করেন। কিছুদিন পরে আকবর খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর ও আসীরগড় দুর্গ অধিকার করেন।

দাক্ষিণাত্যের রাজ্য-বিস্তার আহম্মদনগর, খান্দেশ

নূতন শাসনতন্ত্রের ভিত্তি ঃ অতি বাল্যকালে সিংহাসন লাভ করিলেও আপন বীরত্ব এবং মনীষায় আকবর বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া যেমন ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করেন তেমনি করেন তাহার সুসংগঠনের এবং সুশাসনের ব্যবস্থা। প্রথম স্তরে ১৫৫৬

হইতে ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১২ বৎসর তাঁহার কাটিয়াছে বৈরাম খাঁ ও ধাত্রী মাতার অভিভাবকত্বে এবং অভিজাতগণের বিদ্রোহ দমনে। সে সকল অশান্তি দমন ও গুজরাট বিজয়ের পর ও বাংলার বিদ্রোহ দমনের মধ্যে আকবর সাম্রাজ্যের শাসন সংস্কার করিয়াছিলেন। এই বিরাট সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্য আকবর যে শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন, তাহা ছিল এক নূতন প্রশাসনিক সংগঠনের ভিত্তি।

তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায় বিভক্ত করিয়া তাহার শান্তি ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব দিলেন সুবেদার-এর উপর, সেই সঙ্গে সম-মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে করিলেন দেওয়ান—যাঁহার উপর দায়িত্ব রহিল রাজস্ব সংগ্রহের। তাহা ছাড়া ছিলেন বক্সী, সদর, কাজী ও ওয়াকিয়ানবিশ। পূর্বের পরগণা ও সরকার আকবরের যুগেও প্রচলিত ছিল। সরকারে



শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য দায়ী ছিলেন ফৌজদার এবং রাজস্বের জন্য দায়ী ছিলেন আমলগুজার। সাম্রাজ্যের সকল ভূখণ্ড বিভক্ত ছিল 'জাগীর', 'খালসা' ও 'ইনাম' নামক তিনটি

শ্রেণীতে। খালসা ভূখণ্ডে সমস্ত আয় সরাসরি রাজকোষে যাইত ; ইনাম জমি পণ্ডিত ও ধার্মিকদের দান করা হইত এবং জায়গীর জমি অভিজাত বর্গ ও রাজপরিবারের সভ্য এবং মহিলাদের প্রদত্ত হইত।

আকবরের প্রথম হইতেই জায়গীরদারদের ক্ষমতা সংকোচ করিবার প্রতি লক্ষ্য ছিল। সেজন্য তিনি জায়গীর প্রাপ্ত জমিকে খালসা জমিতে পরিণত করিবার নির্দেশ দিয়া বেতনভুক কর্মচারীর অধীনে এক একটি অঞ্চলের তদারকের ভার অর্পণ করেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজকর্মচারীর সংখ্যা স্বভাবতই বাড়িয়া গিয়াছিল। সুশাসনের জন্য একটি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আকবর ৩৩টি স্তরে বিভক্ত মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করেন।

জায়গীর-দারী

ইনাম জমিকে তিনি খালসা ও জায়গীর জমি হইতে পৃথক করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্যকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি ইনাম জমি দেখাশুনা ও শাসনের ব্যবস্থা করেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আকবর ইনাম জমি বিতরণ করিতেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থারও তিনি নানা সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর পুংখানুপুংখ রীতিনীতির নির্দেশ দিয়া আকবর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নূতন জীবনের স্পর্শদান করেন। আকবর বিভিন্ন বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম বিভক্ত করিয়া দেন। পূর্বে যেমন প্রধান উজীরের হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকিত, সেই পদ না উঠাইয়াও আকবর তাঁহার হাতে অত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিতে দেন নাই। তিনি দেওয়ান-ই-আল নামের প্রধান কর্মচারীর হাতে সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয় এবং খালসা, জায়গীর ও ইনাম জমির নিয়ন্ত্রণের ভার দিয়াছিলেন।

প্রশাসন ব্যবস্থা

সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন মীর বক্সী। দেওয়ান নন, মীর বক্সীকেই অভিজাত বর্গের প্রধান মনে করা হইত। তাঁহার পরামর্শেই মনসবদারদের পদোন্নতি ঘটিত। দেওয়ান ও মীর বক্সীর ক্ষমতা প্রায় সমান সমান থাকায় একে অন্যের কাজের উপর কিছুটা সংযম আরোপ করিতে পারিতেন। আকবরের শাসন সংস্কারের প্রতি ক্ষেত্রেই এরূপ সংযম ও শক্তির ন্যায্য নীতি দেখা যায়। তৃতীয় প্রধান কর্মচারী ছিলেন 'মীর সামান' বা রসদ-সরবরাহকারীদের প্রধান। চতুর্থ জন হইলেন বিচার-বিভাগের প্রধান কাজী।

রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ শেরশাহের সুশাসন ব্যবস্থা ততদিনে বিলুপ্ত হওয়ায় আকবরকে প্রথম হইতে সুরু করিতে হয়। কৃষকদের চাষবাসের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে আকবর নানা ধরনের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন। জমির উৎপন্ন ফসলের আর্থিক মূল্যের উপর রাজস্ব আদায় হইত প্রধানতঃ ⅓ হিসাবে ভালো, মাঝারি এবং খারাপ—এই তিন প্রকারে জমির বিভাগ হইত। রাজস্বের পরিমাণেরও পার্থক্য ঘটিত এই অনুসারে। পরে তিনি দশশালা বন্দোবস্ত চালু করিয়াছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকদের শস্যে

বা নগদে খাজনা দিবার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য তুলা, নীল, তৈলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি ফসলের ক্ষেত্রে নগদ টাকার খাজনা দিতে হইত বলিয়া ইহাদের নগদ ফসল বলা হইত। আকবরের রাজস্ব নীতির নির্ধারক টোডরমল্ল প্রথমে শেরশাহের অধীনে কাজ করিতেন।

আকবর কৃষকদের মঙ্গলের জন্য আমীনদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেন যে তাঁহারা যেন চাষীদের বীজ, যন্ত্রপাতি, গবাদি পশু কিনিবার জন্য তাখাবি ঋণ দিবার ব্যবস্থা এবং অতি সহজ কিস্তিতে সে ঋন পরিশোধের উপায় করিতে পারে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জমিদারদেরও আকবর নির্দেশ দেন যেন তাঁহারাও কৃষকদের সহিত চাষবাসের উন্নয়নে সাহায্য করেন। শস্যের একাংশের ভাগ পাইবার যে বংশানুক্রমিক অধিকার জমিদারদের ছিল, তেমনি কৃষকদের জমি চাষ করিবার বংশগত অধিকার ছিল এবং যতদিন তাহারা খাজনা দিতে সক্ষম ততদিন তাহাদের উচ্ছদ করা চলিত না।

সামরিক ব্যবস্থা

একটি বিশাল ও সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী ব্যতীত আকবরের পক্ষে এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তাহা দখলে রাখা সম্ভব হইত না। সেইজন্য তাঁহাকে একদিকে অভিজাত বর্গ এবং অন্যদিকে সৈন্যবাহিনীকেও সুসংগঠিত করিতে হয়। আর তিনি উন্নত রাজস্ব-ব্যবস্থা দ্বারা প্রজাসাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত 'মনসবদারী' প্রথায় অভিজাত বর্গ ও সৈন্যদল উভয়েই সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজকর্মচারীকে একটি করিয়া পদ বা "মনসব" দান করা হয়। সর্বনিম্ন পদ ছিল ১০ এবং কর্মচারীদের উচ্চতম মনসব ছিল ৫,০০০ ; অবশ্য তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে ইহা বাড়াইয়া ৭,০০০ করা হয়, সে পদে নিযুক্ত হইতেন রাজপরিবারের লোকজন।

মনসবদার

মনসবদারদের বেতন দেওয়া হইত। সেই বেতন হইতে তাহাদের সৈন্যদের সমস্ত ব্যয় বহন করিবার ব্যবস্থা ছিল। জায়গীরের পরিবর্তে বেতনদান প্রথা আকবরের দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক। অভিজাত বর্গ লইয়া গঠিত বাহিনীতে মুঘল, পাঠান, হিন্দুজাতি ও রাজপুত নানা সম্প্রদায়ের লোক থাকিতেন। ইহার ফলে বিদ্রোহের আশঙ্কা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল।

সৈন্যদল

অশ্বারোহী বাহিনী ব্যতীত ছিল তীরন্দাজ, বন্দুকধারী প্রভৃতি নানা বিভাগের লোক। ঘোড়সওয়ারদের বেতনের গড় হার ছিল ৩০ টাকা। পদাতিকদের বেতন ছিল মাসিক ৩ টাকা। সেনাদলের বেতন মনসবদারদের বেতনের সহিত যুক্ত করা হইত। আকবরের নিজস্ব দেহরক্ষী রূপে এক বিরাট অশ্বারোহী বাহিনী ছিল।

সাংস্কৃতিক জীবন ঃ আকবরের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধশালী রাজত্বে সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় সাংস্কৃতিক জীবনেরও নানাদিকে বিকাশ ঘটিয়াছিল। ফারসী ভাষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেন আবুল ফজল, নিজামউদ্দীন, বদাউনী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগন। সাত বৎসরের একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফল আবুল ফজল রচিত "আইন-ই-

আকবরী”—ঐ যুগের ইতিহাসের এক অমূল্য আকর গ্রন্থ। ফারসী ভাষার কবিদের অগ্রগণ্য ছিলেন ফৈজী। তাঁহার সমসাময়িক তুলসীদাস 'রামচরিত মানস' লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

অনুবাদ

সংস্কৃত আরবী গ্রীক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার নানা গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদের জন্য আকবর এক বিরাট অনুবাদ-বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বিভাগের প্রথম কাজ হয় অথর্ব বেদ ও বাইবেল অনুবাদ; তাহার পর অনূদিত হয় মহাভারত, গীতা ও রামায়ণ। পবিত্র কোরাণও সম্ভবত এই প্রথম ফারসীতে অনূদিত হইয়াছে।

শিক্ষ-সংস্কার

আকবর প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া নূতন পাঠক্রম রচনার নির্দেশ দেন। তাহাতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয় নীতি, শিক্ষা, অঙ্কশাস্ত্র, কৃষি, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয়ের উপর।

সমাজ-সংস্কার

সামাজিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ সমাজজীবন। আকবর সমাজজীবনে হিন্দু বিধবাদের স্বীয় মতের বিরুদ্ধে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। তিনি বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া বালিকাদের নিম্নতম বিবাহের বয়স ১৪ এবং বালকদের বয়স ১৬ নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

চারুশিল্প

প্রাচীনকাল হইতে অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত ভারতীয় চিত্রশিল্পকে আকবর নূতন প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে ভারতীয় শিল্পীগণ পারসিক শিল্পাঙ্কন রীতি অনুশীলনে প্রেরণা লাভ করেন। এই সময়েই ইন্দো-পারসিক রীতি নামক শিল্পরীতির প্রবর্তন হয়। ফতেপুর সিক্রীর দেওয়ালে অঙ্কিত ফ্রেস্কোগুলি তাহার নিদর্শন।

বিচার ব্যবস্থা

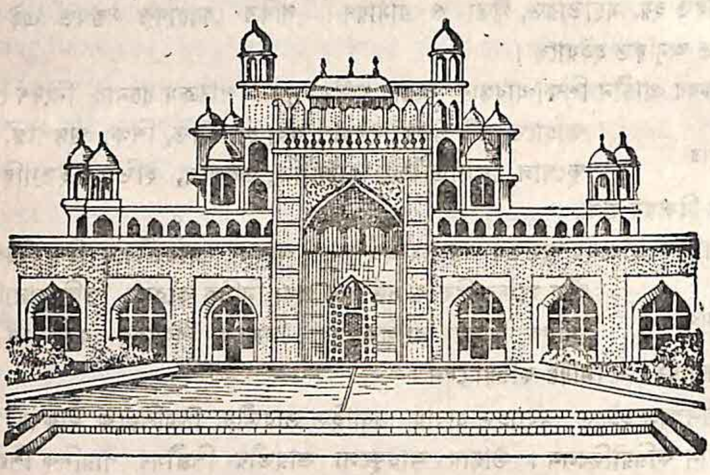
বিচার-বিভাগে সম্রাট সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও বিচার-বিভাগের দায়িত্ব ছিল কাজীর উপর ন্যস্ত। কোরানের নির্দেশ ও ইসলামের রীতি নীতি অনুসারে বিচারকার্য পরিচালিত হইত।

হিন্দুনীতি

শাসক হিসাবে আকবর হিন্দুপ্রধান দেশে হিন্দুদিগকে সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এবং মানসিংহ, টোডরমল্ল ও রাজা বীরবল প্রভৃতি হিন্দুকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া তিনি রাজপুত তথা হিন্দুদের স্ববশে আনয়ন করেন। হিন্দুদের উপর হইতে 'জিজিয়া কর' তুলিয়া দিয়া এবং হিন্দু মন্দিরাদি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আকবর হিন্দুদের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

দীন-ই-ইলাহী: ধর্মজীবনে আকবর প্রথম দিকে সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু পরে নানা ধর্মের সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বিভিন্ন ধর্মের মূল তত্ত্ব জানিতে আগ্রহী হন। ধর্মীয় আলাপ আলোচনার জন্য তিনি ইবাদৎখানা নামে একটি পৃথক গৃহের ব্যবস্থা করেন। একটি দলিল (Infallibility Decree) প্রচার করিয়া

তিনি ধর্মীয় বিষয়ে সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর বিভিন্ন ধর্মের কথা জানিয়া সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য আকবরের মনে তীব্র আকাঙ্খা জাগে। সকল ভারতবাসীকে এক উদার ধর্মে উজ্জীবিত করিয়া নবীন জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত করাই ছিল আকবরের মহান উদ্দেশ্য। এইজন্য সকল ধর্মের সারতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে "দীন-ই-ইলাহী" নামে এক নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেন। এই ধর্ম অবশ্য বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়।



আকবরের সমাধি (সেকেন্দ্রা)

আকবরের দরবার ঃ আকবর তাঁহার দরবারের সভাসদদের নির্বাচন করিতেন হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত বর্গ হইতে। মুসলিম সভাসদদের মধ্যে তাঁহার ঘনিষ্ঠতম ছিলেন শেখ মুবারকের দুই পুত্র ফৈজী এবং আবুল ফজল। ফৈজী ছিলেন মূলত কবি। কিন্তু আবুল ফজল ছিলেন আকবরের একনিষ্ঠ সহচর এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মচারী। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহাকে ফ্রান্সিস বেকনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রাজা মানসিংহ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর-নায়ক। রাজস্ব-বিভাগের অধিকর্তা টোডরমল্লেরও তুলনা সে যুগে বিরল। যেমন রাজস্ব-বিভাগে, তেমনি সমর-প্রাঙ্গনেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ; অপর নাম হইতেছে বীরবলের।

ইহারা ব্যতীত জেস্যুইট যাজকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অ্যাকোয়াভিভা মনসেরাট, জেরক্স জেভিয়ার্স প্রমুখ।

নির্মাতারূপে আকবর

আপন মানসিকতার প্রতিফলনস্বরূপ আকবরের স্থাপত্যগুলিতেও হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পরীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজা, জাম-ই মসজিদ, যোধবাই মহল, সলিম চিশ্‌তির সমাধি প্রভৃতি স্থাপত্য-কীর্তিগুলি—নির্মাতারূপে আকবরের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহান
[Jahangir and Shahjahan]

জাহাঙ্গীর (১৬০৫—১৬২৭ খ্রীঃ) ঃ আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু বিদ্রোহ করিলে জাহাঙ্গীর অতি সহজেই সে বিদ্রোহ দমন করেন। খুসরুকে অর্থ সাহায্য করার অপরাধে শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর মির্জা গিয়াস বেগ নামে এক ইরানীর সুন্দরী কন্যা মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করেন। মেহেরুন্নিসা এই সময় হইতে 'নূরজাহান' নামে পরিচিতা হন। আপন সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা নূরজাহান স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া শাসনকার্যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

রাজ্য জয়

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়া জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশে মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই কার্যে বঙ্গদেশের সুবাদার ইসলাম খাঁ খুব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে মেবার মুঘলদের আয়ত্তে আসে। রাণা অমরসিংহ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তবে মুঘল পরিবারে মেবারের রাজকন্যা প্রেরণের কোন বাধ্য-বাধকতা রাখা হয় নাই।

পিতার 'অগ্রসর নীতি' অবলম্বনে জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আহম্মদনগরের এক সুযোগ্য হাবসী মন্ত্রী মালিক অম্বরের বিরোধিতায় মুঘলগণ কেবলমাত্র আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল। উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের কাংড়া দুর্গ বিজয় (১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যরাজ শাহ্ আব্বাস হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুঘলদের নিকট হইতে কান্দাহার কাড়িয়া লন।



জাহাঙ্গীর

শাসক হিসাবে মূল্যায়ন

জাহাঙ্গীর কান্দাহার পুনর্দখল করিতে না পারায় পশ্চিম দিক হইতে ভারতে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইয়া রহিল। পিতার ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে জাহাঙ্গীর তেমন মুক্ত হস্ত ছিলেন না এবং পিতার আমল অপেক্ষা কেন্দ্রীয় শাসন তাঁহার আমলে অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। রাজস্ব-বিভাগে পুনরায় জায়গীরের প্রাধান্য ঘটিতে লাগিল। তাঁহার শাসনকালের ইংরাজীতে রচিত বিবরণ হইতে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় শাসন সাম্রাজ্যের প্রান্তীয় প্রদেশে অত্যন্ত শ্লথ ছিল।

শাহ্ জাহান (১৬২৮—১৬৫৮ খ্রীঃ) : পিতার মৃত্যুর পর শাহ্ জাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় খুসরু ও পরভেজের পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। জীবিত ছিলেন তৃতীয় পুত্র শাহ্ জাহান ও কনিষ্ঠপুত্র শাহ্ রিয়ার। নূরজাহান শাহ্ রিয়াকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে শাহ্ জাহানকে সিংহাসন পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। শ্বশুর আসফ খাঁর সাহায্যে তিনি সহজেই শাহ্ রিয়ারকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া সিংহাসন দখল করেন।

সিংহাসন লাভ

রাজত্বের প্রথম দিকে শাহ্ জাহানকে বিভিন্ন বিদ্রোহ-দমনে তৎপর হইতে হইয়াছিল। বুন্দেলখণ্ডের জুঝ সিংহ ও দাক্ষিণাত্যের ভূতপূর্ব সুবাদার খাঁ জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমনে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে না হইলেও হুগলীতে পর্তুগীজদের উৎপীড়ন বন্ধ করিতে তাঁহাকে খুব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে বাংলার সুবাদার কাশিম খাঁ হুগলী অধিকার (১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) করিয়া পর্তুগীজদের তথা হইতে বিতাড়িত করেন।

বিদ্রোহ দমন

ইহার পর শাহ্ জাহান সাম্রাজ্য-বিস্তারে উদ্যোগী হন। দাক্ষিণাত্যে তিনি রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তথাকার সিয়া রাজ্যগুলি কুক্ষিগত করিতে আগ্রহী হন। আহম্মদনগর অধিকার করিয়া (১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) শাহ্ জাহান বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে বশ্যতা স্বীকারে আহ্বান জানান। গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লা শাহ্ বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু বিজাপুর অধিপতি আদিল শাহ্ মুঘলদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে বিজাপুরও পরাজিত হইয়া মুঘলের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল (১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

দাক্ষিণাত্য


শাহ্ জাহান

আলী মর্দান খাঁ নামে পারস্যরাজের একজন বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর সাহায্যে শাহ্ জাহান কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে কান্দাহার পুনরায় মুঘলদের হস্তচ্যুত হয়। শাহ্ জাহান তিন বার চেষ্টা করিয়াও উহা আর উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তর পশ্চিম সীমান্তনীতি একদিকে যেমন মুঘলের মর্যাদা হানি করে, অপরদিকে তেমনই রাজকোষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির ন্যায় শাহ্ জাহানের মধ্য-এশিয়া নীতিও ব্যর্থ হয়। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য-এশিয়ায় বাল্খ ও বদাক্শান মুঘল অধিকারে আসিলেও উজবেকদের বিরোধিতার ফলে ঐ অঞ্চলগুলিতে মুঘল আধিপত্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

মধ্য-এশিয়া নীতি

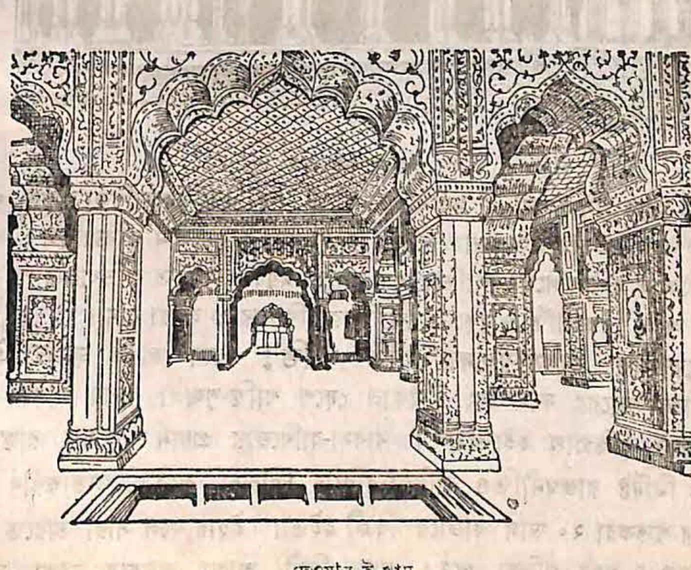
১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ জাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে শাহ্ জাহান ভাবী সম্রাটরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সুজা বঙ্গদেশের সুবেদার ছিলেন। তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব আর কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন যথাক্রমে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের শাসক। উত্তরাধিকারের এই দ্বন্দ্বে পরিশেষে ঔরঙ্গজীব বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া ও ভ্রাতাদের পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। শেষ কয়েক বৎসর অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া বৃদ্ধ শাহ্ জাহান ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত যুদ্ধ

শাসক হিসাবে মূল্যায়নঃ শাহ্ জাহানের রাজত্বকালকে অনেকে মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির যুগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাম্রাজ্যের প্রসার এবং বাণিজ্যিক ও শিল্পকলার উন্নতির কথা স্মরণ করিলে শাহ্ জাহানের রাজত্বকালকে মুঘল শাসনের সুবর্ণ যুগ মনে করা আদৌ অসঙ্গত নহে। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, মুঘল সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ এই সময়েই শিথিল হইতে আরম্ভ করে। ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই-এর ন্যায় বাহ্যিক আড়ম্বর ও জাঁকজমকের অন্তরালে সাম্রাজ্যের অর্থ নৈতিক ও সামরিক কাঠামোয় যে ফাটল পরিলক্ষিত হয়, কালের প্রবাহে তাহাই ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতাঃ জাহাঙ্গীর নিজে চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। 'মুঘল মিনিয়েচার' নামে পরিচিত ক্ষুদ্র চিত্রশিল্প তাঁহারই আমলের। তাঁহার সময়ে সেকেন্দ্রায় নির্মিত 'আকবরের সমাধিভবন' ও 'ইতিমাদ উদ-দৌলার সমাধি সৌধ মুঘল সম্রাটের শিল্পানুরাগের পরিচায়ক।

জাহাঙ্গীর

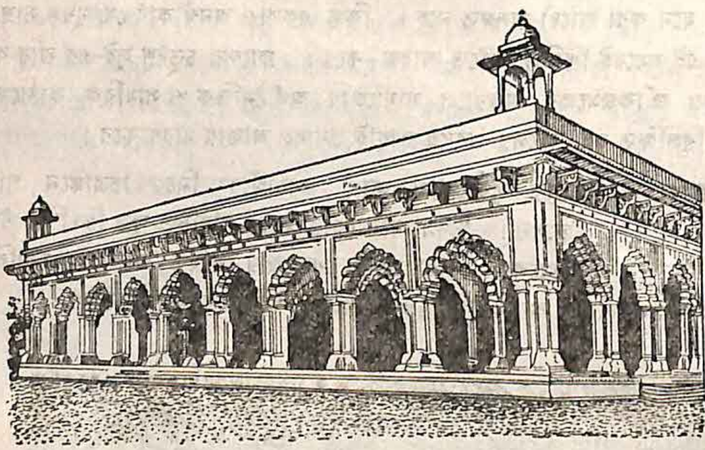


দেওয়ান-ই-খাস

মুঘল সম্রাটগণের মধ্যে শাহ্ জাহানের মতো আড়ম্বরপ্রিয় ও শিল্পানুরাগী কেহই ছিলেন

না। শাহ্‌জাহানের দরবারের জাঁকজমক এবং হর্মাবলীর অপূর্ব সৌন্দর্য সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটকগণকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া তুলিত। শাহ্-জাহানের সময়ে আগ্রার দুর্গে নির্মিত 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'কাচ বা শীষমহল' ও 'মোতি মসজিদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সময়ে নির্মিত অট্টালিকাসমূহের অধিকাংশই মর্মরপ্রস্তর নির্মিত। দিল্লীর 'লাল কেল্লা' যমুনাতীরে অবস্থিত। ইহার অভ্যন্তরে 'দেওয়ান-ই-আম' ও দেওয়ান-ই-খাস' সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শাহ্‌জাহানের শিল্পানুরাগের অক্ষয় স্বাক্ষর বহন করিতেছে আগ্রায় যমুনাতীরে নির্মিত 'তাজমহল'। পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত এই অপূর্ব সৌধভবন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি হিসাবে আজিও স্বীকৃত। দেশ বিদেশ হইতে শ্বেতমর্মর এবং খ্যাতিমান শিল্পী আনয়ন করিয়া শাহ্‌জাহান পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম-রূপে স্বীকৃত এই অপূর্ব স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানের আর একটি

শাহ্‌জাহান



দেওয়ান-ই-আম

অপূর্ব সৃষ্টি 'ময়ূর সিংহাসন'। স্বর্ণনির্মিত চারটি পদ এবং মণিমাণিক্য-খচিত দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর কারুকার্যমণ্ডিত চন্দ্রাতপ ময়ূর সিংহাসনের শোভাবর্ধন করিয়াছিল। প্রতিটি স্তম্ভশীর্ষে উজ্জ্বল মণিমাণিক্যে শোভিত এক জোড়া ময়ূর। ভারত অভিযানের পর নাদির শাহ্ এই অপূর্ব শিল্পকীর্তি ও মুকুটের কোহিনুর মণি পারস্যে লইয়া যান।

ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি নীতিঃ সারা ভারত জুড়িয়া ঐক্যবদ্ধ মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তারের ফলে এবং দীর্ঘকাল দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকায় দেশের বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান সহায়ক রাস্তাঘাটের উন্নতি ও নির্দিষ্ট রাজস্বনীতিও বাণিজ্য-বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অভ্যন্তরীণ কৃষিজ উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ বাজারে বিক্রী হইত। ইহার ফলে সারা ভারতে অনেক ছোট বড় গঞ্জ ও শহর গড়িয়া ওঠে। যথা—দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, ঢাকা, মুলতান রাজমহল ইত্যাদি।

ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির অন্য একটি কারণ ছিল ইউরোপের সহিত বাণিজ্য। সমুদ্রপথে পর্তুগীজ আধিপত্য থাকায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে তাহাদেরই প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। জাহাঙ্গীর একবার গোয়ায় দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজ সম্রাট প্রথম জেমসের দূত জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসিয়া মনসবদারী লাভ করেন। সেই সংবাদে গোয়ার শাসনকর্তা সম্রাটের দূতকে ফেরৎ পাঠাইয়া ভারতের বিরুদ্ধতা আরম্ভ করেন। জাহাঙ্গীর ভীত হইয়া ইংরাজ দূত ক্যাপ্টেন হকিন্সকে বিদায় দেন। ইতিমধ্যে পারস্য উপসাগরে ইংরাজ নৌবাহিনীর নিকট পর্তুগীজ নৌসৈন্য বিধ্বস্ত হইলে পর্তুগীজ ভীতি দূর হয় এবং জাহাঙ্গীর পুনরায় ইংরাজ দূতকে গ্রহণ করেন ও সুরাটে বাণিজ্য করিবার কুঠী স্থাপনের অনুমতি দান করেন।

পর্তুগীজ

পর্তুগীজগণ লুণ্ঠনবৃত্তি ও দাস-ব্যবসায়ের জন্য শাহ্‌জাহানেরও শত্রুতা অর্জন করিয়াছিলেন। আকবরের আমলের (১৫৭৯ খ্রীঃ) একটি ফরমানে তাহারা হুগলীতে ব্যবসা করিত। লবণ ব্যবসায়ের একচেটিয়া কর্তৃত্ব তাহাদের ছিল। তাহাদের দাস-ব্যবসায় বন্ধের জন্য শাহ্‌জাহান ১৬৩২ সালে হুগলী দখল করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে পর্তুগীজদের বাণিজ্য আর বাড়িতে পারে নাই।

পর্তুগীজদের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ওলন্দাজগণ মসলিপত্তমে ব্যবসায়ী কুঠী পত্তন করিয়াছিল। পরে করমণ্ডল উপকূলের পুলিকটেও তাহারা ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবসায় আরম্ভ করে। জাহাঙ্গীরের আমলে তাহাদের ব্যবসায় বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে তাহারা বাংলার চুঁচূড়ায় এবং অন্যান্য নানাস্থানে কুঠী স্থাপন করিয়াছিল।

ওলন্দাজগণ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেই স্যার টমাস রো সুরাটে বাণিজ্যকুঠী স্থাপনের অধিকার লাভ করেন। পরে শাহ্‌জাহানের আমলে মাদ্রাজেও কুঠী স্থাপিত হয়। ইংরাজগণের দৃষ্টি ক্রমে বাংলায় পড়িলে হুগলীতেও তাহাদের ব্যবসায় কুঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুঘল সম্রাটগণ পারতপক্ষে বিদেশী ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না।

ইংরাজগণ

উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত যুদ্ধ ঃ ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে শাহ্‌জাহান ভাবী সম্রাটরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সুজা বঙ্গদেশের সুবাদার ছিলেন। তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব আর কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন যথাক্রমে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের শাসক। উত্তরাধিকারের এই দ্বন্দ্বে পরিশেষে বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া ও ভ্রাতাদের পরাজিত করিয়া ঔরঙ্গজীব সিংহাসন অধিকার করেন (১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ঃ ঔরঙ্গজীবের শাসনকালের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লক্ষ্য করিবার মতো দুইটি বিষয় আছে। এই দুইটি বিষয়ই তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাহার প্রথমটি হইতেছে আকবর প্রতিষ্ঠিত

মুঘল সাম্রাজ্যের চরম সম্প্রসারণ এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে সেই সম্প্রসারিত সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এমন কতকগুলি ত্রুটির সৃষ্টি, যাহার ফলে ঐ বিশাল সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া। আকবর চারটি স্তম্ভের উপর সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যটি সুসংগঠিত করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কাবুল কান্দাহারে আধিপত্য বিস্তার দ্বারা পারসিক সাম্রাজ্যের সহিত শক্তি সাম্য বজায় রাখিতেন এবং ঐ অঞ্চল হইতে ভারত আক্রমণের আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল রাজপুত জাতির মৈত্রী অর্জন দ্বারা দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সামরিক অভিযানের পথ সুরক্ষা। তাঁহার তৃতীয় স্তম্ভ ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি দ্বারা প্রজাদের সমর্থন লাভ করিয়া জাতীয় সম্রাটের মর্যাদা লাভ এবং চতুর্থ স্তম্ভটি ছিল সম্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। ঔরঙ্গজীবের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত মুঘলদের হাতছাড়া হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভও তাঁহার ধর্মনীতির জন্য দুর্বল হইয়া পড়িলে শিবাজীর নেতৃত্বে হিন্দু-শক্তির পুনরুত্থান ঘটিতে আরম্ভ করে। কেবলমাত্র চতুর্থ স্তম্ভটি তাহার পুত্র বাহাদুর শাহ অবধি অটুট ছিল। সেইজন্য তাঁহার মৃত্যুর সহিত মুঘল সাম্রাজ্যেরও অবক্ষয়ের সূত্রপাত।



ঔরঙ্গজীব

সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরেই ঔরঙ্গজীব বাংলার শাসনকর্তা মীর জুমলার নেতৃত্বে পূর্ব ভারতে সৈন্য প্রেরণ করেন আসামের অহোমদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহার দখল করিয়া মীরজুমলা আহোমদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন (১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু আসাম হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে মীরজুমলা মারা যান। সুযোগ বুঝিয়া কুচবিহার ও আসাম স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অতঃপর ঔরঙ্গজীব তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। শায়েস্তা খাঁ আরাকান-রাজের নিকট হইতে চট্টগ্রাম ও পর্তুগীজদের নিকট হইতে সন্দীপ অধিকার করেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'আফ্রিদি', 'খতক' প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতিগুলি মুঘল সম্রাটের উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের দমনের উদ্দেশ্যে ঔরঙ্গজীব 'অগ্রসর নীতি' অবলম্বন করেন। 'ইউসুফজাই' দলের বিদ্রোহ সহজে দমিত হইলেও (১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) মুঘল-বাহিনী 'আফ্রিদি' দলের নিকট পরাজিত হয়। সুযোগ বুঝিয়া 'খতক' দলটিও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঔরঙ্গজীব পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া স্বয়ং কুটনীতির সাহায্যে বিদ্রোহী

উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বিপদ

দলগুলির কয়েকজন নেতাকে আনিতে সমর্থ হন। এইভাবে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যার সমাধান করিলেও ইহাতে মুঘল রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, এই সীমান্তে ঔরঙ্গজীব ব্যস্ত থাকায় শিবাজীর পক্ষে দাক্ষিণাত্যে আপন শক্তিবৃদ্ধি



সহজ হইয়া ওঠে। এইস্থানে উল্লেখ্য যে, কাবুল কান্দাহার শাহ্‌জাহনের রাজত্বকালেই মুঘলদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য নীতি ঃ ঔরঙ্গজীবের দাক্ষিণাত্য নীতি দুইভাবে আলোচনার যোগ্য। প্রথম হইতে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিয়া সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য

সম্প্রসারণ এবং দ্বিতীয়টি হইল শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের সহিত জীবন-ব্যাপী অমীমাংসিত সংঘর্ষ। পূর্বপুরুষদের নীতি অনুসরণ করিয়া ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা-বিস্তারে উদ্যোগী হন। বস্তুত দাক্ষিণাত্যে শাসকপদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ই তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু শাহ্জাহান বাধা দেওয়ায় সফল হন নাই। নিজে সম্রাট হইয়া ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্য জয়ের সংকল্প করিলেন। ইহার ফলে বিজাপুর (১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) ও গোলকুণ্ডা (১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) মুঘলের শাসনাধীনে আসে।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা

শিবাজী ও মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষের প্রথম অধ্যায়
[Shivaji and the first phase of the Mughal-Maratha Conflict]

দাক্ষিণাত্যের সুবাদার থাকাকালীন ঔরঙ্গজীব শিবাজীর অভ্যুত্থানের সংবাদ রাখিতেন। বিজাপুরের সুলতানের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে শিবাজী দাক্ষিণাত্যে একটি বিশিষ্ট হিন্দু শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সেইজন্য সিংহাসন লাভ করিয়াই শিবাজীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে মাতুল শায়েস্তা খাঁকে ঔরঙ্গজীব শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু শিবাজীর অতর্কিত আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ পলায়ন করিলে ঔরঙ্গজীব রাজা জয়সিংহ এবং দিলীর খাঁকে পাঠাইলেন শিবাজীকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর সহিত মুঘলদের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শিবাজী তাঁহার হৃতরাজ্যগুলি দ্রুত পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন এবং ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে "ছত্রপতি" উপাধি ধারণ করিয়া রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যুতে মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষের প্রথম অধ্যায়ের উপর যবনিকাপাত ঘটে।


শিবাজী

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মারাঠা ও শিখগণ এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। পশ্চিমঘাট এবং বিন্ধ্য-সাতপুরা পর্বতশ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত মহারাষ্ট্র অঞ্চল মধ্যযুগ হইতেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। একনাথ, তুকারাম, রামদাস, বামনপণ্ডিত প্রভৃতি ধর্মসংস্কারকগণের অনুপ্রেরণায় মারাঠারা এক নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যে জাতীয়তার মন্ত্রে তাহারা দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাকেই সপ্তদশ শতাব্দীতে বাস্তবে পরিণত করিয়াছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। তাঁহারই নেতৃত্বে মারাঠারা মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে

শিবাজী ও মারাঠাজাতি

সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। কৈশোর অবস্থা হইতে তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখিতেন এবং তদুদ্দেশ্যে মাওলী নামক পার্বত্য জাতির কৃষকদের লইয়া একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল গড়িয়া তোলেন। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী বিজাপুরের অন্তর্গত তোরনা দুর্গ অধিকার করেন এবং ইহার অনতিদূরে রায়গড় নামে অপর একটি দুর্গ স্থাপন করেন।

তিনি মাওলী রাজ্য অধিকার করিয়া ১৬৫০ হইতে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোঙ্কনের উত্তরাংশে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইলেন। শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বিজাপুরের সুলতান সেনাপতি আফজল খাঁ-কে প্রেরণ করেন (১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ)। বিজাপুর বাহিনী শিবাজীকে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ)।

মুঘলদের সহিত সংঘর্ষ ঃ ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজীব সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া শিবাজীকে দমন করিবার নির্দেশ দিলেন। শিবাজী বিজাপুরের সুলতানের সহিত সন্ধি করিয়া সর্বশক্তি লইয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। শায়েস্তা খাঁ পুনা অধিকার করিলেও শিবাজী একদা রাত্রিতে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া শায়েস্তা খাঁর পুত্র ও প্রায় চল্লিশ জন অনুচরকে হত্যা করেন। শায়েস্তা খাঁ কোনমতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। শিবাজী মুঘল শিবির লুণ্ঠন করিয়া মারাঠা শক্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করিলেন (১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)। পর বৎসর তিনি সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করেন। ক্রুদ্ধ হইয়া ঔরঙ্গজীব শিবাজীকে দমন করিবার জন্য জয়সিংহ এবং দিলীর খাঁকে প্রেরণ করেন। জয়সিংহ পুরন্দর এবং রায়গড় অবরোধ করিলে অনন্যোপায় হইয়া শিবাজী জয়সিংহের সহিত সন্ধি করেন (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহাই পুরন্দরের সন্ধি নামে খ্যাত। এই সন্ধির শর্তানুসারে শিবাজী মুঘল সম্রাটের সামন্তরূপে মাত্র বারটি দুর্গ রাখিয়া বাকী সকল দুর্গ মুঘল সম্রাটকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। বিজাপুরের বিরুদ্ধে মুঘল সম্রাটকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতিও তাঁহাকে প্রদান করিতে হইল। দিল্লীতে তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। পরে অপূর্ব কৌশলে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পুরন্দরের সন্ধি

স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর শিবাজী রাজ্যের শাসন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে মনোযোগ দিলেন। ঔরঙ্গজীব শিবাজীকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু মুঘলের সহিত সন্ধি বেশীদিন স্থায়ী হইল না। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যে-সকল রাজ্য শিবাজী ঔরঙ্গজীবকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষিপ্রগতিতে পুনরুদ্ধার করিলেন। সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া শিবাজী সুরাটের 'চৌথ' দাবি করিলেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাসমারোহে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইল। তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করিলেন। জিঞ্জি, ভেলোর এবং মহীশূরের কোন কোন অংশ জয় করিয়া শিবাজী বিশাল এক স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিশ্বর হইলেন। তাহার রাজ্য উত্তরে সুরাটের নিকটস্থ ধরমপুর হইতে দক্ষিণে কারওয়ার (কানাড়া) এবং পূর্বে বালগামা হইতে কোলাপুর, আর পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পর্তুগীজ-

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক

শিবাজীর রাজ্য

অধিকৃত সলসেটি বেসিন গোয়া দমন প্রভৃতি বন্দরগুলি অবশ্য শিবাজীর শাসনাধীন ছিল না। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়।



শিবাজীর শাসনব্যবস্থা : নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও শিবাজী স্বৈরাচারী বা উৎপীড়ক শাসক ছিলেন না। তাঁহাকে শাসনকার্যে সাহায্য করিবার জন্য 'অষ্টপ্রধান' নামে পরিচিত মন্ত্রিপরিষদ ছিল। এই আটজন প্রধান হইল (১) 'পেশোয়া' (প্রধানমন্ত্রী), (২) 'অমাত্য' (রাজস্বসচিব), (৩) 'দবীর' বা 'সুমন্ত' (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) (৪) 'ওয়ানিয়ানবীশ' বা 'মন্ত্রী' (রাজকার্যের বিবরণ-লেখক), (৫) 'সচিব' (সরকারী পত্রাদির সংরক্ষক), (৬) 'সেনাপতি' (সমরসচিব

'অষ্টপ্রধান'

বা প্রধান সেনাধ্যক্ষ), (৭) 'ন্যায়াধীশ' (প্রধান বিচারক) এবং (৮) 'পণ্ডিত রাও' (রাজপুরোহিত)। 'ন্যায়াধীশ' ও পণ্ডিত রাও' ব্যতীত অপরাপর প্রধানগণকে সামরিক কর্তব্যও সম্পাদন করিতে হইত।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শিবাজী সমগ্র রাজ্যটিকে কয়েকটি 'প্রান্ত' বা প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রান্তকে আবার কয়েকটি 'তরফ' বা পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। শাসনকার্যের সর্বনিম্ন বিভাগ বা একক ছিল গ্রাম। প্রতিটি প্রদেশ একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে থাকিত। গ্রামের শাসনভার ছিল গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর। কয়েকটি গ্রামের কার্য পরিদর্শনের জন্য 'দেশমুখ' বা 'দেশপাণ্ডে' নামক একশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

প্রাদেশিক শাসন

শিবাজী রাজ্যের জমি জরিপ করাইয়া উৎপন্ন শস্যের দুই-পঞ্চমাংশ রাজকররূপে ধার্য করিয়াছিলেন। প্রজাগণ অর্থ বা শস্য দ্বারা রাজস্ব জমা দিতে পারিত। শিবাজীর রাজ্য হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা ছিল খুবই অল্প। এইজন্য শিবাজী পার্শ্ববর্তী রাজ্য হইতে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চৌথ হইল রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ, আর সরদেশমুখী রাজস্বের এক-দশমাংশ।

রাজস্ব ব্যবস্থা

চৌথ ও সরদেশমুখী

শিবাজী এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যদলে প্রায় চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক ছিল। ইহা ছাড়া বহু সংখ্যক হস্তী এবং উট ছিল। শিবাজীর কামানের সংখ্যা ছিল আশী। শুধু সৈন্যবাহিনীর গঠন নহে, তাহার মধ্যে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং তাহার পুনর্বিন্যাস শিবাজীর রণনৈপুণ্য ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। অশ্বারোহী সৈন্যদলকে তিনি 'বর্গীর' ও 'শিলাদার' নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যে সকল সৈন্য সরকার হইতে অশ্ব ও অস্ত্রাদি পাইত, তাহারা 'বর্গীর' এবং যাহারা নিজেদের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করিত, তাহারা 'শিলাদার' নামে পরিচিত ছিল। শিবাজী সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইলেও সেনাপতি নামক প্রধানের উপর সমর বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল। 'সর্ণবৎ' ছিলেন অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক। জায়গীরের পরিবর্তে নগদ বেতন দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত ছিল।

সামরিক ব্যবস্থা

'বর্গীর' ও 'শিলাদার'

শিবাজীর সৈন্যবাহিনী দক্ষতা এবং শৃঙ্খলাবোধের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। সৈন্যদলে ও সেনাপতিগণের মধ্যে সকল প্রকার বিলাসব্যসন নিষিদ্ধ ছিল। শিবিরে কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতে পারিতেন না। লুণ্ঠন বা যুদ্ধকালে নারী বৃদ্ধ বা শিশুর উপর উৎপীড়ন করিলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইত।

নিয়ম শৃঙ্খলা

সুরক্ষিত দুর্গ ছিল শিবাজীর সামরিক সংগঠনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শিবাজীর প্রায় ২৪০টি দুর্গ ছিল। প্রতি দুর্গে একাধিক, কোন কোন সময় তিন জন দুর্গরক্ষক থাকিতেন।

দুর্গ

শিবাজী নৌবহরের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পর্তুগীজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নৌবহর একান্ত অপরিহার্য ছিল। এইজন্য শিবাজী বিভিন্ন ধরনের পোত লইয়া একটি নৌবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন।

নৌবহর

শাসকরূপে শিবাজীর কৃতিত্ব ঃ শিবাজীর অভ্যুদয় মারাঠা শক্তির, তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ক্ষুদ্র এক জায়গীরদারের উপেক্ষিত সন্তান হইয়াও তিনি যে এক বিস্তীর্ণ স্বাধীন মারাঠা রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কৃতিত্বের অক্ষয় নিদর্শন। কিন্তু কেবলমাত্র রাজ্যবিজেতা বা সমরকুশল সেনানায়ক হিসাবেই নহে, সুদক্ষ শাসক সংগঠক পরধর্মসহিষ্ণু এবং আদর্শ চরিত্র হিসাবেও শিবাজীর নাম চিরদিন ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কাফি খাঁর মতো উগ্র সমালোচকও শিবাজীর চরিত্রের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঔরঙ্গজীবের দাক্ষিণাত্য যুদ্ধ ঃ গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর জয় প্রসঙ্গে ঔরঙ্গজীবের দাক্ষিণাত্য নীতির অনেকেই সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্বতন মুঘল সম্রাটদের নীতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। শিবাজীর মতো নব প্রেরণালব্ধ জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সুলতানীদের পক্ষে দমন করা সম্ভব ছিল না। শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্রাট রাজত্বের শেষ অর্ধেককাল দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে কাটাইয়াছেন। তাহার ফলে উত্তর ভারতের শাসন-শৃংখলা শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলা, অযোদ্ধা ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতের শাসন কর্তারা সম্রাটকে যুদ্ধের অর্থ যোগাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন। উপরন্তু জাঠ, শিখ ও সৎনামীগণের বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায় এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়।

সুদূর প্রসারী ফলাফল

ঔরঙ্গজীবের শাসন ব্যবস্থা ঃ ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের শেষভাগে আকবরের ১৫টি সুবার সংখ্যা বাড়িয়া ২১টিতে দাঁড়াইয়াছিল। শাসন ব্যবস্থা মোটামুটি আকবরের আমলের ন্যায়ই ছিল ; তবে ডঃ স্মিথের মতে, সেই প্রশাসনিক কাঠামোর উপর শেষ দিকে ঔরঙ্গজীবের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাঁহার আমল হইতে কৃষকদের খাজনা ইজারা দিয়া দিবার বন্দোবস্ত হয়। তাহার ফলে প্রজাদের উপর উৎপীড়ন বৃদ্ধি পায়।

আকবর প্রবর্তিত মনসবদারী প্রথা ঔরঙ্গজীবও অনুসরণ করিতেন। তবে তাহাতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত করিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য পূর্বেরই ব্যবস্থা অনুসৃত হইত। জেলার রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন 'আমলগুজার'। তাঁহার অধীনে অনেক কর্মচারী থাকিত। মোড়ল বা মোকাদ্দাম এবং পাটওয়ারি ছিলেন গ্রামের সেবক ; কানুনগো গ্রামের দেয় রাজস্বের হিসাব রাখিতেন। তাহা ছাড়া ছিলেন বিতিকৃছি নামে হিসাবপত্র লেখক এবং পোদ্দার নামে কোষাধক্ষ।

ঔরঙ্গজীবের সেনাবাহিনী ঃ মনসবদারী ব্যবস্থাই ছিল সেনাবাহিনীর ভিত্তি। ঔরঙ্গজীবের বাহিনীতে ছিল অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী। ঔরঙ্গজীবের আমলে গোলন্দাজ বাহিনী পূর্বের অপেক্ষা অনেক উন্নত ও নিপুণ হইয়াছিল। তাঁহার

নৌবাহিনীও বাংলায় ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। তাঁহার আমলে অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়া ২,৪০,০০০ হইয়াছিল।

ধর্মনীতি : এই সময়ে ঔরঙ্গজীবের ধর্মনীতিও তাঁহার ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ঔরঙ্গজীব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। তিনি ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া হিন্দুদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করিতেন। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করিয়া এবং তাহাদের উপর অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া তিনি অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। ইহার ফলে অচিরেই নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জাঠগণ মথুরায় ও বুন্দেলারা রাজা ছত্রশালের নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আলোয়াড়ের নিরীহ সৎনামী সম্প্রদায়ও বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। ঔরঙ্গজীবের সঙ্কীর্ণ ধর্মনীতির বিরোধিতা করায় শিখগুরু তেগ বাহাদুরকে হত্যা করা হয়। ইহার ফলে শিখসম্প্রদায়ের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল।

ঔরঙ্গজীবের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা রাজপুত জাতির অসন্তোষের কারণ হয়। রাণা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর মাড়বারের সিংহাসন লইয়া ঔরঙ্গজীবের সহিত রাজপুতদের মনোমালিন্য শুরু হয়। তিনি যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহের উত্তরাধিকার মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। মেবারের রাণা মাড়বারকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে রাজপুতদের বিরোধিতা জাতীয় সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করিল। ঔরঙ্গজীব মেবারের সহিত সন্ধি করিয়া রাজপুতদের ঐক্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াও মাড়বারের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর অজিত সিংহ মাড়বারের রাণা পদে অভিষিক্ত হইলে রাজপুত বিরোধিতার অবসান ঘটে।

ঔরঙ্গজীবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব : ঔরঙ্গজীবের দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী শাসনকাল ব্যর্থতার কাহিনীতে পূর্ণ। ধর্মান্ধতা, সন্দেহপ্রবণতা ও নিষ্ঠুরতাই তাঁহার ব্যর্থতার কারণ। তাহা না হইলে তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা, চতুরতা, ধর্মপ্রাণতা, সামরিক প্রতিভা, কর্মক্ষমতা প্রভৃতি তাঁহাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করিতে পারিত। কিন্তু তাঁহার ধর্মপ্রাণতা ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হইয়া ভারতব্যাপী বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জলিত করিল। তাহাতে তিনি দগ্ধ হইলেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যকেও ভস্মীভূত করিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। রাজপুত জাতির বিদ্রোহ এবং দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানের মূলে ছিল ঔরঙ্গজীবের অদূরদর্শিতা এবং ধর্মীয় অনুদারতা। 'দাক্ষিণাত্যের দুষ্টক্ষত' ঔরঙ্গজেব তথা মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বনাশ সাধন করিল। আকবরের উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতার ফলে যে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, ঔরঙ্গজীবের অনুদারতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ঔরঙ্গজীবের জীবনযাত্রায় সরলতা, কর্মক্ষমতা ও সামরিক প্রতিভা প্রশংসনীয় হইলেও বিভিন্ন সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য শাসনের যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ঔরঙ্গজীবের অনুসৃত নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

শাসক হিসাবে ঔরঙ্গজীব : পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং অপার চারিত্রিক শক্তি সত্ত্বেও শাসক হিসাবে ঔরঙ্গজীবকে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন ব্যর্থ। এই বিরাট মুঘল সাম্রাজ্যের উন্নতি যে সামগ্রিকভাবে সেই সাম্রাজ্যের প্রজাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির উপর নির্ভর করে, তাহা তিনি কদাচিৎ উপলব্ধি করিতেন। নিজ ধর্মের প্রতি গোঁড়ামিতে সাম্রাজ্যের অন্যান্য ধর্মের প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল। একনিষ্ঠ শ্রমক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় এবং নিরলস কর্মক্ষমতা থাকায় তিনি সাম্রাজ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতেন। তাহার ফলে স্থানীয় কর্মচারীদের আপন আপন বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগের উদ্যোগ হ্রাস পাইত। ইহার ফলে প্রশাসনিক কাঠামোতে অবনতি ঘটিতে থাকে। সম্রাটের সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফী খাঁ বলেন যে, শাস্তিদান হইতে তিনি বিরত থাকিতেন ; অথচ এত বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করিতে হইলে শাস্তিদান না করিলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য। অভিজাতদের মধ্যে দেখা দেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সুতরাং যে কোন সুস্থ প্রকল্পই তিনি গ্রহণ করুন না কেন তাহা আর সমাপ্ত হইত না।

ঔরঙ্গজীবের চরিত্রে বহু অসাধারণ গুণও ছিল। কিন্তু শাসক হিসাবে তিনি সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। তিনি সমর নিপুণ সেনাপতি হইলেও আদর্শ নেতা ছিলেন না। গভীর কূটনীতিজ্ঞ হইলেও ঔরঙ্গজীব মোটেও রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না। অনেকের মতে, তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব, তাঁহার মৃত্যুর-পরেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

ইউরোপীয় ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলির কার্যাবলী
[Activities of the European Trading Companies]

ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করিবার জন্য ইউরোপীয় বণিকগণের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া আগ্রহ দেখা দেয়। ইহারই ফলে ভারতে আসিবার জলপথ আবিষ্কৃত হয়।

জলপথ আবিষ্কারে পর্তুগীজগণই প্রথম সচেষ্ট হয়। বার্থ্যলোমু দিয়াজ নামক একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (১৪৮৭ খ্রীঃ)। কলম্বাসের ভারতে আসিবার প্রচেষ্টার ফলে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল। অবশেষে ভাস্কো-ডা-গামা নামক অপর একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হইলেন (১৪৯৮ খ্রীঃ)। এই পথ ধরিয়া পরবর্তীকালে ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ, দিনেমার প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। পর্তুগীজগণই প্রথমে ভারতে বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করেন। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে কালিকটে পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠী স্থাপিত হইল। কালিকটের জামেরিন উপাধিধারী রাজার নিকট হইতে তাহারা বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করিয়াছিল। কোচিন ও কালিকটের মধ্যে বিরোধে পর্তুগীজগণ অংশগ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠীর গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের

পর্তুগীজ : কালিকট

মধ্যে তিনি ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজ শাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আলবুকার্ক বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত করিয়া গোয়া অধিকার করেন। কালক্রমে গোয়া পর্তুগীজগণের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে দমন, দিউ, সলসেটি, বেসিন, বোম্বাই, চৌহল, হুগলী প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠী স্থাপিত হইল; কিন্তু লুণ্ঠন, অত্যাচার, বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করার ফলে পর্তুগীজগণ ভারতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতেই ওলন্দাজগণ পর্তুগীজ উপনিবেশ অধিকার করিতে আরম্ভ করে। মারাঠাগণও সলসেটি ও বেসিন অধিকার করিয়াছিল। অবশেষে গোয়া, দমন ও দিউ ব্যতীত অপর সকল উপনিবেশ ও বাণিজ্যকুঠীগুলি একের পর এক তাহাদের হাতছাড়া হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জাতীয় সরকার এই অঞ্চল-তিনটি অধিকার করিয়া ভারতের বুক হইতে পর্তুগীজ অধিকারের চিহ্ন বিলুপ্ত করে (১৯৬২ খ্রীঃ)। বর্তমানে গোয়া ভারতের ২৫-তম অঙ্গ রাজ্য।

ওলন্দাজগণ

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওলন্দাজগণ সুরাটে এবং কালিকটে বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করে। তবে ওলন্দাজগণ সুমাত্রা, জাভা, মলাক্কা প্রভৃতি অঞ্চলের লাভজনক মশলা-ব্যবসায়ের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। পর্তুগীজদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যলাভ করিলেও ইংরাজদের সহিতপ্রতিযোগিতায় তাহারা পরাজিত হইল। ভারতে ওলন্দাজগন কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঃ ভারতে ব্যবসাবাণিজ্য করিবার জন্য ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথ (প্রথম) এই কোম্পানীকে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করেন। ইতিহাসে এই কোম্পানীকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে অভিহিত করা হয়।

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্য হকিন্স ভারতে আসেন। কিন্তু তাঁহার দৌত্য বিশেষ সাফল্য লাভ করিল না। পরে স্যার টমাস রো ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের দূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। রো-র চেষ্টায় ইংরাজগণ গুজরাট অঞ্চলে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। সুরাটে ইংরাজ কুঠী স্থাপিত হইল। ধীরে ধীরে আগ্রা, মাদ্রাজ (ফোর্ট সেন্ট জর্জ), পাটনা, হুগলী, কাশিমবাজার, হরিপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ বাণিজ্যকুঠী স্থাপিত হইতে থাকে। পর্তুগীজ রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া ইংল্যাণ্ডের রাজা বোম্বাই শহরটি যৌতুক লাভ করেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বোম্বাই বিক্রয় করিয়া দেন। ফলে বোম্বাইতেও ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপিত হয়। প্রথমে সুরাটে ছিল ইংরাজদের প্রধান বাণিজ্যকুঠী। এখন হইতে বোম্বাই সে স্থান অধিকার করিল।

বাংলাদেশের ঐশ্বর্য ইংরাজকে আকৃষ্ট করিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তখন একজন সুবাদারের শাসনাধীন ছিল। এই অঞ্চলে ইংরাজদের বাণিজ্যকুঠী ছিল হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার, হরিপুর এবং বালেশ্বর। ইংরাজ বাণিজ্যের কেন্দ্র ধীরে ধীরে পশ্চিম হইতে পূর্বাঞ্চলে সরিয়া আসিতে থাকে। মাদ্রাজ হইল এই অঞ্চলের বাণিজ্যকুঠীগুলির প্রধান ঘাঁটি।

বাণিজ্য শুল্ক লইয়া ইংরাজদের সঙ্গে মুঘল সরকারের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। শাহজাহানের রাজত্বকালে ইংরাজদিগকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা শুল্ক দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহার অতিরিক্ত শুল্ক দাবি করা হইতে থাকে। শায়েস্তা খাঁ অবশ্য ইংরাজদিগকে বর্ধিত হারে শুল্কের হাত হইতে অব্যাহতি দেন। কিন্তু স্থানীয় কর্মচারীগণ এই দাবি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিল না। ইংরাজগণ তখন আত্মরক্ষার জন্য হুগলীতে দুর্গ নির্মাণ করে, কিন্তু মুঘল সৈন্য ইহাতে ইংরাজদিগকে হুগলী হইতে বিতাড়িত করিল। ঔরঙ্গজীব ইংরাজদিগকে দমন করিবার কঠোর নির্দেশ দিলেন। ভীত হইয়া ইংরাজগণ দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া মুঘল দরবারের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল (১৬৯০ খ্রীঃ)। ঔরঙ্গজীব ইংরাজদিগকে বাংলায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিলেন।

মুঘলের ভয়ে ইংরাজগণ বাংলা ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছিল। সন্ধির পর তাহারা বাংলায় ফিরিয়া আসিল। এই সময়ই হুগলীর বাণিজ্যকুঠীর অধিনায়ক জব চার্নক কলিকাতা নগরীর গোড়াপত্তন করেন (১৬৯০ খ্রীঃ)। কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনখানি গ্রাম লইয়া গড়িয়া উঠিল বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতা। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই তিনখানি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব লাভ করে এবং 'ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ' নির্মাণ করিয়া ইহার রক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করিয়া তোলে। ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারেই কলিকাতার দুর্গের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। মাদ্রাজ বোম্বাই ও কলিকাতা—এই তিনটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল। এই তিনটি কেন্দ্রের একজন করিয়া প্রেসিডেন্ট থাকিতেন বলিয়া এগুলি প্রেসিডেন্সী নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

রানী এলিজাবেথের সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পনেরো বছরের জন্য প্রাচ্যদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিল। রাজা প্রথম জেম্‌স এই কোম্পানীকে স্থায়ীভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করেন। পরবর্তীকালে এই কোম্পানী মুদ্রা, দুর্গনির্মাণ এবং ভারতীয় রাজাদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার অধিকারও লাভ করে। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে 'ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে আর একটি কোম্পানী গঠিত হয়। কিছুদিন দুই কোম্পানী পৃথকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার পর দুই কোম্পানী একত্রিত হইয়া 'ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া' গঠিত হইল। এই কোম্পানী পরিচালনার ভার ২৪ জন সদস্য বিশিষ্ট এক পরিচালক সভা বা বোর্ড অফ ডিরেক্টরের উপর অর্পিত হইল। এই সম্মিলিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

পর্তুগীজ, ইংরাজ এবং ওলন্দাজগণ ভারতে বাণিজ্যকুঠী স্থাপনের পর দিনেমার, ফরাসী এবং সুইডিশ বাণিজ্যিকদলও ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আগমন করে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ফরাসী ব্যতীত অপর কোন জাতি ভারতে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ফ্রান্সের রাজা তখন চতুর্দ্দশ লুই ; তাঁহার মন্ত্রী কোলবার্ট

(Colbert) ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে সুরাটে (১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) এবং পরে মসলিপত্তমে (১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) কুঠী স্থাপন করে। ইহার চারি বৎসর পর পণ্ডিচেরী নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে পণ্ডিচেরীই ফরাসী বাণিজ্য অধিকারের কেন্দ্র হইয়া ওঠে। বাংলাদেশে হুগলীর নিকট চন্দননগরে ফরাসী বাণিজ্যকুঠী স্থাপিত হয় ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পর কারিকল ও মাহে ফরাসী বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যতীত রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করায় ফরাসী ও ব্রিটিশ কোম্পানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ইংরাজগণই জয়লাভ করে আর ফরাসীগণকে পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে, চন্দননগর ও ইয়ানানের অধিকার লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। স্বাধীনতা লাভের পর এই অঞ্চলগুলি ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ফরাসী বণিকদল

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ব্যবসা-বাণিজ্যে পর্তুগীজদের অংশ প্রায় শূন্যে দাঁড়াইয়া যায়। ততদিনে ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানী নীল, ক্যালিকো অন্যান্য বস্ত্রাদি পশ্চিম উপকূল হইতে চালান দিতে পারায় করমণ্ডল উপকূলই গুজরাটের বস্ত্র রপ্তানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ওঠে। অবশেষে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলায় সবকটি ইউরোপীয় কোম্পানীর ঘাঁটি হইলে সেখান হইতে বস্ত্রাদির সহিত রেশম, চিনি এবং সোরা ও লবণ চালান আরম্ভ হয়। ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানীরা নূতন নূতন বাজার খুলিয়া ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা ভীষণভাবে বাড়াইয়া দিয়াছিল।

৩ | মুঘল শাসনে ভারত
[India under the Mughals]

রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ঃ সম্রাট অশোক, আলাউদ্দীন খলজী এবং মহম্মদ বিন তুঘলকের পরে মুঘল যুগেই ভারতের অধিকাংশ জুড়িয়া রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত প্রভুদের দমন করিয়া সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক আইন প্রবর্তন করিয়া একই শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা সে ঐক্য সুদৃঢ় করা হয়। আকবর আপন প্রতিভাবলে সেই ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যকে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আকবরের আমলের কাবুল-কান্দাহার হস্তচ্যুত হইবার পর ভারতের অধিকাংশ লইয়া মুঘলদের সন্তুষ্ট থাকিতে হওয়ায় তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও ভারতীয় রূপ লইতে আরম্ভ করে। এই ঐক্যবোধ আরও সুদৃঢ় হইয়াছিল প্রায় দুই শত বৎসরের একটানা শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অর্থনীতি ও উন্নত মানের সমাজ এবং শিল্প সাহিত্যের জীবনের জন্য। রাজনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি যে দৃঢ় সংঘবদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো, তাহাও মুঘল সম্রাটগণ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ ভারতে মুঘল শাসন দিল্লীর সুলতানদের শাসন-ব্যবস্থা হইতে পৃথক ছিল এবং তাহার কাঠামো রচনার কৃতিত্ব প্রধানত আকবরের। মুঘল সরকার ছিল ভারতীয় এবং ভারতাতীত বহু উপাদানে গঠিত। ডঃ মজুমদারের মতে—ইহা ছিল ভারতীয় প্রেক্ষাপটে পারসিক-আরবীয় পদ্ধতি। মুঘল শাসনব্যবস্থা মূলত ছিল সামরিক প্রকৃতির। এই রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মচারীকেই সামরিক বাহিনীতে নাম লিখাইতে হইত। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রটি ছিল কেন্দ্রীভূত স্বৈরতান্ত্রিক এবং রাজার ক্ষমতা ছিল অসীম। তাঁহার বাণীই ছিল আইন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে তর্ক করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। মন্ত্রীসভা থাকিলেও তাঁহারা রাজার ইচ্ছানুগত ছিলেন। অবশ্য প্রায় ছয়জন মুঘল সম্রাটকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী বলা চলে।

মনসবদার

কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত ছিল মনসবদারী ব্যবস্থা। তাঁহারা একাধারে ছিলেন 'সামরিক বাহিনী, আমীর ওমরাহ এবং অসামরিক প্রশাসক'। মনসবদারী প্রথা বংশগত ছিল না। সেইজন্য কাহারও মৃত্যুর পর অন্যকে নিয়োগের কর্তৃত্ব থাকিত সম্রাটেরই উপর। পূর্বের জায়গীর প্রথার পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটাইয়াও কেন্দ্রীয় কর্তৃক সাম্রাজ্যে সুদৃঢ় করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। প্রদেশগুলি শাসনের জন্য সুবেদার ও দেওয়ান নিয়োগের ব্যবস্থায় পারস্পরিক শক্তি সামর্থ্য বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও বিভাগীয় কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট

করিয়া দেওয়ায় কেন্দ্রের প্রভাব সুদৃঢ় হইত। মুঘল সাম্রাজ্যের পুলিশী ব্যবস্থাও এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক ছিল।

মুঘল শাসক ও জায়গীরদার ঃ মধ্যযুগের শাসকগোষ্ঠী গঠিত হইত অভিজাতবর্গ বা মনসবদার এবং ভূম্যধিকারী জমিদার বর্গকে লইয়া। আর্থিক ও সামাজিক উভয়ভাবেই মুঘল অভিজাতবর্গ ছিল একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী। আকবরের যুগ হইতে হিন্দুরাও অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে অভিজাতগোষ্ঠীর নিয়মমাফিক পদোন্নতি, নিয়মশৃঙ্খলা বিধান এবং দক্ষ কর্মচারী নিয়োগের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইত। ভারতের সুখশান্তি দেখিয়া মধ্য এশিয়া হইতে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি ভারতে আসিয়া আপন কর্ম নৈপুণ্যে অভিজাত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইত। শাহজাহান ও ঔরঙ্গজীবের আমলে অনেক মারাঠীও অভিজাত গোষ্ঠীতে গৃহীত হইয়াছিল। সকলের ধারণা যে, মনসবদারদের মৃত্যু হইলে তাহাদের সকল সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। কিন্তু সতীশ চন্দ্র এন. সি. ই. আর. টি গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, তাহা নহে। অবশ্য অভিজাতের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার ধনসম্পত্তির খুঁটিনাটি হিসাব করা হইত। তাহার পর সরকারের পাওনা থাকিলে তাহা কাটিয়া বাদবাকি সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তবে সে সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার বিচার করিতেন সম্রাট স্বয়ং। শাসকগোষ্ঠীর অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতেন। শিল্প-সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন অনেকে।

জায়গীরদার

ঔরঙ্গজীবের আমলে মনসবদারী প্রথা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পারস্পরিক ঈর্ষা-দ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং জায়গীরদারী ব্যবস্থাতেও সঙ্কট উপস্থিত হইলে সাম্রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়ে। রাজকর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জায়গীর লাভ করিতেন। পদমর্যাদা অনুপাতে জায়গীরের পরিমাণ নির্ধারিত হইত। পূর্বতন জায়গীর প্রথা পরিবর্তন করিয়া আকবর অধিকাংশ জায়গীর জমি খাস করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী মুঘল সম্রাটের আমলে ধীরে ধীরে জায়গীর-দারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইতিমধ্যে মুঘল শাসনে জমিদারী প্রথা প্রবর্তিত হয়। ভারতে পূর্ব হইতেই কৃষকগণ জমির মালিক ছিল। কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া জমিদারগণ মুঘল সরকারে একাংশ পাঠাইত। তাহারা জমির মালিক ছিল না। জমিদারদের উপরে ছিলেন রাজা। রাজা ও জমিদারদের উপর স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব অর্পিত হইত।

রাজস্ব ব্যবস্থা

রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারেও আকবর স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন টোডরমল। অবশ্য রাজস্বসংক্রান্ত সংস্কার-প্রবর্তনে আকবর কোন কোন ক্ষেত্রে শেরশাহ্ প্রবর্তিত পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন। সুদক্ষ রাজস্বসচিব টোডরমলের সহায়তায় রাজ্যের জমি জরিপ করা হয়। তিনি প্রজার জমির সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। উর্বরতা অনুসারে জমিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করিয়া দেন। খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হইত। উৎপন্ন ফসলের

এক-তৃতীয়াংশ রাজকররূপে ধার্য করা হইত। ফসল বা তাহার মূল্য দ্বারা খাজনা দেওয়া চলিত। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমলের রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কার অনুসারে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপে রাজস্ব ব্যবস্থা চালু হয়। কাবুলে এবং কাশ্মীর ও সিন্ধুর কোন কোন অংশে 'গল্লাবক্স' রীতি অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হইত। বাংলাদেশে জমি জরিপ করা সম্ভব না হওয়ায় পুরানো কাগজ পত্রানুসারে রাজস্ব ধার্য করা হইত। এই ব্যবস্থা 'নাসক' নামে পরিচিত ছিল।

ঔরঙ্গজীবের সময়ে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে মুর্শিদকুলী খাঁ নানা প্রকার পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি জমির উর্বরতা, জলসেচের ব্যবস্থা, কৃষিকার্যের সুবিধা প্রভৃতি দিক বিচার করিয়া খাজনা ধার্য করিতেন। বাংলাদেশের শাসনকর্তারূপে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলাদেশের রাজস্বনীতির নানারূপ সংস্কার করিয়াছিলেন।

মুঘলযুগে ধর্ম ও সমাজ জীবন: জীবনযাত্রার মান অনুসারে সমাজে প্রধানত তিনটি শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়। অভিজাতগণ সম্রাটের অনুকরণে বিলাসব্যসনে লিপ্ত থাকিতেন। মদ্যপান তাহাদের একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত (escheat) করার নীতি বলবৎ থাকায় অভিজাতগণ ভোগ সুখে অর্থ অপচয় করিতেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

ব্যবসায়ী, শিল্পী প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত লোক ছিল মধ্যবিত্ত। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর দোষত্রুটি মধ্যবর্তী শ্রেণীর মধ্যে দেখা যাইত না। কোন কোন ব্যবসায়ীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইলেও সরকারী কর্মচারীদের ভয়ে নিজেদের আয় গোপন করিয়া দরিদ্রভাবে জীবনযাপন করিত। শ্রমিক ও কৃষকগণ অতি সাধারণ-ভাবে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইত। তাহাদের আয় ছিল অতি সামান্য। শ্রমিক, গৃহভৃত্য, ক্ষুদ্র দোকানদার প্রভৃতি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত লোকের জীবন ক্রীতদাসের জীবনাপেক্ষা বিশেষ উন্নত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মুঘল রাজ-কর্মচারীদের অত্যাচারে ইহারা অনেক সময় বিশেষ উৎপীড়িত হইত।

সাধারণ শ্রেণী

ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান

সম্রাট আকবরের পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং উদার শাসননীতি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের ভাবধারা এবং আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানের এবং মুসলমান হিন্দুর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিত। আকবর তাঁহার হিন্দু পত্নীদিগের দেবদেবী পূজা-অর্চনায় কখনও বাধাদান করেন নাই। তিনি হিন্দু সাধুসন্ত এবং মুসলমান পীর-পয়গম্বর উভয়ের প্রতিই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণের, বিশেষত ঔরঙ্গজীবের, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন কিছুটা শিথিল করিয়াছিল।

তৎকালীন হিন্দু ও মুসলিম সমাজে নানা প্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। মন্ত্রতন্ত্র ও আভিচারিক ক্রিয়াকলাপে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই বিশ্বাস করিত। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। আকবর বাল্য-বিবাহ ও সতীদাহ

প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বিবাহে পণপ্রথা ও সমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত ছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ মুঘল যুগে দেশে আর্থিক অবস্থা সচ্ছলই ছিল। অবশ্য সমাজে সম্পদের অধিকাংশই ভোগ করিতেন সম্রাট ও অভিজাতগণ। কৃষিই ছিল অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা এবং দেশের প্রধান সম্পদ। কৃষকের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। তাহাদের নিজস্ব জমিজমা ছিল খুবই সামান্য। জলসেচ বা জলনিকাশের তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে কৃষিকার্য বিশেষ ব্যাহত হইত। অনেক সময় দুর্ভিক্ষও দেখা দিত। বিভিন্ন খাদ্যশস্য, কার্পাস, তুঁত, নীল, তামাক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

কৃষি

কৃষি ভিন্ন শিল্পেও বহুলোক নিযুক্ত ছিল। কুটিরশিল্পই ছিল প্রধান। সরকার পরিচালিত শিল্পসংস্থায় প্রধানত সম্রাট ও অভিজাতদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইত। বয়নশিল্পে ভারত, বিশেষত বাংলা, তখন বিশেষ উন্নত ছিল। সূতী রেশমী পশমী বস্ত্রাদি এবং সূক্ষ্ম মসলিন প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট ধরনের বস্ত্র এবং শাল গালিচা প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইত। বার্নিয়ের বলিয়াছেন—বাংলাকে কেবলমাত্র মুঘল সাম্রাজ্যের নয়, পার্শ্ববতী রাজ্যসমূহ এবং ইউরোপের কার্পাস ও রেশমের ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। ঢাকার মসলিনের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বয়নশিল্প ব্যতীত বিহারের সোরা এবং গোলকুণ্ডার লৌহ উৎপাদনের শিল্প ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রমশিল্প



আগ্রার দুর্গ

দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার হইলেও বহির্বাণিজ্য প্রধানত ইউরোপীয় বণিকগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। ভারতীয় পণ্য, বিশেষত সূতী ও রেশমী বস্ত্র সোরা, নীল প্রভৃতি রপ্তানি করিয়া ইউরোপীয় বণিকগণ বিশেষ লাভবান হইতে লাগিল। সুরাট, গোয়া, কোচিন, মসলিপত্তম, সাতগাঁও, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও প্রভৃতি বন্দর তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর, রৌপ্যমুদ্রা, জিতল

ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রভৃতি নানা ধরনের মুদ্রার প্রচলন ছিল। সম্ভবত, দেশের উর্বরতা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্যের জন্যই জিনিসপত্রের দাম কম ছিল। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, উৎপাদনকারীরা অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায্য মূল্য পাইত না।

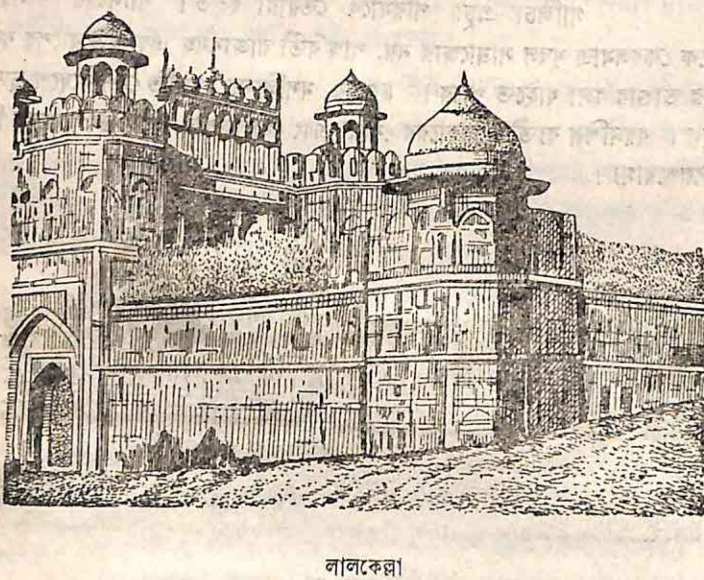
বাবরের স্বল্পস্থায়ী শাসনকালেও কয়েকটি মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। হুমায়ুনও শিল্পানুরাগী ছিলেন। শের শাহ্‌ পরিকল্পিত সাসারামে তাঁহার সমাধিভবনটি হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট স্থাপত্যশিল্পের একটি নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আকবরের

বাবর : হুমায়ুন

সুদীর্ঘ শাসনকালে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা দেয়, শিল্পক্ষেত্রেও তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। আকবর নির্মিত দুর্গ, প্রাসাদ, প্রমোদোদ্যান প্রভৃতি স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন

আকবর

করিতেছে। তাঁহার নির্মিত ফতেপুর সিক্রি এবং সেখানকার 'বুলান্দ দরওয়াজা', 'জাম-ই-মসজিদ', 'যোধবাঈ মহল', 'পাঁচ মহল', 'সলিম চিশ্‌তির সমাধি সৌধ' শিল্পোৎকর্ষের অপূর্ব নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে



লালকেল্লা

রক্তপ্রস্তরে-নির্মিত হর্ম্যাবলী এবং দুর্গের প্রধান তোরণ 'দিল্লী দরওয়াজা' আকবরের শিল্পপ্রীতির পরিচায়ক।

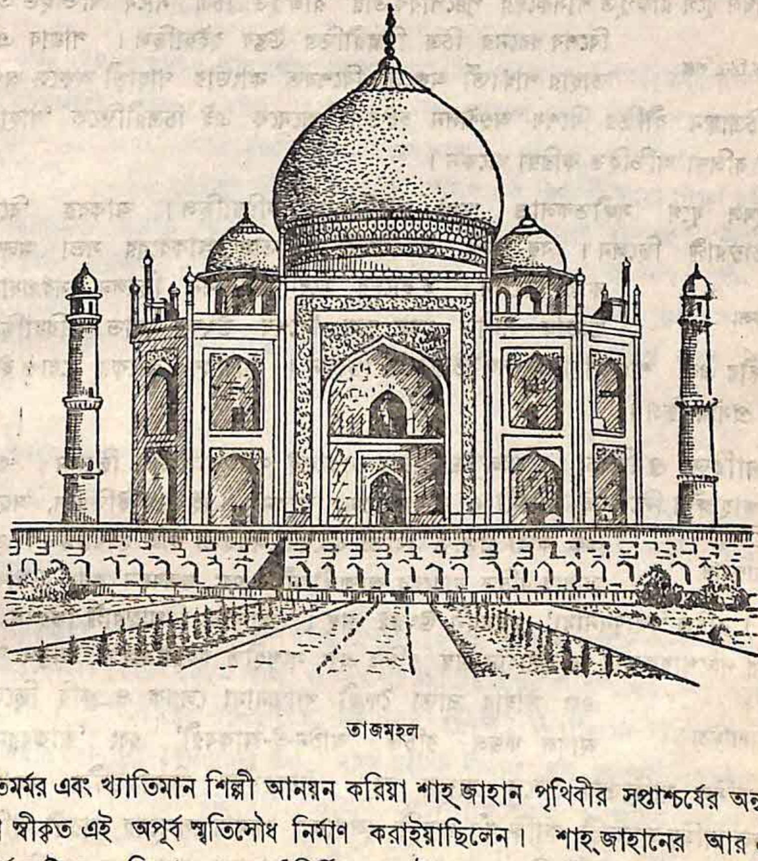
জাহাঙ্গীরও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজে চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত 'মুঘল মিনিয়েচার' তাঁহার যুগেরই অবদান। তাঁহার

জাহাঙ্গীর

সময়ে সেকেন্দ্রায় নির্মিত 'আকবরের সমাধিভবন' 'ও 'ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধি সৌধ' মুঘল সম্রাটের শিল্পানুরাগের পরিচায়ক।

মুঘল সম্রাটগণের মধ্যে শাহ্‌জাহানের মতো আড়ম্বরপ্রিয় ও শিল্পানুরাগী কেহই ছিলেন না। শাহ্‌জাহানের দরবারের জাঁকজমক এবং হর্ম্যাবলীর অপূর্ব সৌন্দর্য সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটকগণকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া তুলিত। শাহ্‌জাহানের সময়ে আগ্রার দুর্গে নির্মিত 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস,' 'কাচ বা শীষমহল' ও 'মোতি মসজিদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সময়ে নির্মিত অট্টালিকাসমূহের অধিকাংশই মর্মরপ্রস্তর নির্মিত। দিল্লীর 'লাল কেল্লা' যমুনাতীরে অবস্থিত। ইহার অভ্যন্তরে 'দেওয়ান-ই-আম' ও 'দেওয়ান-ই-খাস' সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শাহ্‌জাহানের শিল্পানুরাগের অক্ষয় স্বাক্ষর বহন করিতেছে আগ্রার যমুনাতীরে অবস্থিত 'তাজমহল'। পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত এই অপূর্ব সৌধভবন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি হিসাবে আজিও স্বীকৃত। দেশবিদেশ হইতে

শাহ্‌জাহান



তাজমহল

শ্বেতমর্মর এবং খ্যাতিমান শিল্পী আনয়ন করিয়া শাহ্‌জাহান পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম-রূপে স্বীকৃত এই অপূর্ব স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানের আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি ময়ূর সিংহাসন। স্বর্ণ নির্মিত চারটি পদ এবং মণিমাণিক্য-খচিত দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর কারুকার্যমণ্ডিত চন্দ্রাতপ ময়ূর সিংহাসনের শোভা বর্ধন করিয়াছিল। প্রতিটি স্তম্ভশীর্ষে উজ্জ্বল মণিমাণিক্যে শোভিত এক জোড়া ময়ূর। ভারত অভিযানের পর নাদির

শাহ্ এই অপূর্ব শিল্পকীর্তি এবং শাহ্‌জাহানের মুকুটের বহুমূল্য কোহিনুর মণি পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন (১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

ঔরঙ্গজীব ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত গোঁড়া মুসলমান। শিল্পানুরাগ বা আড়ম্বরপ্রিয়তা তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার সময় উল্লেখযোগ্য কোন সৌধ বা মসজিদ নির্মিত হয় নাই।

ঔরঙ্গজীব

মুঘল যুগে শুধু স্থাপত্য নয়, চিত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আকবর চিত্রশিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্থাপত্যশিল্পের ন্যায় চিত্রশিল্পেও ইন্দো-ইস্‌লামী শিল্পরীতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। জাহাঙ্গীরের সময় চিত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

চিত্রশিল্প

মুঘল যুগে রাজপুত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাজপুত চিত্র' নামে অভিহিত এক বিশেষ ধরনের চিত্র শিল্পরীতির উদ্ভব হইয়াছিল। পাঞ্জাব এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, বিশেষত কাংড়ার পাহাড়ী অঞ্চলে অপর এক চিত্রাঙ্কন রীতির বিশেষ অনুশীলন হইত। অনেকে এই চিত্ররীতিকে 'পাহাড়ী রীতি' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

রাজপুত চিত্রশিল্প

মুঘল যুগে সঙ্গীতকলাও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। আকবর বিশেষ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। বহু দেশী ও বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞ আকবরের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তানসেন ছিলেন সর্বপ্রধান। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মুঘল যুগে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর এবং শাহ্‌জাহানও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যেও ইহার যথেষ্ট প্রসার ছিল।

সঙ্গীতকলা

সাহিত্য ও শিক্ষা ঃ মুঘল সম্রাটগণের সকলেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বাবর এবং জাহাঙ্গীর নিজেরাই জীবনী ও কাব্য রচনা করেন। এই যুগে ইতিহাস, অনুবাদ এবং কাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল। তুর্কী ভাষায় রচিত 'বাবরের আত্মজীবনী' এবং গুলবদন বেগম (বাবরের কন্যা) রচিত 'হুমায়ুননামা' দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। আকবর বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত এবং সংগৃহীত হইয়াছিল। আবুল ফজল এবং তাঁহার ভ্রাতা ফৈজী খ্যাতনামা লেখক ও কবি ছিলেন। আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' এবং 'আকবরনামা' ঐতিহাসিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমূল্য রত্ন। এতদ্ব্যতীত নিজামউদ্দীন বদাউনী, আবদুল হামিদ লাহোরী, কাফি খাঁ প্রভৃতি লেখকের রচনায় সে যুগের ফারসী সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আকবরের চেষ্টায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসী ভাষা অনুবাদ করা হয়। শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকো ফারসী ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ করিয়া তৎকালীন সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

ফরাসী সাহিত্য

ঔরঙ্গজীবের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' নামক মুসলমান আইনগ্রন্থ রচিত হয়। মুঘল যুগে শুধু ফারসী ভাষা নহে, হিন্দী, মারাঠী, গুরুমুখী এবং বাংলাভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আকবরের সভাসদ সুবিখ্যাত হাস্যরসিক বীরবল হিন্দী ভাষায় সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য রত্ন তুলসীদাসের রামায়ণ 'রামচরিত মানস' এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। সুরদাসের ভজনাবলীও এই সময়ে রচিত হয়। মুঘল যুগের প্রথম দিকে জয়সী হিন্দী ভাষায় 'পদ্মাবৎ' কাব্য রচনা করিয়া হিন্দী সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। মারাঠী ভাষার উন্নতিসাধনে তুকারামের ভক্তিমূলক গীতি এবং রামদাসের রচনাবলী বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। পাঞ্জাবে গুরুমুখী ভাষার প্রবর্তন হয় এবং এই ভাষায় শিখদের আদিগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' এবং গোবিন্দ সিংহের গ্রন্থাবলী রচিত হয়। বাংলাভাষায় কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং কাশীরামদাসের 'মহাভারত', এই যুগেরই রচনা।

হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার উন্নতি

মুঘল যুগে বর্তমানের ন্যায় কোন শিক্ষাব্যবস্থা না থাকিলেও শিক্ষাদানের জন্য মক্তব টোল ও মাদ্রাসা ছিল। মক্তব বা মাদ্রাসায় মুসলমানগণ আর টোল বা হিন্দু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে (পাঠশালায়) হিন্দুগণ শিক্ষালাভ করিত। হিন্দুগণ সরকারী চাকরি লাভের জন্য ফারসী ভাষা শিক্ষা করিত। মুসলমানগণের মধ্যেও অনেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। ঔরঙ্গজীব বহু মক্তব মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। মুঘল যুগে নারীশিক্ষাও অপ্রচলিত ছিল না। এই প্রসঙ্গে বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ও শাহ্‌জাহানের কন্যা জাহানারার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থা

বৈদেশিক পর্যটকদের দৃষ্টিতে শাসক ও সমাজ: বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া মুঘল যুগে বহু ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণ মুঘল যুগের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য উপাদান বিশেষ।

আকবরের রাজত্বকালে র‍্যালফ্ ফিচ্ নামে একজন ইংরাজ পর্যটক ভারতে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণ হইতে আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির ঐশ্বর্য ও সম্পদের কথা জানিতে পারা যায়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে উইলিয়ম হকিন্স (William Hawkins) ও স্যার্ টমাস রো (Sir Thomas Roe) নামে দুইজন ইংরাজ এবং পেলসার্ট (Palsaert) নামে একজন ওলন্দাজ ভ্রমণকারী ভারতে আসিয়াছিলেন। হকিন্সের বিবরণ হইতে মনসবদারী প্রথা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য জানা যায়। তিনি সম্রাটের ঐশ্বর্য এবং জাঁক-জমকেরও যেমন উল্লেখ করিয়াছেন, তেমনি বলিয়াছেন—রাজকর্মচারীগণ অত্যাচারী ছিলেন, পথঘাট নিরাপদ ছিল না। টমাস রো ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূত

হিসাবে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন। তাহার বিবরণে সম্রাটের ঐশ্বর্য এবং কর্মচারীগণের অত্যাচার উৎপীড়নের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাটের কার্যাবলী—সকল বিষয় সম্বন্ধে তথ্য রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, সম্রাট সপ্তাহে একদিন স্বয়ং প্রজাদের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। পেলসার্ট বলিয়াছেন, দেশের জমির উর্বরতা সত্ত্বেও, রাজকর্মচারীদের উৎপীড়নের ফলে, কৃষিকার্যে আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। শ্রমিক ও দোকানদারগণ রাজকর্মচারীদের নিকট অর্ধমূল্যে জিনিস বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়

তাভার্নিয়ের (Tavernier) নামক জনৈক ফরাসী বণিক এবং বার্নিয়ের (Bernier) নামক একজন ফরাসী চিকিৎসক শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। বার্নিয়ের ঔরঙ্গজীবের সময়েও কিছুদিন ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

অর্থনীতি

তাভার্নিয়ের বিবরণ হইতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি রেশম শিল্পের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। মুঘল সম্রাটের ঐশ্বর্য তাঁহাকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। সপ্রশংসভাবে তিনি সম্রাটের মণিমুক্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বার্নিয়ের কর্তৃক প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের অত্যাচার এবং কৃষির দুরবস্থার কথা বহু উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, বাংলাদেশ বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে পৃথিবীর স্বর্ণ-রৌপ্যাদি আসিয়া ভারতে জড় হইত। কিন্তু তিনি মুঘল সম্রাটের ব্যয় বাহুল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। মানুচী নামক একজন ইটালীয় পর্যটক ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে দীর্ঘদিন ভারতে ছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে তথ্য সংগ্রহে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। অনেকক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়াই তথ্যাদি পরিবেশন করিয়াছেন। কাহিনীর সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি দিল্লীর সম্রাটের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যেমন নানা বিবরণ দিয়াছেন, তেমনি কিন্তু জনসাধারণের দুঃখদৈন্যের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকাল






তৃতীয় খণ্ড

আধুনিকযুগ






১ মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি ও ভাঙ্গন
[Decline and Disintegration of Mughal Empire]

যে মুঘল সাম্রাজ্য দুই শতাব্দী ধরিয়া সমসাময়িক বিশ্বের ঈর্ষাস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তাহার অবনতি ও ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছিল। মুঘল সম্রাটের সকল গৌরব ও মর্যাদার যেমন অবসান ঘটিয়াছিল, তেমনি সারা ভারতব্যাপী মুঘল সাম্রাজ্যও সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল দিল্লীর কয়েক বর্গমাইলের মধ্যেই। অবশেষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী শহরটিও ব্রিটিশবাহিনী কর্তৃক বেদখল হইয়া যায় এবং গর্বোদ্ধত মুঘল সম্রাট এক বিদেশী শক্তির অবসরভোগীতে পরিণত হন।

ঔরঙ্গজীবের সময়েই আরম্ভ ঃ সাম্রাজ্যের ঐক্য ও স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হইয়া ওঠে ঔরঙ্গজীবের দীর্ঘ ও শক্তিশালী রাজত্বকালেই। তথাপি তাঁহার বহুবিধ ক্ষতিকর নীতি সত্ত্বেও মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা ঔরঙ্গজীবের পুত্র বাহাদুর শাহের মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিল এবং মুঘল রাজবংশ দেশব্যাপী যথেষ্ট মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করিত।

সাম্রাজ্যের সমস্যা

ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তিন পুত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটে, তাহাতে ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বল্পস্থায়ী রাজত্বে মুঘল শাসনে ভাঙ্গন ধরে নাই। তবে তাঁহার ভ্রান্ত নীতিতে অম্বর ও মারওয়াড়ের রাজপুতগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। তিনি মারাঠা সরদারদেরও প্রীতি অর্জন করিতে সক্ষম হন নাই। শাহুকে মারাঠাদের রাজারূপে স্বীকৃতি না দিয়া তিনি মারাঠাদের মধ্যে বিক্ষোভ জীয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। মারাঠাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দাক্ষিণাত্যে অশান্তি দেখা দেয়।

যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে অর্থাভাব ঃ একটানা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ঔরঙ্গজীবের দাক্ষিণাত্য-বাস হইতেই রাজকোষে অর্থাভাব দেখা দিয়াছিল ; এমন-কি সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহনও কঠিন হইয়া পড়ে। বাহাদুর শাহের আমলে অর্থাভাব আরও নানা কারণে বাড়িয়া যায়। ঔরঙ্গজীবের আমলেই শিখদের বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। বাহাদুর শাহ গুরুগোবিন্দের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেও পরে বান্দা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বান্দার বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করিলেও শিখদের বিক্ষোভ সর্বতোভাবে তিনি দমন করিতে সক্ষম হন নাই।

জায়গীর দান বৃদ্ধি ঃ ঔরঙ্গজীবের আমল হইতেই জায়গীরের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। বাহাদুর শাহ ও পরবর্তী সম্রাটদের ক্রমাগত জায়গীর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জায়গীরের সংখ্যা অবিরতভাবে বৃদ্ধি পাইলেও জায়গীরদারদের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাবে

কেন্দ্রীয় রাজকোষে অর্থাগম হ্রাস পাইতে থাকে। শুধুমাত্র রাজস্বের মাত্রা হ্রাস পাওয়াই বড় কথা নহে—ইহার সহিত বৃদ্ধি পায় জায়গীরদারদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব। ঔরঙ্গজীব ব্যক্তিগত জীবনে মিতব্যয়ী হইলেও রাজকীয় ব্যাপারে সকল অনুষ্ঠানই প্রতিপালন করিতেন। শেষ জীবনেও তাঁহার শিবির ছিল তিন বর্গমাইল ব্যাপী এলাকা জুড়িয়া। রাজকোষের অর্থাভাব ও অবিরত জায়গীর-ভুক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল—মুঘল দরবারে চক্র-চক্রান্তের সৃষ্টি এবং শাসন ব্যবস্থার শিথিলতা।

সামন্তদের দুর্নীতি ও অযোগ্যতা

মুঘল রাজত্বের প্রথম দিকে অভিজাত সম্প্রদায় সাম্রাজ্যের শক্তির উৎসস্বরূপ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মীর জুমলার নাম স্মরণীয়। কিন্তু ঔরঙ্গজীবের পরবর্তী সম্রাটগণের সময়ে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অনৈক্য ও দুর্নীতি দেখা দেয়। অভিজাত সম্প্রদায় ইরাণী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায় এবং আপনাপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পারস্পরিক কলহ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

ঔরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা ও ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব (১৭০৭-১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ): ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াই ঔরঙ্গজীব মৃত্যুর পূর্বে পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন লইয়া যে 'গৃহযুদ্ধ' দেখা দেয়, তাহাতে জয়লাভ করেন ঔরঙ্গজীবের অন্যতম পুত্র মোয়াজ্জেম। 'প্রথম বাহাদুর শাহ্' (শাহ আলম) উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭০৭ খ্রীঃ)। মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণও পিতা-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাহান্দার শাহ্ সিংহাসন অধিকার করেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্তৃত্ব: কিন্তু সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ এবং সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ নামক দুইজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ওম্‌রাহের সাহায্যে জাহান্দার শাহ্‌কে হত্যা করিয়া ফারুখশিয়র সিংহাসন অধিকার করেন (১৭১৯ খ্রীঃ)। ইতিহাসে আবদুল্লা খাঁ এবং হোসেন আলি খাঁ—সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নামেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া বসিলেন। ফারুখশিয়র নিজ হস্তে ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা করিলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত এবং নিহত করেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে রফি-উদ্-দরাজাত এবং রফি-উদ্-দৌল্লা নামক বাহাদুর শাহের দুই পৌত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। অনতিকালের মধ্যে আবদুল্লা খাঁ এবং হোসেন আলি খাঁ নামে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় রাজ্য শাসন ব্যাপারে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া ওঠেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সম্রাটের সহায়তায় সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করা সম্ভব। সেইজন্য তাঁহারা পরধর্মসহিষ্ণুতার পথ গ্রহণ করেন। রাজপুত মারাঠা এবং জাঠদের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়া তাঁহারা সাম্রাজ্য শক্তিশালী করিতে প্রচেষ্ট হন। হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া ও তীর্থকর তাঁহারা উঠাইয়া দেন। এমন কি

তাঁহাদের আধিপত্যের শেষ দিকে তাঁহারা শাহুকে মারাঠাদের রাজার পদে স্বীকৃতি দান করিয়া দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশ হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার দেন। প্রতিদানে শাহু তাহাদের দাক্ষিণাত্যে ১৫,০০০ অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহগুলি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় কঠোর হস্তে দমনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্রাটের দরবারের চক্র ও চক্রান্ত প্রতিপদে তাহাদের প্রচেষ্টায় বাধা দেয়। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমাগত পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সার্বিকভাবে মুঘল প্রশাসনকে বিশৃঙ্খল ও বিকল করিয়া ফেলে। জমিদার ও বিদ্রোহীরা রাজস্বদানে বিরত হওয়ায় এবং ক্রমে রাজস্ব ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থায় রাজকোষের আয় দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার ফলে কর্মচারী ও সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দান অসম্ভব হওয়ায় সামরিক বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিতে লাগিল। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের এত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল নিজাম-উল-মূলক নামে অন্য এক অভিজাত গোষ্ঠীর নেতার প্রতিবন্ধকতায়। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধীদল তাহাদের নিহত করে। কিন্তু তাহাতে রাজদরবারে অভিজাতবর্গের চক্র ও চক্রান্তের অবসান ঘটে নাই। ইহার পরে মহম্মদ শাহ সম্রাট হইলে নিজাম-উল-মূলক তাঁহার উজীর হইয়াছিলেন।

অভিজাতবর্গের আরও ক্ষমতা বৃদ্ধি : মহম্মদ শাহ-এর অযোগ্য দীর্ঘ ৩০ বৎসরের রাজত্বে মুঘল সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের শেষ সুযোগ আসিয়াছিল। এই সময়ে সম্রাটের ক্ষমতার পূর্বের মতো দ্রুত কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ কালেও প্রজাসাধারণের মধ্যে মুঘলদের মর্যাদা—রাজনৈতিক ঘটনা মাত্র ছিল। মুঘল বাহিনী, বিশেষত ইহার গোলন্দাজ শাখার তখনো দেশময় গৌরব ছিল। উত্তর ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থায় অবনতি ঘটিলেও তাহা তখনো ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। মারাঠা সর্দারগণ তখনো দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং রাজপুতগণ মুঘল সম্রাটের অনুগত ছিল। দেশের সংকট সম্বন্ধে অবহিত অভিজাতবর্গের সহায়তায় যে-কোন দূরদর্শী ও শক্তিশালী সম্রাট সাম্রাজ্যের পতন অবহেলায় রোধ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জাতির প্রয়োজনের উপযুক্ত ছিলেন না সম্রাট মহম্মদ শাহ। উজীর নিজাম-উল-মূলকের হাতে সকল কার্যভার অর্পণ করিয়া তিনি বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকিতেন। ইহার ফলে অভিজাতবৃন্দ চক্র ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করিয়া নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রায় স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন।

আঞ্চলিক স্বাধীনতা

[Regional Independence]

সম্রাটের খামখেয়ালীতে এবং অভিজাতবর্গের প্রতিবন্ধকতায় বিরক্ত হইয়া উজীর নিজাম-উল-মূলক ১৭২৪ খ্রীঃ পদত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্রের মতে, 'তাঁহার প্রত্যাবর্তনই ছিল

হায়দরাবাদ

সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য ও ন্যায় নীতির অবসানের প্রতীক'। বর্তমানের অযোধ্যা, বারাণসী, এলাহাবাদ ও কানপুর লইয়া গঠিত ছিল মুঘল যুগের অযোধ্যা সুবা। খোরাসান হইতে ভাগ্যান্বেষী সাদাৎ খাঁ এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অযোধ্যা সুবার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবার পর ধীরে ধীরে আপন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে থাকেন এবং কার্যত স্বাধীন হইয়া যান। পরবর্তীকালে অযোধ্যার সুবাদার সুজা-উদ্‌দ্দৌল্লা সম্রাটের উজীর হইয়া ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতের রাজনীতিতে নানা ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অযোধ্যা

ঔরঙ্গজীব কর্তৃক নিযুক্ত মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার হইয়াছিলেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পরে ওড়িশার একটি অংশও বাংলার সহিত যুক্ত হয়। তখন ওড়িশার নায়েব নাজিম আলিবর্দী বাংলার শাসন দখল করিয়া দিল্লীর সম্মতি আদায় করেন। তিনি অনিয়মিতভাবে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজার মতো যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ শাসন করিতেন।

বাংলা সুবা

দেখিতে দেখিতে মালব ও গুজরাটে মারাঠা প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। আগ্রার নিকট জাঠ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। বদন সিং-এর নেতৃত্বে আগ্রা ও মথুরা অঞ্চল জুড়িয়া স্বাধীন জাঠ রাজ্য দেখা দেয়। রোহিলখণ্ডে আফগান গোষ্ঠী রোহিলাগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল। পাঞ্জাবে শিখ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ জমিদার, রাজা, নবাব সকলেই বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় ঘটিল (১৭৩৯ খ্রীঃ) নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।

অন্যান্য

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ (১৭৩৯ খ্রীঃ) **:** নাদিরকুলী খাঁ বা নাদির শাহ প্রথম জীবনে ছিলেন দস্যু। কিন্তু পারস্য সম্রাটের অধীনে কার্য গ্রহণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে পারস্যের সর্বময় কর্তা হইয়া বসেন। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ নাদির শাহের দূতকে অপমান করেন, এই অজুহাতেই তিনি ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাট তখন নামেমাত্র দিল্লীর বাদশাহ।

নাদির শাহকে বাধা দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। নাদির শাহ দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে বিলাস-ব্যসনে মত্ত মহম্মদ শাহ্ প্রমাদ গনিলেন। নাদির শাহকে বাধা দিতে গিয়া কুর্ণালের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন (১৭৩৯ খ্রীঃ)। বিজয়ী নাদির শাহ্ দিল্লী প্রবেশ করিলেন। মহম্মদ শাহ্ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করিলেন। ইতিমধ্যে নাদির শাহ-এর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে উত্তেজিত হইয়া দিল্লীর অধিবাসীগণ নাদির শাহের কয়েকশত অনুচরকে হত্যা করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠনের এবং হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন ও

হত্যাকাণ্ড অবাধে চলিতে লাগিল। প্রায় দুই মাস কাল এই লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন চলিবার পর মহম্মদ শাহের কাতর অনুরোধে নাদির শাহ্ ক্ষান্ত হইলেন। দেড় লক্ষাধিক লোক নিহত হইল। অবশেষে বিপুল লুণ্ঠিত সম্পদ এবং শাহ্‌জাহানের ময়ূর-সিংহাসন ও কোহিনূর মণি লইয়া তিনি স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। নাদির শাহের অত্যাচারে দিল্লী শ্মশানে পরিণত হইল এবং সম্রাটের শেষ গৌরবটুকু বিলুপ্ত হইল। কাবুল ও সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চল নাদির শাহের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। মহম্মদ শাহের দিল্লীর সম্রাট উপাধি মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

ফলাফল : নাদির শাহের ভারত অভিযান মুঘল সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের গুপ্ত দুর্বলতাগুলি এই আক্রমণে প্রকাশিত হওয়ায় মারাঠাদের নিকট মুঘল সামরিক শক্তির আর কোনই মর্যাদা রহিল না। সাময়িকভাবে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা একেবারেই বিকল হইয়া গেল। অভিযানটি একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের ধনবল হ্রাস করিল, অপরদিকে তেমনি করিল সারা দেশের অর্থনীতির অপূরণীয় ক্ষতি। অভিজাতবর্গ দরিদ্র কৃষকদের উপর খাজনা ও রাজস্বের জন্য নানা উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গে তাহাদের পরস্পর ঈর্ষা-দ্বেষ ও সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাইল। উত্তর-পশ্চিমের দ্বারপথ আর সুরক্ষিত করা সম্ভব হইল না। সেইজন্য পরবর্তীকালে আহম্মদ শাহ আবদালীর অভিযানে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

২ আঞ্চলিক শক্তিগুলির অভ্যুদয়

[Growth of Regional Powers]

বাংলাদেশের তৎকালীন অবস্থা

বাংলাদেশ ঃ ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের শেষ ভাগে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। দিল্লীর সম্রাট আর্থিক দিক হইতে মুর্শিদকুলির উপর বিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ দিল্লীর সম্রাটকে নিয়মিত রাজস্ব দান করিয়া একপ্রকার স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। মুর্শিদকুলি খাঁর পরবর্তী সুজাউদ্দিন খাঁ এবং সরফ্ রাজ খাঁও স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন।

সরফরাজ খাঁকে ঘেরিয়ায় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া বিহারের নায়েব নাজির আলিবর্দী খাঁ বাংলার মসনদ অধিকার করেন (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ)। আলিবর্দী খাঁ সুচতুর এবং প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে বাংলার নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। আলিবর্দী খাঁর সময় বাংলাদেশ বর্গীর অত্যাচারে বিশেষভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিল। আলিবর্দী খাঁ বর্গীর অত্যাচার হইতে বাংলাকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বুঝিয়াছিলেন যুদ্ধ দ্বারা মারাঠা বর্গীদের দমন করা সম্ভব হইবে না, তখন তিনি বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা চৌথ এবং ওড়িশার একাংশ ছাড়িয়া দিয়া মারাঠাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

আলিবর্দী সুচতুর ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। ইংরাজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের তিনি বাণিজ্যিক অধিকার ব্যতীত অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আর আলিবর্দী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশের সাহস কোন বণিক কোম্পানীই দেখায় নাই। তবে নৌবলে বলীয়ান ইংরাজদের বাংলা হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব নয় বুঝিয়াই তিনি ইংরাজের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ এবং আলিবর্দী খাঁর বাংলা দীর্ঘকাল শান্তি ও সমৃদ্ধির মুখ দেখিয়াছিল এবং নানা দিকে সেখানে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়াছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ সরকারের ব্যয় সংকোচন করিয়া জায়গীর জমি খালসা জমিতে পরিণত করিয়া এবং নূতন জরিপ ব্যবস্থার পর ইজারাদারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কৃষকদের তাকাভী ঋণ দিয়া তিনি কৃষিকার্যে সহায়তা এবং নিয়মিত খাজনা দানে সাহায্য করিতেন। ইহার ফলে বাংলা সরকারের সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তবে ইজারাদারী ব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে কৃষকদের উপর শোষণের মাত্রা বাড়িতে থাকে। বাংলার নবাবগণ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হইতেই যোগ্যতা অনুসারে রাজকার্যে লোক নিয়োগ করিতেন। তাঁহারা সকলেই দেশী ও বৈদেশিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। নদীপথে দস্যুবৃত্তি বন্ধ করিয়া তাঁহারা বণিকদের বাণিজ্যের সহায়তা করেন। আবগারী ও শুল্ক বিভাগের দুর্নীতিও তাঁহারা রোধের চেষ্টা করিতেন। এই সঙ্গে তাঁহারা ইংরাজ ও অন্যান্য বৈদেশিক বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলির কাজকর্মের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতেন। আলিবর্দী খাঁ তাহাদের কলিকাতা ও চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ করিতে দেন নাই। শোভা সিং ও বর্গীদের হাঙ্গামা প্রতিরোধের নামে ইংরাজগণ গোপনে কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল।

হায়াদরাবাদ ঃ দাক্ষিণাত্য মুঘল শাসন হইতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে মীর কামারউদ্দীন চিনকিলিজ খাঁর নেতৃত্বে। তিনি সাধারণত নিজাম-উল-মূলক আসফ খাঁ নামেই পরিচিত। তাঁহার পিতা ও পিতামহ বুখারা হইতে মুঘল সম্রাটদের কার্যে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও ঔরঙ্গজীবের শাসনকালে অতি সামান্য পদে নিযুক্ত হন। তাহার পরে আপন দক্ষতায় দ্রুত পদোন্নতি ঘটাইয়া চিনকিলিজ খাঁ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন ঘটে। অবশেষে মহম্মদ শাহের রাজত্বে তাঁহার অস্থিরচিত্ততা এবং অভিজাতদের চক্রান্তে বিরক্ত হইয়া তিনি ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের বিনা অনুমতিতে দাক্ষিণাত্যে চলিয়া আসেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের পরামর্শে সম্রাট গোপনে হায়দরাবাদের শাসনকর্তাকে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে নির্দেশ দেন। উভয়ের মধ্যে সংগ্রামে নিজাম বিজয়ী হইলে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার নেতৃত্বে হায়দরাবাদ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে উদ্ভূত হয়। নিজাম-উল-মূলকের অধীনে হায়দরাবাদের শাসন ব্যবস্থায় উন্নতির বিষয়ে কাফী খাঁ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 'দাক্ষিণাত্য সুবা বিরাট বিস্তৃত অঞ্চল, ইনি তাহা দৃঢ় হস্তে ১৭ বৎসর শাসন করিয়াছিলেন।'

স্বাধীন হায়দরাবাদ রাষ্ট্রের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিলেও নিজাম কখনো প্রকাশ্যে দিল্লীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই। অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন কিংবা জায়গীর দান—কোন কিছুর ক্ষেত্রে তিনি দিল্লীর সমর্থনের অপেক্ষা রাখিতেন না। হিন্দুদের প্রতি তিনি উদারনীতি অবলম্বন করিতেন। পূরণ চাঁদ ছিলেন তাঁহার দেওয়ান। দাক্ষিণাত্য জুড়িয়া সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া তিনি নিজ আধিপত্য সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। শক্তিশালী জমিদারদের কঠোর হস্তে দমন করিয়া তিনি বিদ্রোহী মারাঠাদের স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। রাজস্ব বিভাগ হইতে দুর্নীতি দূর করিতেও তিনি সচেষ্ট হন।

দাক্ষিণাত্যের অপর একটি সুবা কর্ণাট। তাহা নিজামের শাসনাধীনে ছিল। দিল্লীর শাসনের দুর্বলতার সুযোগে যেমন করিয়া নিজাম কার্যত স্বাধীন হইয়া যান, তেমনি কর্ণাটের 'নবাব' নামে পরিচিত ডেপুটি শাসনকর্তা দাক্ষিণাত্যের নিজামের কর্তৃত্বমুক্ত হইয়া পড়েন। কর্ণাটের নবাব সাদুল্লা খাঁ নিজামের সম্মতি ব্যতীতই দোস্ত আলিকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে কর্ণাটের নবাবের গদী লইয়া সংঘর্ষ বাধিলে কর্ণাটের রাজনীতির অবনতি ঘটে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের মৃত্যুর পরে অবস্থা জটিল হইয়া পড়িলে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ লাভ করে।

কর্ণাট

মহীশূর ঃ হায়দরাবাদের পরেই দাক্ষিণাত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে রাজ্যের উদ্ভব ঘটে, তাহা হায়দর আলির নেতৃত্বাধীন মহীশূর। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর হইতে মহীশূর রাজ্যটি কোনও রকমে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সর্বাধিকারী নাঞ্জা রাজা এবং দুলওয়াই দেবরাজ ক্ষমতা দখল করিয়া রাজা চিক্কা কৃষ্ণরাজকে ক্রীড়নকে পরিণত করেন। তাঁহাদের অধীনে হায়দর

আলি সামান্য কর্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি নিরক্ষর হইলেও অসম সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রচণ্ড প্রাণশক্তিসম্পন্ন এবং ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ইহার সহিত তাঁহার ছিল অসাধারণ সেনাপতিত্ব ও কূটনীতি জ্ঞান।

এই সময় দীর্ঘ কুড়ি বৎসর মহীশূর রাজ্য নানা যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িলে হায়দর আলি আপন ভাগ্য উদ্ধারের সন্ধান পান। প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে মহীশূর সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ লাভ করেন। পাশ্চাত্য সামরিক বিদ্যার উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া তিনি অধীনস্থ সমস্ত বাহিনীকে পাশ্চাত্য প্রথায় সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন। ফরাসী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় তিনি দিন্দিগুলে একটি আধুনিক অস্ত্রাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলি নাঞ্জারাজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া মহীশূর রাজ্যে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বিদনুর, গুন্দা, কানাড়া এবং মালাবার জয় করিয়া তিনি রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন। অভ্যন্তরে বিদ্রোহী পলিগার বা জমিদারদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। একটি দুর্বল ও আভ্যন্তরীণ বিবাদে শক্তিহীন মহীশূর রাজ্যকে তিনি এক দুর্ধর্ষ শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

ক্ষমতালাভের মুহূর্ত হইতে তাঁহাকে মারাঠা সর্দার নিজাম এবং ইংরাজবাহিনীর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ১৭৬৯ খ্রীঃ ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে তিনি দুই দুইবার ইংরাজ বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া মাদ্রাজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতেই তিনি ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হায়দর আলির মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়া মহীশূরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনিও বীরের মৃত্যু বরণ করেন। টিপু ছিলেন সমসাময়িক শাসকদের মধ্যে সর্বাধুনিক চিন্তাশীল। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল এবং তিনি জেকোবিন ক্লাবেরও সভ্য ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের বিজয় উপলক্ষে একটি স্মারক বৃক্ষও তিনি রোপণ করেন। তাঁহার পাঠাগারে ধর্ম, ইতিহাস, সমরবিজ্ঞান, ভেষজ, অঙ্ক প্রভৃতি নানা বিষয়ের গ্রন্থাদি থাকিত।

তাঁহার সামরিক বাহিনী ছিল অতি সুশৃঙ্খল এবং একান্ত রাজভক্ত। জায়গীর প্রথা উচ্ছেদ করিয়া তিনি রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। জমিদারদের বংশানুক্রমিক জমিদারীও তিনি উচ্ছেদ করিয়া দেন। তাঁহার আমলে ভূমিরাজস্ব ছিল ⅓ অংশ, তবে কর্মচারীদের প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল যেন প্রজাদের উপর কোনও প্রকার উৎপীড়ন না হয়।

ভারতের অন্যান্য শাসকদের অপেক্ষা টিপু সুলতানই সর্বাগ্রে ইংরাজদের বিপদ সম্বন্ধে সচকিত ছিলেন। সেইজন্য প্রাণপণে ভারতে ইংরাজ শক্তি বিস্তারে বাধা দিয়াছিলেন। ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের রাজত্বকালে মহীশূরের অর্থ নৈতিক সম্পদ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছিল। অর্থ নৈতিক বুনিয়াদের উপরেই যে দেশের সামরিক শক্তি নির্ভর করে, তাহা টিপু ভালোভাবেই জানিতেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনিয়া তিনি দেশে নানা শিল্প গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

অযোধ্যা : স্বশাসিত অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাদাৎ খাঁ বার্হাত-উল-মূলক। তিনি ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দুর্দান্ত সাহসী, কর্মশক্তি সম্পন্ন, লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন কর্মভার গ্রহণ করেন তখন বিদ্রোহী জমিদারগণ প্রদেশের সর্বত্র বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজস্বদানে অস্বীকৃত হইয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী গঠনে উদ্যোগী হন। এমন কি দুর্গ রচনা করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সাদাৎ খাঁ তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার ফলে অবশেষে তিনি ঐ সকল বিদ্রোহীদের দমনে সমর্থ হইয়া সারা রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তবে জমিদারগণ আনুগত্য প্রকাশ করিলেও সুযোগ পাওয়ামাত্রই শাসকের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিতেন।

সাদাৎ খাঁ ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে নূতন ভূমি-রাজস্ব সংস্কার করিয়াছিলেন। তাহাতে কৃষকদের উপর ন্যায্য কর ধার্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাংলার নবাবের মতো তিনিও হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদাভেদ করিতেন না। তাঁহার বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সমরনায়ক ছিল হিন্দু। তাঁহার সৈন্যদল ছিল যেমন সুশিক্ষিত, অস্ত্রসজ্জায়ও ছিল তেমনি সুসজ্জিত এবং তাহাদের বেতন ছিল উচ্চ হারে নির্দিষ্ট। সাদাৎ খাঁর পরিচালনায় অযোধ্যায় এক দক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বেই তিনি কার্যত স্বাধীন হইয়া ওঠেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৪৮ সালে সফদর জঙ্ সম্রাটের উজীর পদ লাভ করেন এবং তাহার সহিত এলাহাবাদ প্রদেশটিরও কর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৭৫৪ সালে মৃত্যুর পূর্বে এলাহাবাদের জনজীবনে সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুর্বিনীত জমিদারদের দমন করিবার পর তিনি বর্গীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মারাঠা সর্দারদের সহিত সন্ধি করেন। দেশে শান্তিস্থাপনের জন্য তিনি রোহিলা ও বাঙ্গাস্ পাঠানদের দমনের নিমিত্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সেই সংগ্রামে তিনি পেশোয়া-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরে আহ্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণের বিরুদ্ধে পেশোয়া-এর সাহায্যের পরিবর্তে তাঁহাকে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা কর, পাঞ্জাব সিন্ধু এবং উত্তর ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের চৌথদানে স্বীকৃত হন। তাহা ব্যতীত আজমীর ও আগ্রার শাসনকর্তার পদ দানেরও প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের চক্রান্তে প্রলুব্ধ হইয়া পেশোয়া সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা পেশোয়াকে অযোধ্যা ও এলাহাবাদের শাসনভারের লোভ দেখান। সফদর জঙ্ও রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানকে সমান মর্যাদা দিতেন। অযোধ্যায় দীর্ঘকাল সুখ-শান্তি বিরাজ করায় নবাবদের আনুকুল্যে লক্ষ্মৌ-এ একটি বিশেষ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

শিখ জাতির অভ্যুত্থান
[Rise of the Sikhs]

গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়কাল (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে ভারতে শিখদের আবির্ভাব হয়। নানক বর্ণভেদের বিরোধী ও

একেশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান যে কেহ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিত। মৃত্যুর পূর্বে নানক তাঁহার পুত্রদ্বয়কে বাদ দিয়া প্রিয় শিষ্য অঙ্গদকে পরবর্তী গুরু মনোনীত করিয়া যান। গুরু অঙ্গদ (১৫৩৯-১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দ) নানকের ধর্মোপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গুরুমুখী বর্ণমালা প্রবর্তন করেন। পরবর্তী গুরু অমরদাস (১৫৫২-১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) কয়েকজন শিখ ধর্মপ্রচারক নিয়োগ করিয়া তাহাদের উপর ধর্মপ্রচারের ভার অর্পণ করেন। ইহার ফলে শিখধর্ম প্রসারলাভ করে। অমরদাসের নির্দেশে শিখগণ জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি সুসংহত ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। অমরদাসের পর তাঁহার জামাতা রামদাস গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার সময় (১৫৭৪-১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ) হইতেই গুরুর আসন বংশগত অধিকারে পরিণত হয়। সম্রাট আকবর তাঁহার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন। অমৃতসরের বিখ্যাত শিখ স্বর্ণমন্দির আকবর প্রদত্ত ভূখণ্ডের উপর নির্মিত হয়।

গুরু রামদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ) গুরুর পদ লাভ করেন। তাঁহার সময়কাল শিখ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী গুরুদের ধর্মোপদেশ এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্মগ্রন্থের কিছু বাণী সংগ্রহ করিয়া অর্জুন বিখ্যাত শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' সঙ্কলন করেন। ইহা 'আদি গ্রন্থ' নামেও পরিচিত। এতদিন পর্যন্ত শিখ গুরুগণ শিষ্যপ্রদত্ত অর্থ লইয়া তৃপ্ত থাকিতেন, কিন্তু অর্জুন নিয়মিতভাবে কর্মচারী প্রেরণ করিয়া সকলের নিকট হইতেই ধর্মার্থ দান সংগ্রহ করিতেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে অর্জুন তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই অভিযোগে গুরু অর্জুন মুঘল সম্রাটের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। গুরু অর্জুনের মতো যশস্বী কবি ও ধর্মনায়ককে প্রাণদণ্ড দেওয়া ছিল জাহাঙ্গীরের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার পরিচায়ক। ইহার ফলে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়, তাহা পরে মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হইয়াছিল।

অর্জুন

অর্জুনের পুত্র ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৮-১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তিনি শিখ সম্প্রদায়কে ধীরে ধীরে যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে আরম্ভ করেন। তিনি শাহ্‌জাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শিষ্যগণকে সমরবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তোলেন। গুরু অর্জুন ও হরগোবিন্দের প্রচেষ্টায় তাঁহাদের শিখ অনুগামীরা একটি মুঘল-বিদ্বেষী জাতীয় সংস্থায় রূপান্তরিত হয়। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে শিখ সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরিয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে।

হরগোবিন্দ

পরবর্তী গুরু হর রায় (১৬৪৫-১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন হরগোবিন্দের পৌত্র। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হরকিষণ (১৬৬১-১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন অষ্টম গুরু। তাঁহাদের সময় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তবে শিখগণ একটি স্বতন্ত্র সামরিক সম্প্রদায় হিসাবে আরও শক্তিশালী হইয়া ওঠে।

শিখদের নবম গুরু তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) হরকিষণের মৃত্যুর পর গুরুর

পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন হরগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র। ক্ষমতায় আসীন হইয়া তিনি প্রথমে মুঘল সম্রাটের সহিত সহযোগিতার উদ্দেশ্যে রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহকে আসাম অভিযানে সাহায্য করেন। কিন্তু শীঘ্রই ঔরঙ্গজীবের হিন্দু-বিরোধী নীতি তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করে এবং তিনি মুঘলদের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঔরঙ্গজীব তেগ বাহাদুরকে বন্দী করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আদেশ দেন। কিন্তু তেগ বাহাদুর ধর্মান্তরগ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় ঔরঙ্গজীবের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন ('শির দিয়া সার না দিয়া')। তাঁহার এই আত্মোৎসর্গের ফলে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

তেগ বাহাদুর

গোবিন্দ সিংহ ঃ তেগ বাহাদুরের পুত্র দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু ও সামরিক নেতা। তিনি শিখ সামরিক শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার গঠিত সামরিক সংঘ 'খালসা' নামে পরিচিত। তাঁহার নেতৃত্বে শিখগণ এক দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়। তিনি জাতিভেদ প্রথা দূর করেন এবং শিখদের মধ্যে পঞ্চ 'ক'-এর (কেশ, কচ্ছ বা ছোট পায়জামা, কড়া বা লৌহ-বলয়, কৃপাণ বা ছোরা এবং কংখা বা চিরুণী) ব্যবহারের প্রবর্তন করেন। গুরু গোবিন্দ শিখ ধর্মের একটি সম্পূরক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহাকে পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের হিন্দু রাজা ও মুঘল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মুসলমান শাসকদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধ শুরু হইলে গোবিন্দ বাহাদুর শাহকে সাহায্য করেন। বাহাদুর শাহের সহিত দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার পথে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক পাঠানের ছুরিকাঘাতে গুরু গোবিন্দ নিহত হন।

গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর শিখদের আর কোন গুরু নির্বাচিত হন নাই। 'গ্রন্থসাহেব'ই ধর্মের মূলকেন্দ্র হিসাবে স্থান লাভ করে।

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ

[Successors of Shivaji]

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় মারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলেও বিনষ্ট হয় নাই। শিবাজীর মৃত্যুর সুযোগ লইয়া ঔরঙ্গজীব সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে হাজির হন মুঘল সাম্রাজ্যের আধিপত্য পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করিয়া ঔরঙ্গজীব মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে শম্ভুজী পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। মারাঠা শক্তিকে নির্মূল করিবার প্রয়াসে ঔরঙ্গজীব শম্ভুজীকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহুও মুঘল হস্তে বন্দী হন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মারাঠাদের দমন করা ঔরঙ্গজীবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শম্ভুজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম কর্ণাটকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুঘলদের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলেন। এই সময় রামচন্দ্র পন্থ, পরশুরাম ত্রিম্বক প্রভৃতি মারাঠা নেতা এবং শান্তাজী ঘোরপাড়ে ও ধানাজী যাদব প্রমুখ সেনানায়কদের অনুপ্রেরণায় মারাঠারা প্রবল উদ্যমে যুদ্ধ চালাইয়া মুঘলদের বিব্রত করে।

শম্ভুজী (১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ)

রাজারাম

রাজারামের মৃত্যুর পর মুঘলগণ সাতারা অধিকার করিলেও রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাই শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে বসাইয়া মুঘলদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। মারাঠারা ক্রমশঃ তাহাদের হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়। মারাঠাদের দমন করিতে না পারিয়া ঔরঙ্গজীব ভগ্নহৃদয়ে মারা যান (১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

তারাবাই ও তৃতীয় শিবাজী

ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর মারাঠাদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শাহুকে মুক্তি দেওয়া হইল। এই উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হয়। শাহু মারাঠা সিংহাসন দাবি করিলেন। তারাবাই শাহুর দাবী অস্বীকার করিলে মারাঠাদের মধ্যে অন্তর্কলহের সূত্রপাত হয়। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথ নামক একজন কোঙ্কনদেশীয় ব্রাহ্মণের সাহায্যে শাহু শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিয়া মারাঠা সিংহাসন দখল করেন। বালাজী বিশ্বনাথ হইলেন তাঁহার পেশোয়া বা মুখ্যমন্ত্রী।

শাহু (১৭০৮-১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)

পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঃ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ শিবাজীর পৌত্র শাহুকে মুক্তি দিলে মারাঠাদের মধ্যে নূতন করিয়া গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। শাহুর পেশোয়া ছিলেন ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন বালাজী বিশ্বনাথ। তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্যে পেশোয়াদের ক্ষমতা অপ্রতিহত হইয়া ওঠে এবং তখন হইতে মারাঠাজাতির ইতিহাস রূপান্তরিত হইয়া ওঠে 'পেশোয়াতন্ত্রে'।

বালাজী বিশ্বনাথ ঃ রাজস্ববিভাগে সামান্য কর্মচারী হিসাবে বালাজী বিশ্বনাথ জীবন আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে রাজার শত্রুপক্ষকে দমন করিয়া শাহুর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেন। কূটনৈতিক কৌশলে তিনি বহু মারাঠা সর্দারদের শাহুর পক্ষে আনয়ন করিয়া ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া পদে ব্রতী হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি পেশোয়া পদটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া তোলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির যুগের অন্তর্বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি জুলফিকার আলীকে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' দিতে বাধ্য করেন। দিল্লীর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তিনি এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। শিবাজীর পূর্বতন সমস্ত রাজ্য শাহুকে ফিরাইয়া দিয়া দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকারও শাহুকে দেওয়া হইয়াছিল। শাহুও সম্রাটের প্রয়োজনে ১৫,০০০ অশ্বারোহী সরবরাহে এবং সম্রাটকে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা করদানে সম্মত থাকেন। পরে সৈয়দ ভ্রাতাদের সহিত তিনি দিল্লীতে সম্রাট ফারুখশিয়ারের পতনে সহায়তা করেন এবং তখনই মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতাগুলির সন্ধান পাইয়াছিলেন।

চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা সর্দারদের মধ্যে রাজ্যটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। সর্দারগণ আপন আপন ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায়ের অধিকাংশ ভাগ নিজেরা রাখিতে পারিতেন। পরবর্তীকালে ইহাই মারাঠা সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন জায়গীরদারী ব্যবস্থায় সর্দারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা আপন আপন এলাকায় মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়।

প্রথম বাজীরাও ঃ পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ২০ বৎসর বয়সে প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদ লাভ করেন। বয়সে নবীন হইলেও তিনি অপূর্ব প্রতিভাশালী ও করিৎকর্মা ব্যক্তি ছিলেন। শিবাজীর পরে তাঁহাকেই 'শ্রেষ্ঠ গেরিলা রণবিশারদ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম বাজীরাও-এর নেতৃত্বে মারাঠাবাহিনী অবিরাম দাক্ষিণাত্যে মুঘল-



বাহিনীর সহিত সংগ্রাম করিয়া চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় এবং রাজ্য জয় করিয়াছেন। ক্রমাগত যুদ্ধের মধ্য দিয়া গাইকোয়াড়, হোলকার, সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলে পরিবারবর্গ এই সময়েই প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজীবন তাঁহার চেষ্টা ছিল নিজামের শক্তি খর্ব করা। এই উদ্দেশ্যে দুইবার উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধও হইয়াছিল। ১৭৩৩

খ্রীষ্টাব্দে সুদূর দাক্ষিণাত্যে জিঞ্জিয়ার সিবিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম চালাইয়া তিনি মূল ভূখণ্ড হইতে তাহাদের বিতাড়িত করেন। ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিয়া তিনি 'হিন্দুপাদ-পাদশাহী' (হিন্দু সাম্রাজ্য)-এর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার বাসনা পোষণ করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া মালব ও গুজরাট অধিকার করিয়া লন। অতঃপর অম্বরের সওয়াই জয়সিংহ ও ছত্রসাল বুন্দেলার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি সসৈন্যে দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই সময় মুঘল সম্রাটের আহ্বানে নিজাম-উল্-মূলক তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে বাজীরাও যুদ্ধে নিজামকে পরাজিত করেন (১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং মালবের উপর মারাঠা অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পর বৎসর মারাঠারা পর্তুগীজদের নিকট হইতে সলসেটি ও বেসিন বন্দর-দুইটি অধিকার করিয়া লয়।

প্রথম বাজীরাও
(১৭২০-১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রথম বাজীরাও-এর নেতৃত্বাধীনে মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুগঠিত হইলেও রাজারাম কর্তৃক প্রবর্তিত জায়গীর প্রথা বলবৎ থাকায় সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হয়। বেরারের ভোঁসলে বরোদার গাইকোয়াড়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার ও মালবের পাবার—এই পাঁচটি সামন্ত রাজা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে। এবং আপন সামরিক প্রতিভাবলে প্রায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি নিজ নিজ রাজ্য অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। গাইকোয়াড় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাজীরাও-এর হস্তে পরাজিত মারাঠা সর্দার ; সিন্ধিয়া এবং হোলকার বংশের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। আপন দক্ষতা ও কৃতিত্বে তাঁহারা ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মালব, গুজরাট এবং বুন্দেলখণ্ড অধিকার করার পরে মারাঠা নেতা প্রথম বাজীরাও ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ দিল্লীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে মুঘল সম্রাটের দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। তবে তাঁহারা দিল্লী অধিকার না করিয়া দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসেন নিজামের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হইলে মালবের অধিকার সম্পূর্ণভাবে মারাঠাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লী বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এ-সময়ে প্রথম বাজীরাও নিজামের সহিত পুনরায় সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ইতিমধ্যে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মাত্র ২০ বৎসরের মধ্যেই তিনি মারাঠা রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের সামান্য একটি অঞ্চলকে উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া তিনি 'হিন্দুপাদ-পাদশাহীর' কল্পনা প্রায় রূপায়িত করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ)ঃ মৃত্যুর পূর্বে শাহু কয়েকটি শর্তসাপেক্ষ পেশোয়া-এর হস্তে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব দান করিয়া গিয়াছিলেন। তারাবাই-এর বংশধরগণের মারফত যেন পেশোয়া শিবাজী রাজবংশের নাম বজায় রাখেন। কোহ্লাপুর রাজ্যের স্বাধীনতা যেন তিনি মানিয়া চলেন এবং প্রচলিত জায়গীরদারদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখেন।

শর্তাধীনে পেশোয়া-এর
কর্তৃত্ব লাভ

গাইকোয়াড়ের সাহায্য লইয়া তারাবাই এই শর্তাবলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে নবীন পেশোয়া তাহা দমন করিয়া কার্যত শক্তি-সংঘের মধ্যে সর্বেসর্বা হইয়া ওঠেন।

হিন্দুপাদ-পাদশাহী আদর্শের বিস্তৃতি

পেশোয়া পদ লাভ করিবার পর হইতেই বালাজী বাজীরাও মারাঠা সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণে উদ্যোগী হন। পিতার হিন্দুপাদ-পাদশাহী নীতি হইতে তিনি বিচ্যুত হইয়া মারাঠা বাহিনীতে বিজাতীয় সৈন্যদল নিযুক্ত করেন। প্রাচীন গেরিলা যুদ্ধের নীতি পরিত্যাগ করিয়া গোলন্দাজ বাহিনীর উপর নির্ভরশীল যুদ্ধনীতি গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মারাঠা শক্তি-সংঘের অন্তর্গত নানা অঞ্চলে বর্গীর উৎপাতে হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবৃন্দ অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। রাজপুতগণও মারাঠাদের প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকে এই কারণেই। ফলে, মারাঠা সাম্রাজ্যবাদ ভারতব্যাপী এক জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ শক্তিজোট গঠন করিতে ব্যর্থ হয় এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের ন্যায় একটি লুণ্ঠন-সর্বস্ব সাম্রাজ্যের রূপ লাভ করে।

দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা বিস্তার

মারাঠা সাম্রাজ্য পরিচালনার এই ত্রুটি সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে মারাঠা শক্তির বিস্তারে বাধা দেখা দেয় নাই। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে মারাঠা বাহিনী ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন পর্যন্ত অভিযান করে। এমন-কি কর্ণাটকের নবাবও তাহাদের কর দিতে বাধ্য হয়। হিন্দু রাজ্য মহীশূরও তাহারা আক্রমণ করে। অবশ্য হায়দার আলির অভ্যুত্থানে মারাঠা অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছিল। ১৭৩০ খ্রীঃ উদ্‌গীরের নিকট যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হন। তাঁহার নিকট হইতে মারাঠাগণ বিদরের একাংশ, সমগ্র ঔরঙ্গাবাদ এবং দৌলতাবাদের বিখ্যাত দুর্গ অধিকার করে দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য এইভাবে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া পড়িল। তবে মারাঠা শক্তির অগ্রগতি ঘটে উত্তর ভারতে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় যখন সিরাজউদ্দৌলা সবেমাত্র সিংহাসনে বসিয়াছেন, তখন মলহর রাও সিন্ধিয়া এবং কয়েক মাস পরে পেশোয়া-র ভ্রাতা রঘুনাথ রাও পুনরায় উত্তর ভারতে বাহির হন। জাঠদের সাহায্য আদায় করিয়া মারাঠা বাহিনী দোয়াব অঞ্চলে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় যখন পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছে, তখন মারাঠাগণ দিল্লীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। তাহারা আমলাদের বংশবদ ইমাদউদ্দৌলাকে উজীর পদ দান করে। অতঃপর রঘুনাথ রাও এবং মলহর রাও সিন্ধিয়া পাঞ্জাবের দিকে অভিযান করেন। তাঁহারা ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিরহিন্দ ও লাহোর জয় করিয়া স্বীয় মনোনীত প্রার্থীকে শাসন-কর্তার পদ দান করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। এই-ভাবে রঘুনাথ রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। উত্তরে এই সীমান্ত ঠেকিল সিন্ধু ও হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে তাহা শেষ হইল প্রায় উপদ্বীপের শেষ প্রান্তে। এই সীমান্তের মধ্যবর্তী যে অঞ্চল তাহাদের প্রত্যক্ষ অধিকারে ছিল না, তাহারাও নিয়মিত কর দিত মারাঠাদের। আর এই বিরাট সাম্রাজ্যের শাসনভার বিন্যস্ত ছিল কেবলমাত্র একক পেশোয়া-এর হস্তে।

পানিপথের যুদ্ধ (১৭৬১ খ্রীঃ) ঃ মারাঠাগণ ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর জয় করায় আহম্মদ শাহ আবদালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। পর বৎসরেই আবদালীর বাহিনী

লাহোর হইতে মারাঠাগণকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল। অতঃপর আহম্মদ শাহ আবদালী সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। এই অভিযানে তিনি সমর্থন লাভ করিলেন অযোধ্যার নবাব এবং রোহিলখণ্ডের রোহিলাদের। তাহাদের চোখে মারাঠাগণই ছিল মুসলিম রাজত্বের সর্বপ্রধান শত্রু। এদিকে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও বর্গীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ রাজপুতগণের কোনও সাহায্য লাভ করিতে মারাঠাগণ সমর্থ হয় নাই। তেমনি পাঞ্জাবের নবজাগ্রত শিখ শক্তিকেও আপন দলে টানিতে মারাঠাগণ ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাহারা মারাঠা-পাঠান সংঘর্ষে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিল মাত্র। বালাজী বাজীরাও এর অদূরদর্শী রাজনীতির পরিণাম স্বরূপ মারাঠাগণকে সম্পূর্ণ একাকী ঐ দুর্ধর্ষ পাঠান ও দেশীয় মুসলিম শক্তির সম্মুখীন হইতে হইল।

আবদালী অগ্রসর হইয়া পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দত্তজি সিন্ধিয়ার সহিত থানেশ্বরে সংগ্রামে লিপ্ত হন। দত্তজি পশ্চাদপসরণ করিয়া দিল্লীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। দুরানীর দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী বাহিনী তাহাদের পশ্চাৎ হইতে অব্যাহত গতিতে আক্রমণ চালাইতে থাকে। জাগোকি সিন্ধিয়া এবং মলহর রাও হোলকার অগ্রসর হইয়া আবদালীর পথরোধ করিতে গিয়া ব্যর্থ হইলেন। অতঃপর পেশোয়া সদাশিব রাও ভাও-এর নেতৃত্বে মারাঠাদের সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত বাহিনীকে আবদালীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তিনি দিল্লী জয় করিয়া রসদ সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলের হিন্দুপ্রধানগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় তাহারা মারাঠাদের সকল প্রকার সাহায্য দানে বিরত থাকে। দিল্লীর নির্বান্ধব অবস্থা এড়াইবার জন্য সদাশিব রাও পানিপথের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ইতিমধ্যে আবদালী আলিগড় দখল করিয়া জাঠদের কর দিতে বাধ্য করেন। ততক্ষণে অযোধ্যার নবাব এবং সম্রাটের উজীর-এর সক্রিয় সমর্থন লাভ করিয়া আবদালীও পানিপথের প্রান্তরে উপস্থিত হন। এইরূপে ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী পানিপথের প্রান্তরে তৃতীয়বারের মতো মারাঠা ও আবদালীর বাহিনী সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুত হইল। ভারতের ভাগ্যদেবী কাহার প্রতি প্রসন্না হইবেন, তাহাই নির্ধারিত হইবে এই যুদ্ধে।

উভয় সৈন্যদের মধ্যে মারাঠাবাহিনী অপেক্ষা আবদালীর সৈন্য বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁহাদের বাহিনীর শৃংখলাবোধ, অস্ত্রসজ্জা, সমরনৈপুণ্য সকল কিছুই ছিল শ্রেষ্ঠ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট সংঘর্ষে প্রায় আড়াই মাস কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে মারাঠাবাহিনীতে তীব্র খাদ্য ও রসদের অভাব ঘটে। কারণ, আশেপাশের কোথাও হইতে তাহারা খাদ্য বা রসদ সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল না। ১৪ই জানুয়ারী ১৭৬১ খ্রীঃ উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। মারাঠা পক্ষের সেনাপতি ছিলেন সদাশিব রাও ভাও এবং পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাস রাও। তাঁহাদের সহিত ব্যুহ রক্ষা করিতে-ছিল গোলন্দাজ ইব্রাহিম খাঁ গার্দি। কিন্তু আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণের মুখে মারাঠাদের সকল প্রতিরোধ বন্যার জলের ন্যায় ভাসিয়া গেল। তাহার মধ্যে অকস্মাৎ গুলিতে বিশ্বাস রাও-এর মৃত্যু হইলে সদাশিব রাও ভাও সৈন্যদলে শৃংখলা ফিরাইতে ব্যর্থ হন। তিনিও আফগান সৈন্যের হস্তে নিহত হন। দিনের শেষে অসংখ্য সৈন্যের

যুদ্ধের বিবরণ

প্রাণনাশের মধ্য দিয়া মারাঠাদের চরম পরাজয় ঘটে। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন, 'ফ্রডেল-প্রান্তরের ন্যায় এইটি ছিল এক সর্বজাতীয় সর্বনাশ। মহারাষ্ট্রে এমন একটি পরিবার ছিল না, যেখানে কোন-না-কোন সভ্যের জন্য শোক করিতে না হইয়াছে, বহু গৃহের গৃহস্থকেই মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। একটি আঘাতেই সমগ্র নেতৃত্বের প্রজন্মের ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল।' জাতির এই বিপর্যয়ের সংবাদে পেশোয়া ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

ফলাফল : তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী। মারাঠাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রণনিপুণ অংশ এই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তাহাদের সামরিক শক্তি হ্রাস পাওয়াতে ভারতে রাজনৈতিক মর্যাদাও হইল ধূলায় লুণ্ঠিত। অতঃপর আর কেহই মারাঠাদের সামরিক সাহায্যের কার্যকরিতার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। প্রভাবশালী মারাঠা শক্তি-সংঘ ইহার পর হইতে আপন ঐক্য হারাইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। মারাঠাগণ আর কখনই যুদ্ধের পূর্বের মর্যাদা ফিরিয়া পায় নাই।

বিজয়ী আহম্মদ শাহ আবদালীরও বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। কারণ কিছু-কালের মধ্যেই শিখ জাতির অভ্যুত্থানে তাঁহাকে ভারত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে সত্য সত্যই ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। মারাঠা ও মুসলমানগণের মরণপণ সংগ্রামে উভয়েরই এমন প্রচণ্ড শক্তি ক্ষয় হইয়াছিল যে, তাহাদের কাহারও পক্ষে আর উদীয়মান ইংরাজ শক্তিকে বাধা দিবার ক্ষমতা রহিল না। ভারতে আপন সাম্রাজ্য বিস্তারের যে সুযোগ ইংরাজ বণিকগণ এতদিন সন্ধান করিতেছিল—এই যুদ্ধের ফলে সে সুযোগ তাহাদের হাতে আসিল। পলাশীর যুদ্ধ ছিল ইংরাজ কোম্পানীর আত্মরক্ষার সংগ্রাম আর পানিপথ আনিয়া দিল তাহাদের আত্মরক্ষা হইতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ।

তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই যুদ্ধে মারাঠা শক্তি চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায় নাই। পরবর্তী পেশোয়া প্রথম মাধব রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠাগণ এই বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি কাটাইয়া উঠিয়া ভারতে পুনরায় মারাঠা আধিপত্য বিস্তারে অনেক সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি নিজামকে পরাজিত করেন। হায়দার আলিকে কর দিতে বাধ্য করেন এবং উত্তর ভারতে রোহিলাদের পরাজিত করিয়া এবং রাজপুত রাজ্যগুলি ও জাঠপ্রধানদের দমন করিয়া মারাঠাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের আশ্রয়ে সম্রাট শাহ আলম দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু অকস্মাৎ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যে আবার গোলযোগ আরম্ভ হইল। গ্র্যান্ট ডাফের মতে, মারাঠা জাতির পক্ষে পানিপথের অপেক্ষা মারাত্মক হইয়াছিল এই তরুণ পেশোয়ার অকাল মৃত্যু। সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইবার পূর্বে তাহারা তিন তিনবার ভারতে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারে বাধা দিয়াছিল।

৬ ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের প্রসার [Growth of European Commerce]

ইউরোপে নবজাগরণের পরে ভারত ও আমেরিকার পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন—'উহা মানব ইতিহাসের দুইটি মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা'। তাহার উক্তিটির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সারা পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অকল্পনীয় সম্প্রসারণে। নবাবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশ ছিল মূল্যবান ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। আমেরিকার অঢেল সোনা-রূপা ইউরোপে চালান আসায় সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের যেমন প্রসার ঘটিতে আরম্ভ করে, তেমনি মূলধনও সঞ্চিত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীতে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। সেই অর্থে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যাদিরও অফুরন্ত বাজার হইয়া ওঠে আমেরিকা।

ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধির আর একটি পথ ছিল পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে সমুদ্রতীরবর্তী আফ্রিকার অঞ্চলগুলির স্বর্ণ ও হাতীর দাঁতের ব্যবসা। ষোড়শ শতাব্দীতে এই ব্যবসা স্পেন ও পর্তুগালের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। পরবর্তীকালে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ অঞ্চলগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে দাস ব্যবসায় সর্বপ্রধান ব্যবসায়ে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে হাজার হাজার আফ্রিকান দাসরূপে উত্তর ও দক্ষিন আমেরিকায় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চালান যাইত।

পর্তুগাল ঃ প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া প্রাচ্য দেশসমূহের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল পর্তুগালের হাতে। ভারতে কোচিন, গোয়া, দমন এবং দিউ ছিল তাহাদের প্রধান প্রধান বাণিজ্য ঘাঁটি। প্রথম হইতেই তাহারা বাণিজ্যের সহিত শক্তি ও লুণ্ঠন যোগ দিয়া নিজেদের অর্থ লিপ্সা চরিতার্থ করিত। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের আর্মাডাকে ধ্বংস করার পরে ওলন্দাজ ও ইংরাজগন উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতে আসিতে আরম্ভ করে। পারস্য উপসাগরে পর্তুগীজ নৌবাহিনীকে পরাস্ত করার পরে সাময়িকভাবে ইঙ্গ-পর্তুগীজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্তিমিত হয়। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত চুক্তিতে ইংরাজ ও পর্তুগীজদের প্রাচ্যদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিলুপ্ত হয়। ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি সন্ধিতে পর্তুগাল প্রাচ্যদেশ ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার মানিয়া লয়।

ওলন্দাজ ঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সহিত হল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্তুগীজ অপেক্ষা অনেক তীব্রতর হইয়াছিল। ওলন্দাজগণ ছিল প্রটেস্ট্যাণ্ট। ক্যাথলিক পর্তুগাল-এর বিরোধিতা এবং প্রাচ্যের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব—এই

দুইটি উদ্দেশ্যে ওলন্দাজগণ ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে বিকাশ লাভের চেষ্টা করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লইয়া তাহাদের সহিত ইংরাজদের সংঘর্ষ দেখা দিল। ইউরোপে স্টুয়ার্ট এবং ক্রমওয়েল-এর ইংলণ্ডের সহিত হল্যাণ্ডের সম্পর্ক তিক্ত ছিল। ইহার সহিত ব্যবসায়ের স্বার্থ জড়াইয়া সে সম্পর্ক আরও তিক্ত হইয়া ওঠে। ওলন্দাজগণ করমণ্ডল উপকূলের পুলিকট বন্দর হইতে সূতীবস্ত্রাদি মালয় উপদ্বীপে ও ইন্দোনেশিয়াতে রপ্তানি করিত। ১৬৩০ হইতে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত ওলন্দাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের চরম যুগ। ১৬৯৮ খ্রীঃ চুঁচুড়ার ওলন্দাজগণ বাংলার সুবেদার-এর নিকট নালিশ জানায় যে, ইংরাজগণ কেন মাত্র তিন হাজার টাকা দিয়া বাণিজ্য করিবে এবং তাহাদের কেন শতকরা ৩½ হারে শুল্ক দিতে হয়। এই দুই বিদেশী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১৭৫৯ সালে ক্লাইভ কর্তৃক বিদারার যুদ্ধে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ফরাসী : পর্তুগাল ও হল্যাণ্ডের বণিকদের সহিত ইংরাজ বণিক কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হইলেও ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ডের প্রধানতম শক্তি ফ্রান্সের সহিত দীর্ঘকাল ইংরাজ কোম্পানীগুলির বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বহু পরে ১৬৬৪ খ্রীঃ সুরাটে ফরাসী বাণিজ্যিক কুঠি প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের মতো তাহারা পশ্চিম ভারতের সূতীবস্ত্র কাঁচা রেশম ইত্যাদি রপ্তানি করিত। ইহার পরে তাহারা মসলিপত্তম এবং ইংরাজদের মাদ্রাজের নিকট সান থোম নামে একটি জায়গায় কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু পর বৎসরই গোলকুণ্ডার নবাব ওলন্দাজদের সহায়তায় সে ঘাঁটি হইতে ফরাসীদের বিতাড়িত করেন। ইতিমধ্যে ১৬৭৩ খ্রীঃ ফ্রান্সিস মার্টিন এবং বেলাঙ্গির ডি লিপিনজে নামে দুইজন উদ্যোগী ফরাসী বলিকোণ্ডপুরম্-এর মুসলিম শাসকের নিকট হইতে একটি ছোট গ্রাম ইজারা নেন। ইহাই অতি সাধারণভাবে পণ্ডিচেরী শহরটির পত্তনের ইতিহাস। ফ্রান্সিস মার্টিনের ব্যক্তিগত সাহস, উদ্যম এবং সংগঠন প্রতিভায় দেখিতে দেখিতে পণ্ডিচেরীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে লাগিল। ১৬৭৪ খ্রীঃ বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ তাহাদের চন্দননগরে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলেন।

ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলির ভারতে কাজের একটা বিপদ ছিল। কারণ ইউরোপের রাজনীতির প্রত্যক্ষ ফল ভারতের মধ্যে এই সকল কোম্পানীর সম্পর্ক ঘোরতর-ভাবে প্রভাবিত করিত। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। ইউরোপে তখন ইংলণ্ডের সমর্থন লইয়া ওলন্দাজগণ ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইউরোপে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় তাহারা পণ্ডিচেরী কাড়িয়া লইয়াছিল। কিন্তু চার বৎসর পর রাইসউইক-এর সন্ধির শর্ত অনুসারে ওলন্দাজগণকে পণ্ডিচেরী ফেরৎ দিতে হয়। মার্টিনের নেতৃত্বে পণ্ডিচেরী পূর্ব গৌরব অর্জনে বিলম্ব করে নাই। ১৭০৬ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যুকালে যখন কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল ২০ হাজার, তখন পণ্ডিচেরীর লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ৪০ হাজার।

কিন্তু ভারতের অন্যত্র সুরাট, মসলিপত্তমের বাণিজ্যকুঠিগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভে পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে অর্থাভাবে ফরাসী কোম্পানীগুলির ব্যবসার খুব ক্ষতি হয়।

ইহার পরে ১৭২০ খ্রীঃ পুনঃসংগঠিত হইলে ফরাসীগণ ভারত মহাসাগরের মরিশাস দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি করিয়া ভারতের মালাবার উপকূলে মাহে ও কারিকল বন্দর দুইটি দখল করিয়া প্রাচ্যদেশীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ওলন্দাজ ও ইংরেজদের আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কুঠিগুলিকে দুর্গ নির্মাণ করিয়া সুরক্ষিত করিত। কুঠিগুলিতে যে সৈন্য সংগ্রহ করা হইত তাহাও রাজ্যজয়ের জন্য নহে—নিছক অধিকৃত অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার নিমিত্ত। অবশ্য ডুপ্লে ফরাসী কুঠির শাসনকর্তা হইয়া আসিলে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন। সেইজন্য ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের ন্যায় ভারতেও এই দুই শক্তির মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে। যাহার ফলে ভারত ইতিহাসেও এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

ইংরাজঃ ১৬৬৮ খ্রীঃ ইংরাজ সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই বন্দরটি পাইলে উহা অনতিবিলম্বে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইংরাজদের প্রধান বাণিজ্য-কুঠিতে পরিণত হয়। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা গোলকুণ্ডার প্রধান বন্দর মসলিপত্তমে আর একটি কুঠি স্থাপন করিয়া স্থানীয় হাতে-বোনা সূতীবস্ত্রাদি পারস্যে রপ্তানী করিত, কিন্তু স্থানীয় কর্মচারী ও ওলন্দাজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা অবশেষে পুলিকটের নিকট আর একটি কুঠি স্থাপন করে। সেখানেও ব্যবসার সুবিধা না হওয়ায় তাহারা আবার মসলিপত্তমে প্রত্যাবর্তন করে। গোলকুণ্ডার সুলতান তাহাদের 'স্বর্ণ ফরমান' দান করিয়া ব্যবসার সুযোগ দান করেন। এই ফরমান সত্ত্বেও ব্যবসায়ীদের উপর কর্মচারীদের শোষণ অব্যাহত থাকায় তাহারা অন্য ব্যবসায় কেন্দ্রের সন্ধানে থাকে। ইতিমধ্যে ১৬৩৯ খ্রীঃ তাহারা বিজয়নগর রাজার প্রতিনিধি চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে মাদ্রাজ ইজারা লইয়াছিলেন। দুর্গ নির্মাণ করিয়া মাদ্রাজকে সুরক্ষিত করায় শীঘ্রই মসলিপত্তম অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

ফরাখশীয়ারের ফর্মানঃ ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে দুইটি রাজনৈতিক দলের বিরোধিতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। অবশেষে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে উভয় কোম্পানী মিলিত হইলে ইংরাজ বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করিতে আরম্ভ করে। ১৭১৭ খ্রীঃ সম্রাট ফরাখশীয়ার ইংরাজ কোম্পানীকে যে ফর্মান দেন, তাহাতেই কোম্পানীর ভাগ্য খুলিয়া যায়। বার্ষিক ৩,০০০ টাকার বিনিময়ে ইহাতে ইংরাজ কোম্পানীকে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত আরও নানা সুযোগ তাহারা লাভ করিয়াছিল।

বাংলার সুবেদার মুর্শিদকুলী খাঁ কোম্পানীকে কলিকাতার আশেপাশে জমি ইজারা লইতে দেন নাই। অবশ্য অন্য কোন শর্ত তিনি অমান্য করেন নাই। সেইজন্য দ্রুতগতিতে কলিকাতার এত উন্নতি হইতে লাগিল যে, ১৭৩৫ সালের মধ্যেই তাহার জনসংখ্যা ১ লক্ষে পৌঁছিয়াছিল। ভারত ইঙ্গ-ফরাসীদের বাণিজ্যক্ষেত্র হইলেও ইউরোপের রাজনীতিই তাহাদের সকল কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করিত। ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবলমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১২৫ বৎসর ধরিয়া ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে এক তীব্র বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। দীর্ঘকালব্যাপী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র ছিল ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ। ইহার প্রথম অধ্যায় শেষ হয় ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে। পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র আকার ধারণ করিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা।

স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস (Charles VI, 1711-1740) পরলোক গমন করিলে শুরু হইল অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যথাক্রমে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। ইউরোপ হইতে এই যুদ্ধ উপনিবেশগুলিতেও ছড়াইয়া পড়ে। আট বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ চলিবার পর আয়-লা-স্যাপেলের সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান হইল (১৭৪৮ খ্রীঃ)। উপনিবেশগুলিতে কোন পক্ষই স্থায়ীভাবে জয়লাভ করিতে পারিল না; যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে পরস্পর পরস্পরকে বিজিত রাজখণ্ড প্রত্যর্পণ করিল।

অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ

আয়-লা-স্যাপেলের সন্ধি

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ (১৭৪৬—১৭৪৮ খ্রীঃ) ঃ ডুপ্লে যখন ছিলেন পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা, সেই সময়ে ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলিতেছিল। ইউরোপের সংঘর্ষ ভারতের ইংরাজ এবং ফরাসীর মধ্যেও সংক্রামিত হইল (১৭৪৬ খ্রীঃ)। ডুপ্লে ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী চতুর রাজনীতিবিদ। তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, এখানে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে উৎসাহী হইলেন। ইংরেজগণ স্বভাবতই ভারতে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকে সুনজরে দেখিল না; ফলে, ইউরোপের যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই দুই জাতি ভারতেও সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হইল।

ডুপ্লের নীতি

ইংরাজগণ ভারত মহাসাগরে কয়েকটি ফরাসী জাহাজ আটক করিলে ফরাসী শাসনকর্তা নৌবহর লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং মাদ্রাজ অধিকার করিলেন (১৭৪৬ খ্রীঃ)। ফলে, ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। ইহাই কর্ণাটের বা কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ নামে খ্যাত। কর্ণাটের নবাব ছিলেন তখন আনোয়ার-উদ্দিন। কর্ণাটের ভূতপূর্ব নবাব দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব মারাঠাদের হাতে তখন বন্দী ছিলেন। নিজাম-উল-মুলকের সহায়তায় এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া আনোয়ারউদ্দিন কর্ণাটে শাসন করিতেছিলেন। মাদ্রাজ ছিল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ডুপ্লে তাঁহার অনুমতি না লইয়া মাদ্রাজ অধিকার করায় আনোয়ারউদ্দিন বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ডুপ্লে অবশ্য মাদ্রাজ আনোয়ারউদ্দিনকেই অর্পণ করিবেন—এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আনোয়ারউদ্দিন ডুপ্লের চতুরতা বুঝিতে পারিয়া দশ সহস্র সৈন্য লইয়া মাদ্রাজ অবরোধ করিলেন। কিন্তু মাইলাপুর বা সেণ্ট টোমের

যুদ্ধে মাত্র পাঁচ শত ফরাসী সৈন্যের হস্তে আনোয়ারউদ্দিনের দশ সহস্র সৈন্য পরাজিত হইল। ডুপ্লের মনে ভারতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা আরও উদ্দীপিত হইল। তিনি বুঝিলেন ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত সৈন্যদল সহজেই ভারতীয় শিক্ষিত সৈন্যকে পরাজিত করিতে পারিবে। ডুপ্লে তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই আয়-লা-স্যাপেলের বা এ-লা-স্যাপেলের সন্ধি অনুসারে (Treaty of Aix-Chapelle) ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে ভারতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল (১৭৪৮ খ্রীঃ)। ইংরাজগণ মাদ্রাজ ফিরিয়া পাইল।

ফলাফল

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধে ডুপ্লের তেমন কোন লাভ না হইলেও ফরাসীদের মর্যাদা দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। মাইলাপুরের যুদ্ধে ভারতীয় প্রথায় শিক্ষিত সৈন্যদল যে বিশেষ দুর্বল, তাহা প্রমাণিত হওয়ায় ইংরাজ ও ফরাসীগণ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব-বিস্তারে আরও উৎসাহিত হইয়াছিল।

১৭৫১-১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ-লা-স্যাপেলের সন্ধিতে সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল মাত্র। দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধের পশ্চাতে ছিল দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস। কর্ণাটের সিংহাসন লইয়া আনোয়ারউদ্দিন এবং চাঁদা সাহেবের মধ্যে বিরোধকালে হায়দরাবাদের নিজাম-উল-মূলকের মৃত্যু হইলে (১৭৪৮ খ্রীঃ) তাহার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ এবং দৌহিত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গের নিজামী লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইল। ডুপ্লে চাঁদা সাহেব এবং মুজফ্‌ফরের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ফরাসী শক্তির সহায়তায় চাঁদা সাহেব কর্ণাটের এবং মুজফ্‌ফর জঙ্গ হায়দরাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হায়দরাবাদে এবং কর্ণাটে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। ইহাতে ইংরাজগণ শঙ্কিত হইয়া নাসির জঙ্গ এবং আনোয়ারউদ্দিনের পক্ষ অবলম্বন করিল। এইভাবে ইংরাজ ও ফরাসী এদেশে সংঘর্ষে লিপ্ত হইল।

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ

আনোয়ারউদ্দিন যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিচিনোপলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফরাসীদের সাহায্যপুষ্ট চাঁদা সাহেব ত্রিচিনোপলি অবরোধ করিলেন। হায়দরাবাদের পরিস্থিতিতে নাটকীয় ঘটনা দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হইয়া চলিল। ডুপ্লের ইঙ্গিতে নাসির জঙ্গ আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে (১৭৫০ খ্রীঃ) মুজফ্‌ফর জঙ্গ হায়দরাবাদের অধিপতি হইলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ মুজফ্‌ফর জঙ্গ ফরাসীদিগকে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেন। বুসী নামক একজন ফরাসী সেনাপতি একদল সৈন্যসহ হায়দরাবাদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কর্ণাটের এবং হায়দরাবাদে ফরাসী প্রাধান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু এই সময় রবার্ট ক্লাইভের আবির্ভাবে ঘটনাস্রোতের গতি পরিবর্তিত হইল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরানী হইয়া তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সৈন্য-দলে তিনি যোগদান করেন। দাক্ষিণাত্যে যখন ফরাসী প্রাধান্য একরকম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার সাহসিকতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইংরাজ-স্বার্থ রক্ষা করিয়াছিল।

চাঁদা সাহেব ত্রিচিনোপলিতে মহম্মদ আলিকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজধানী আর্কট একপ্রকার অরক্ষিত ছিল। ক্লাইভের পরামর্শে ইংরাজগণ আর্কট আক্রমণ করিবার সংকল্প করিল। ক্লাইভ অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য হইয়া আর্কট অধিকার করিলেন। চাঁদা সাহেব বা ডুপ্লে কেহই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। চাঁদা সাহেব রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। চাঁদা সাহেব ও ডুপ্লের মিলিত বাহিনীকে ক্লাইভ পরাজিত করিয়া সামরিক প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। ত্রিচিনোপলি অধিকার করিয়া ক্লাইভ মহম্মদ আলিকে কর্ণাটের সিংহাসনে স্থাপন করেন (১৭৭২ খ্রীঃ)। কর্ণাটে তথা দাক্ষিণাত্যে ইংরাজদের মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। দুই বৎসর পরে ডুপ্লে স্বদেশে চলিয়া গেলেন। ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল (১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)। দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধের ফলে ইংরাজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল আর ফরাসীদের প্রভাব হ্রাস পাইতে লাগিল। আর্কটের দরবারে ইংরাজ আর হায়দরাবাদে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রীঃ) : আয়-লা-স্যাপেলের সন্ধি দ্বারা প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইল না। পরবর্তী আট বৎসরে ইউরোপে কূটনৈতিক বিপ্লবের ফলে হইল আরেকটি প্রবলতর যুদ্ধের প্রস্তুতি। অষ্ট্রিয়া ইংলণ্ডের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের সহিত যুক্ত হইল এবং ইংলণ্ড প্রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করিল। এই কূটনৈতিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ হইলে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইল (১৭৫৬ খ্রীঃ)। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হইয়াছিল, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ তাহারই পরিণতি।


ডুপ্লে

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকাতে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। ভারতবর্ষে ফরাসী কুঠিগুলি ইংরাজদের অধিকারে আসিল। অবশেষে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটিল। প্যারিসের সন্ধির শর্তানুসারে ভারতবর্ষে চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে ও ইয়েনান ফরাসীদের অধিকারে রহিল বটে, তবে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের সকল আশা বিনষ্ট হইল। অপরপক্ষে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক শক্তিরূপে ইংলণ্ড সমগ্র পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল।

ডুপ্লের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দুই বৎসর পর ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের আরম্ভ হয় (১৭৫৬ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধেও ইংরাজ এবং ফরাসী পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষেও তাঁহারা আবার সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। ইহাই কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইউরোপে যুদ্ধের সংবাদ ভারতে পৌছিলে ইংরাজরা ফরাসীদের চন্দননগর কুঠি অধিকার করিল (১৭৫৭ খ্রীঃ)। দক্ষিণ ভারতেও ফরাসী এবং ইংরাজদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিল। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করায় ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অন্যদিকে পণ্ডিচেরীর তৎকালীন ফরাসী গভর্নর ইংরাজদের সেণ্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার করিয়া মাদ্রাজ আক্রমণ করিলেন (১৭৫৬ খ্রীঃ), কিন্তু মাদ্রাজের ইংরাজ-গভর্নর পিগট এবং সেনাপতি লরেন্স লালী সেই আক্রমণ প্রতিহত করিলেন। লালী হায়দরাবাদ হইতে বুসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ফলে, নিজামের দরবারে ফরাসী প্রাধান্য লোপ পাইল। ক্লাইভ বাংলা হইতে একদল সৈন্য দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। একটি বৃটিশ নৌবহর মাদ্রাজে ইংরাজদের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলে ফরাসীদের জয়লাভের আশা তিরোহিত হইল। ফরাসী নৌবাহিনীকে পরাজিত করিয়া করমণ্ডল উপকূলে ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। ইংরাজ সেনাপতি স্যার অয়ার কুটের হস্তে বন্দীবাসের যুদ্ধে লালী পরাজিত হইলেন (১৭৬০ খ্রীঃ)। পরবৎসর ইংরাজগণ পণ্ডিচেরী অধিকার করিয়া লালীকে বন্দী করিল। ভারতে ফরাসী প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিতে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হইল। ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের অবসান হইল। ফরাসীরা তাহাদের সকল স্থানই ফিরিয়া পাইল, কিন্তু তাহাদিগকে শুধু-মাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই এই সকল স্থানের কুঠি ব্যবহৃত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের যে রঙীন স্বপ্ন ডুপ্লে দেখিয়াছিলেন, তাহা শূন্যে বিলীন হইল। আর, ইংরাজগণ ভারতে বাণিজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ লাভ করিল।

কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ

ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ: ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীদের মূলে রহিয়াছে ফরাসী সরকারের ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনে ঔদাসিন্য, ফরাসী কোম্পানীর অর্থাভাব, সর্বোপরি সমুদ্রতীরে ইংলণ্ডের আধিপত্য এবং নৌ-বল। তাহা না হইলে দূরদর্শিতা, সমরকুশলতা বা বিচক্ষণতার দিক হইতে ফরাসী নায়ক ডুপ্লে, রবার্ট ক্লাইভ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। পণ্ডিচেরীর গভর্ণর হইয়া ডুপ্লে অসামান্য দূরদৃষ্টি ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন সম্ভব। তাঁহাকে ভারত হইতে অপসারিত করিয়া ফরাসী সরকার অদূর-দর্শিতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, বৃটিশ সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়াছিলেন। তদুপরি সমুদ্রপথে নৌশক্তির প্রাধান্য এবং বাংলা দেশের অতুল ঐশ্বর্য হস্তগত হওয়ায় ইংরাজদের পক্ষে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

৪

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি

[Growth of English East India Company's Commerce and Political Power in Bengal till 1765]

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশ ছিল সর্বাপেক্ষা উর্বর এবং সমৃদ্ধ। এই প্রদেশের শিল্প, কারিগরি ও বাণিজ্য অনেক উন্নত ছিল। বাংলার উপকূলভাগে কোন বাণিজ্যিক পণ্য সুলভ না হওয়ায় দেশের অভ্যন্তর ভাগ হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হইত। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার সুবাদার সুলতান সুজা একটি ফরমানে কোম্পানীকে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে সারা দেশে বাণিজ্যিক সুবিধাদান করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজীবও কোম্পানীকে শতকরা দুই টাকা করিয়া এবং ১½% জিজিয়া করের বিনিময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ প্রদান করেন।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সমস্ত ফ্যাক্টরীকে ফোর্ট উইলিয়াম বা কাউন্সিলের একজন প্রেসিডেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। বাংলার কোম্পানীর বিশেষ মর্যাদা ছিল। ইংরাজ সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে বোম্বাই-এর উপর তাহার কর্তৃত্ব ছিল; আবার মাদ্রাজে ভারতীয় স্থানীয় শাসক এবং ইংলণ্ডের সনদ অনুযায়ী কর্তৃত্ব আরোপিত ছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথম চল্লিশ বৎসরে ভারতে যতই রাজনৈতিক উত্থান পতন ঘটুক না কেন, ইংরাজ কোম্পানীর ব্যবসায়ে ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছিল। অবশ্য এই বাণিজ্য-বৃদ্ধির পিছনে ছিল সম্রাট ফরাখশীয়ারের একটি ফরমান। কলিকাতা হইতে জন শুরিম্যানের নেতৃত্বে সম্রাট ফরাখশীয়ারের দরবারে একটি দূত প্রেরিত হইয়াছিল। ১৭১৭ খ্রীঃ সম্রাট তাঁহার একটি ফরমানে কোম্পানীকে নিম্নলিখিত ব্যবসায়ী সুযোগ-সুবিধা দান করিয়াছিলেন: (i) বার্ষিক ৩০০০ টাকার বিনিময়ে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার স্বীকৃত হয়; (ii) প্রয়োজনবোধে কোম্পানীকে কলিকাতার আশেপাশে আরও জমি ইজারা দেওয়া হইল; (iii) হায়দারাবাদে অবাধে বাণিজ্যের অধিকার বজায় রাখিতে দেওয়া হইল; (iv) শুধুমাত্র মাদ্রাজে দেয় শুল্ক দিলেই চলিবে; (v) বার্ষিক ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে সুরাটেও অবাধ বাণিজ্যের অধিকার তাহারা লাভ করিল; (vi) বোম্বাই-এর টাকশালে অঙ্কিত কোম্পানীর মুদ্রা মুঘল সাম্রাজ্যেও প্রচলনের অধিকার প্রদত্ত হইল।

ফরাখশীয়ারের ফরমান

বাংলায় মুর্শিদকুলি খাঁ অতিরিক্ত জমি ইজারা লইতে দেন নাই। তাহা সত্ত্বেও ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাংলায় মুর্শিদকুলি খাঁ, শায়েস্তা খাঁ প্রমুখের শাসনকালে এই প্রদেশে সুখ শান্তি অব্যাহত থাকায়

ব্যবসা বাণিজ্যের-ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। কর্ণাটের যুদ্ধে ভারতের বুক হইতে ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশংকা চিরতরে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ভারতের বহির্বাণিজ্যের উপর ইংরাজ কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। পণ্যদ্রব্যাদি কেনাকাটা, সেই সমস্ত গুদামজাত করা এবং বহন করিয়া কোম্পানীর কুঠিতে পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য দেশীয়গণের সহিত কোম্পানীর স্বার্থ জড়িত হইয়া পড়িল। ব্যবসার জন্য কোম্পানীকে মূলধন ধার দিতেন ভারতীয় বণিক ও শ্রেষ্ঠিগণ। এইভাবে ভারতীয় এবং ইংরাজ বণিকদের মধ্যে স্বার্থের জট ক্রমশঃই গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল। ইংরাজদের বাণিজ্যের প্রসারের সহিত ভারতীয় ধনী, ব্যবসায়ী এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ভাগ্য জড়াইয়া পড়িল।

নবাবদের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক : এইরূপ অবস্থায় ১৭৫৬ খ্রীঃ বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁহার সিংহাসন লইয়া দাক্ষিণাত্যের ন্যায় জটিলতা দেখা না দিলেও তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। মাসীমা ঘসেটী বেগম এবং পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সৌকত জঙ্গ ছিলেন অপর দুই দাবীদার। ঘসেটী বেগমকে সিরাজ কৌশলে বন্দী করেন। অতঃপর সৌকত জঙ্গ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সে যুদ্ধযাত্রা মধ্যপথে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি ইংরাজদের দমন করিতে কলকাতা আক্রমণ করেন।

নবাবের সহিত কোম্পানীর সংঘর্ষ

আলিবর্দী খাঁ যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনই সিরাজ সংবাদ পান কাশিমবাজারের কুঠির ইংরাজগণ ঘসেটী বেগমের পুত্রের পক্ষে যোগ দিয়াছে। অবশ্য বৃদ্ধ নবাবকে যিনি চিকিৎসা করিতেন, সেই ইংরাজ ইহা অস্বীকার করিলে নবাব সন্তুষ্ট হন। কিন্তু সিরাজ তাহাতে শান্ত হন নাই। নবাবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ ঘসেটী বেগমের পক্ষ নেন এবং চক্রান্ত জটিল হইয়া উঠে। সর্বত্র রটিয়া গিয়াছিল যে, ঘসেটী বেগমের পুত্রই নবাব হইবে। সেইজন্য সিরাজ সিংহাসনে বসিলে প্রথামতো ইংরাজগণ নূতন নবাবকে নজরানা পাঠায় নাই। সিরাজ তাহাতে ক্ষুব্ধ হন। ইংরাজগণ তাঁহার কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছিল। তিনি সিংহাসনে বসিয়াই অত্যন্ত কৌশলে ঢাকা হইতে ঘসেটী বেগমকে মুর্শিদাবাদে আনিয়া গৃহবন্দী করিয়া ফেলেন। ইহার ফলে ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ পুত্রের হাত দিয়া সমস্ত সম্পত্তি কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। সিরাজ তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইবার নির্দেশ দিলেও ইংরাজগণ তাহা প্রত্যাখ্যান করে। ইতিপূর্বেই সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইংরাজগণ কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ ও সংস্কার করে ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা স্বরূপ। সিরাজের বারংবার নির্দেশ সত্ত্বেও ইংরাজ কোম্পানী সে দুর্গ ভাঙ্গে নাই।


সিরাজউদ্দৌলা

ইংরাজ কোম্পানীর ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া সিরাজ পূর্ণিয়া আক্রমণ স্থগিত রাখিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। কলিকাতা আসিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধে ইংরাজগণকে পরাজিত করিয়া দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া যান। ইংরাজগণ ফলতায় পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। আমিনচাঁদকে কলিকাতার ভার দিয়া তিনি ফিরিয়া বিদ্যুৎ গতিতে পূর্ণিয়ায় গিয়া সওকত জঙ্গকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এই কলিকাতা জয়ের সহিত 'অন্ধকূপ হত্যার' কাহিনী জড়িত। ইংরাজ লেখক হলওয়েলের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ১৪৬ জন ইংরাজকে বন্দী করিয়া ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয় এবং জুন মাসের শ্বাসরোধকারী গরমে তথায় এক রাত্রিতেই ১২৩ জনের মৃত্যু হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনী অমূলক বলিয়া মনে করেন। সমসাময়িক রচনাবলীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।* তাহা ছাড়া উল্লিখিত ঘটনার দিন অত অধিসংখ্যক ইংরাজের কলিকাতায় অবস্থিতিও সন্দেহের অবকাশ রাখে।

যাহা হউক, সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা বিজয়ের ফলভোগ করিতে পারেন নাই। কলিকাতা অধিকার করিয়া উহা সুরক্ষিত না করিয়াই তিনি মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা পতনের সংবাদ পাইয়াই ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন এবং কলিকাতার শাসনকর্তার সহিত চক্রান্ত করিয়া অনায়াসে উহা পুনরাধিকার করেন। এই সংবাদ পাইয়া নবাবও কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। ঠিক এই সময়েই আহম্মদ শাহ আবদালী লাহোর পুনরাধিকার করিবার নিমিত্ত দিল্লীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। গুজব রটিয়া যায় যে, তিনি দিল্লী ছাড়াইয়া আরও পূর্বে বাংলাও আক্রমণ করিবেন। পিছনে তাহার মতো দুর্ধর্ষ শত্রুকে রাখিয়া সিরাজ তখনই ইংরাজদের সহিত নূতন করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত বিবেচনা করেন নাই। উহার পরিবর্তে সেই সম্ভাব্য যুদ্ধে বরঞ্চ ইংরাজদের সাহায্য অধিক প্রয়োজনীয় হইবে ভাবিয়া ক্লাইভের সহিত তিনি এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহাই 'আলিনগরের সন্ধি' নামে পরিচিত। এই সন্ধি অনুসারে নবাব ইংরাজগণের দুর্গ নির্মাণ ও মুদ্রা প্রচারের অধিকার স্বীকার করেন এবং কোম্পানীকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করেন। বলা বাহুল্য, এই সন্ধি নবাবের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক না হইলেও তৎকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে না মানিয়া উপায় ছিল না।

আলিনগরের সন্ধি

আলিনগরের সন্ধি

আলিনগরের সন্ধি স্থায়িভাবে শান্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। নবাব ও ইংরাজ উভয়েই শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সিরাজের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রও শুরু হইয়া গিয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ইঁহারা সকলেই নানাভাবে ইংরাজদের সহিত স্বার্থের সম্পর্কে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। কর্মচারীদের এই বিরোধিতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে ক্লাইভ সবিশেষ তৎপর হন। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের জন্য

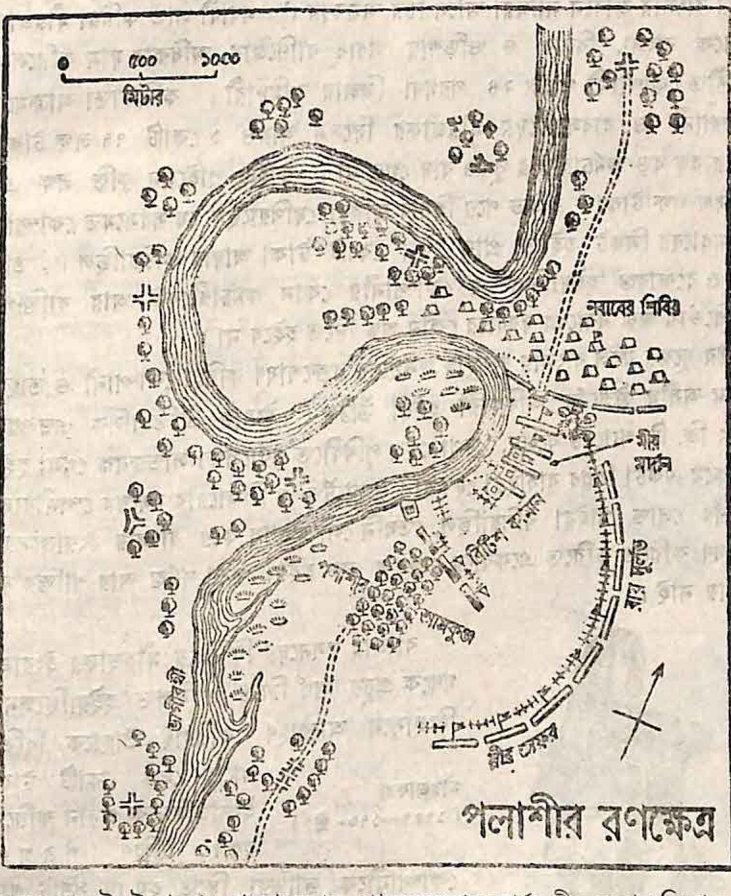
* গোলাম হুসেনের 'সিয়র-উল্-মুতাখেরিনে' ও এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই।

বহু পলাতক ফরাসী বাংলায় উপস্থিত হইয়া নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে ক্লাইভ বিশেষভাবে চিন্তিত হন। তিনি জানিতেন যে-ফরাসী সহায়তা পাইলে নবাবের শক্তি দুর্দম হইয়া উঠিবে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সিরাজের পতন ঘটাইতে যত্নবান হন। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তিনি প্রধান সেনাপতি দুর্বল ও বুদ্ধিহীন মীরজাফরকে বাংলার নবাবপদে অধিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। মীরজাফর প্রমুখ সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত ইংরাজের এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১০ই জুন, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) এই চুক্তি অনুসারে মীরজাফর মসনদ লাভের পর ইংরাজগণকে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রচুর অর্থদানে স্বীকৃত হন। শেষ মুহূর্তে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম উমিচাঁদ উপযুক্ত পুরস্কার না পাইলে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিবার ভীতি প্রদর্শন করে। তখন উমিচাঁদকে শান্ত করিবার জন্য ক্লাইভের পরামর্শে এক জাল চুক্তিপত্র রচিত হয়। ইহাতে উমিচাঁদকে উপযুক্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন, ১৭৫৭) : সকল প্রকার উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। নবাব ফরাসীদের আশ্রয় দান করিয়া আলিনগরের সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন—এই অজুহাতে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। নবাব-পক্ষে মীরজাফর প্রমুখ কর্মচারীবৃন্দ নবাবকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে দেখা গেল একমাত্র মোহনলাল, মীরমদন এবং ফরাসী গোলন্দাজ সেনাপতি সাঁফ্রে ব্যতীত অপর সকলেই পুত্তলিকাবৎ নিষ্ক্রিয় আছেন। ক্লাইভ তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া পলাশীর আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধে সিরাজের জয় অবশ্যম্ভাবী, সেই সন্ধিক্ষণে বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন নিহত হইলেন। মোহনলাল সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া ইংরাজদের প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মীরমদনের পতন সংবাদে সিরাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের বিশাল বাহিনীকে পিছনে রাখিয়া ক্লাইভকে হারাইলেও তাঁহার বিজয় নিশ্চিত ছিল না। এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য সিরাজ মীরজাফরের নিকট আবেদন জানাইলেন। মীরজাফরের পরামর্শে সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধবিরতির আদেশ দিতে বাধ্য হইলেন। প্রথমে অসম্মত হইলেও নবাবের বারংবার আদেশে মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। জয়লাভের আশাও সেই মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল। সাঁফ্রে শত চেষ্টা করিয়াও ইংরাজদের গতিরোধ ও নবাবকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরাজিত নবাব পলায়ন করিলেন। পরে ধৃত হইয়া তিনি মীরজাফরের পুত্র মীরণের নির্দেশে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। মীরজাফর বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু তিনি ইংরাজদের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া রহিলেন। বাংলার প্রকৃত শাসনকর্তা হইলেন ক্লাইভ।

পলাশীর যুদ্ধের তাৎপর্য : ব্যাপকতা এবং রক্তপাতের তীব্রতার বিচারে পলাশীর যুদ্ধকে কোন বৃহৎ যুদ্ধ বলা যায় না। নবাবের সেনাবাহিনীর বিরাট অংশই নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অপরপক্ষে ইংরাজদের ক্ষুদ্র বাহিনী নবাব-বিরোধী সেনামণ্ডলীর নিষ্ক্রিয়তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা

হইলেও পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন: "পলাশীর যুদ্ধ শুধুমাত্র খণ্ডযুদ্ধের অতিরিক্ত আর কিছুই ছিল না, কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগ্রামসমূহের অধিকাংশের তুলনায় ইহার ফলাফল ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ইহা বাংলাদেশ ও পরিশেষে ভারত জয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।"* বস্তুত পলাশীর যুদ্ধ ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের ভিত্তি রচনা করে।



পলাশীর রণক্ষেত্র

এই যুদ্ধের পরেই ইংরাজগণ বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। 'রাজ-স্রষ্টার' ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাহারা ইচ্ছামতো এবং পছন্দমতো ব্যক্তিকে বাংলার মসনদে স্থাপন করিতে থাকে। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়া এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহারা আধিপত্য বিস্তার করে। বাংলার সম্পদ হস্তগত হওয়ায় ইংরাজগণের পক্ষে ভারতে রাজ্যবিস্তার এবং ফরাসীদের দমন করা

* "The battle of Plassey was hardly more than a skirmish, but its result was more important than that of many of the greatest battles of the world. It paved the way for the British conquest of Bengal and eventually of the whole of India."
—*An Advanced History of India*, 3rd Ed., p 657.

অনেকাংশে সহজসাধ্য হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন পলাশীর যুদ্ধের পরোক্ষ ফলস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। আবার এই যুদ্ধের পরিণতিস্বরূপ ভারত ইউরোপীয় ভাবধারার সংস্পর্শে আসে। সুতরাং, পলাশীর যুদ্ধ নিঃসন্দেহে ভারতের ইতিহাসে বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন 'পলাশীর যুদ্ধ' মহাকাব্যে সখেদ উক্তি করিয়াছিলেন 'পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলার জীবনে নামিয়া আসে চির অন্ধকার।' নবাবী লাভ করিয়া মীরজাফর কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দান করিলেন। তাহা ব্যতীত কোম্পানী পাইল ২৪ পরগণা জিলার জমিদারী। কলিকাতা আক্রমণের জন্য কোম্পানী ও ব্যবসায়ীদের মীরজাফর দিলেন আরও ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীদের ঘুষও বাদ গেল না। ক্লাইভ পাইলেন কুড়ি লক্ষ এবং ওয়াটসন দশ লক্ষ টাকা। ক্লাইভ পরে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে সর্বসমেত কোম্পানী ক্রীড়নক নবাবের নিকট হইতে প্রায় তিন কোটি টাকা আদায় করিয়াছিল। তাহা ছাড়া ইহাও বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে কোম্পানীর কোন কর্মচারীকেই আর ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নবাবের দরবারে কোন শুল্ক দিতে হইবে না।

পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার অসহায় জনগণের রক্তশোষণ করিয়া কোম্পানী ও তাহার কর্মচারীবৃন্দ অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া উঠিল। ইংরাজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড থমসন এবং জি. টি. গ্যারেট বলেন, 'দেখা গেল পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা লাভজনক খেলা হইল কোনও রকমে একটা বিপ্লব বাধাইয়া দেওয়া। কোর্টেজ ও পিজারোর সময়ের স্পেনীয়দের যেমন স্বর্ণের লোভ পাইয়া বসিয়াছিল, তেমনি লোভ গ্রাস করে বাংলায় ইংরাজদের। বাংলা শোষণ করিতে করিতে একেবারে রক্তশূন্য না হইয়া পড়া পর্যন্ত আর শান্তির মুখ দেখিতে পায় নাই।


মীরজাফর

বাংলার মসনদের বিনিময়ে মীরজাফর ইংরাজগণকে প্রচুর অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে বিভিন্ন খাতে দেড় কোটি টাকা ইংরাজদিগকে প্রদান করিতে হয়। চব্বিশ পরগণা কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে হয়। সম্রাট শাহ আলম বাংলা জয়ের জন্য পাটনা অধিকার করিলে ইংরাজদের সামরিক সাহায্য ব্যতীত বাংলার মসনদ রক্ষা করাও মীরজাফরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং কার্যতঃ ইংরাজ কোম্পানী মীরজাফরের অভিভাবকের স্থান অধিকার করে।

মীরজাফর
(১৭৫৭—১৭৬০ খ্রীঃ)

শেষ পর্যন্ত হীনচেতা ও দুর্বল মীরজাফরের পক্ষেও ইংরাজ কোম্পানীর কর্তৃত্ব সহ্য করা কঠিন হইয়া ওঠে। বিদেশী কর্তৃত্ব লোপের জন্য তিনি ওলন্দাজগণের সহিত

মৈত্রী স্থাপনে অগ্রসর হন। এই চক্রান্তের সংবাদ অবগত হইয়া চতুর ক্লাইভ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদেরার যুদ্ধে ওলন্দাজগণকে পরাজিত করেন। ফলে, মীরজাফরের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হইল। বাংলা সুবায় কোম্পানীর প্রভুত্ব অপ্রতিহত হইল।

ক্লাইভের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ) পরে কলিকাতার গভর্নর হইলেন ভ্যান্সিটার্ট। তিনি মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত করিলেন (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ)।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মীরকাশিম কোম্পানীকে প্রচুর অর্থ এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলার জমিদারি দান করিলেন। স্বাধীনচেতা মীরকাশিম স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং ইংরাজ প্রভাব হইতে ব্যবধান রক্ষা করিবার জন্য তিনি বিহারের মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইংরাজের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য জানিয়া তিনি শাসনব্যবস্থায় নানাবিধ সংস্কার সাধন করিলেন। অভিজাত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া এবং জমিদারগণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের শর্তে তিনি দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের স্বীকৃতি লাভ করেন। বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণ প্রমুখ ইংরাজ কোম্পানীর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন জমিদারগণকেও মীরকাশিম কঠোর হস্তে দমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে মীরকাশিম সেনাবাহিনীর সংস্কার কার্যেও মনোনিবেশ করেন। সামরু, জেন্টিল প্রমুখ ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষদের সাহায্যে মীরকাশিম তাঁহার সেনাবাহিনীকে ইউরোপীয় প্রথায় সংগঠিত করেন।

মীরকাশিম
(১৭৬০-১৭৬৪ খ্রীঃ)



মীরকাশিম

ইংরাজের সহিত সংঘর্ষের কারণঃ বাণিজ্য-শুল্কঃ কিন্তু শীঘ্রই বাণিজ্য-শুল্ক লইয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। বহু পূর্বেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের রাজ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার এবং বাণিজ্যের সুবিধার জন্য 'দস্তক' বা ছাড়পত্র ব্যবহারের অধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এই সুবিধা দেওয়া হয় নাই। পলাশির যুদ্ধের পর কোম্পানীর কর্মচারীদেরও ব্যক্তিগত বাণিজ্য ও সেই সঙ্গে দস্তকের অপব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অথচ দেশীয় ব্যবসায়ীদের শুল্ক দিবার রীতি ছিল। ফলে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় দেশীয় ব্যবসায়িগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। ইহার প্রতিকারস্বরূপ মীরকাশিম ব্যাণিজ্য-শুল্ক একেবারে রহিত করিলেন।

ইহাতে কোম্পানী ও কর্মচারীদের বাণিজ্যিক সুবিধা চলিয়া গেল। কোম্পানী ইহার প্রতিবাদ করিলে শুল্ক লইয়া এই বিবাদ প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ ধারণ করিল।

বক্সারের যুদ্ধ ঃ পাটনায় ইংরাজ বাণিজ্যকুঠির শাসনকর্তা এলিস পাটনা শহর অধিকার করিলেও মীরকাশিম উহা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, গিরিয়া এবং উদয়নালার যুদ্ধে ইংরাজদের হাতে পরাজিত হন (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তখন অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম মীরকাশিমের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। কিন্তু ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী ইংরাজদের নিকট পরাজিত হইল। মীরকাশিম পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বহু দুঃখকষ্টের মধ্যে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গুরুত্ব :
(ক) রাজনৈতিক

বক্সারের যুদ্ধ ছিল পলাশীর যুদ্ধেরই পূর্ণ পরিণতি। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ কোম্পানী বাণিজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ওঠে ; বক্সারের যুদ্ধে তাহার আধিপত্যের সূচনা। বাংলাদেশে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মতো আর কেহ রহিল না। অযোধ্যাতেও ইংরাজ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

(খ) সামরিক

সামরিক দিক দিয়াও বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইংরাজের সামরিক শক্তির গুণাগুণ বিচার পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে সম্ভব নহে। নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রের ফলে নবাববাহিনীর এক বিরাট অংশ পলাশীর যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ছিল ; কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে নবাব দিল্লীর সম্রাট ও ইংরাজ—উভয়পক্ষই পূর্ণ প্রস্তুতি লইয়াই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। "আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ইহা ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং প্রত্যেকেই তাহার সম্ভাবনা এবং ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ও সতর্ক ছিলেন।"* বক্সারের যুদ্ধে জয় তাই ইংরাজের সামরিক শক্তিরই পরিচয়।

মীরজাফরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা (১৭৬৩-৬৫ খ্রীঃ)

মীরকাশিমের সহিত সংঘর্ষ শুরু হইলে ইংরাজ কোম্পানী পুনরায় মীরজাফরকে বাংলার নবাবপদে স্থাপন করে (১৭৬৩-১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)। উভয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিমতো মীরজাফর কোম্পানীকে প্রভূত অর্থ এবং বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। অবশেষে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র নাজম-উদ্-দৌলাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া মীরজাফর পরলোকগমন করেন।

দেওয়ানী লাভ ঃ মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাংলার নবাব হন। কিন্তু তিনি নামেমাত্র নবাব ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্ণর হইয়া আসিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। দ্বিতীয়বারের শাসনকালে ক্লাইভের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এদেশের উপর কোম্পানীর রাজনৈতিক অধিকার আরও সুদৃঢ় ও আইনসম্মত করা। নামেমাত্র সম্রাট হইলেও শাহ আলম তখনও মুঘল সম্রাট হিসাবে আইনতঃ এদেশে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সম্রাটকে ক্লাইভ কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ প্রত্যর্পণ করেন এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হন। ইহার বিনিময়ে ক্লাইভ সম্রাটের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী লাভ করেন (১২ই আগষ্ট ১৭৬৫)।

*An Advanced History of Indi a,P664

৫

ইংরাজদের সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণ (১৭৬৭-১৮৫৭)

[British Imperial Expansion (1767-1857)]

কর্ণাটের যুদ্ধ পরম্পরা এবং পলাশী ও বিদারার যুদ্ধ জয়ের পরে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক ব্যাপারে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়ে। পলাশী ও বিদারার যুদ্ধ ও বিদারার যুদ্ধশেষে ইংরাজ কোম্পানীর আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার অবসান ঘটিল। এইবার আরম্ভ হইল সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণের পালা। প্রায় শতাব্দীপূর্বে ঔরঙ্গজীবের শাসনকালে কোম্পানীর কর্তা স্যার যোশুয়া চাইল্ড আগ্রাসনী নীতি অকালে গ্রহণ করিয়া ঔরঙ্গজীব কর্তৃক উচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বক্সার প্রান্তরে সেই উদ্ধত মুঘল মহিমা পরাজয়ের কলঙ্ক লিপ্ত করিয়া কোম্পানী প্রাচীন ভাষায় 'সর্বোত্তরাপথ স্বামী' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইতিপূর্বে তাহাদের একমাত্র ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা শক্তিও পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে হৃত শক্তি মুহ্যমান। নিজাম কার্যত বিষদন্তহীন। মহীশূরে হায়দর আলির সবেমাত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ান ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্য তখন মারাঠা সাম্রাজ্যের পরেই ভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম।

মারাঠা শক্তি ধ্বংস

[Maratha Power Destroyed]

এই সময় ইংরাজদের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা সাম্রাজ্যে পেশোয়া-এর সিংহাসন লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধঃ পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণের অকাল মৃত্যুতে (১৭৭২ খ্রীঃ) মারাঠা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। প্রথম মাধব রাও-র ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাওয়ের ষড়যন্ত্রে নারায়ণ রাও নিহত হন এবং রঘুনাথ রাও নিজে পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। নানা ফড়নবীশ প্রমুখ মারাঠা-নায়কগণ নারায়ণ রাও-এ শিশুপুত্রকে পেশোয়া পদে স্থাপন করিলেন। তিনি দ্বিতীয় মাধব রাও নারায়ণ নামে পরিচিত। রঘুনাথ রাও তখন বোম্বাইয়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সাহায্যে পেশোয়া পদলাভের চেষ্টা করিলেন। সুরাটে ইংরাজদের সহিত রঘুনাথ রাও-র সন্ধি হইল (১৭৭৫ খ্রীঃ)। এই সন্ধি অনুসারে রঘুনাথ কোম্পানীকে সলসেটি ও বেসিন দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। রঘুনাথ ইংরাজ সৈন্যের সাহায্যে মাধব রাও নারায়ণের সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু গভর্নর-জেনারেল হেষ্টিংস্ সুরাটে সন্ধি নাকচ করিয়া মাধব রাও নারায়ণের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি 'পুরন্দরের সন্ধি' নামে বিখ্যাত। এই সন্ধির শর্তানুসারে কোম্পানী রঘুনাথের পক্ষ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল এবং বিনিময়ে

সুরাটের সন্ধি

পুররেন্দর সন্ধি

সলসেটি ও ১১ লক্ষ টাকা পাইবে স্থির হইল। কিন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিলে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে বোম্বাই-এর ইংরাজ কর্তৃপক্ষ পরাজিত হইয়া অতি অপমানজনক সর্তে মারাঠাদের সহিত ওয়ার গাঁও নামক স্থানে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। হেষ্টিংস এই সন্ধি অস্বীকার করিয়া বাংলা হইতে সেনাপতি গডার্ডের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ফলে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে মাহাদ্জী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় ইংরাজ ও মারাঠার মধ্যে সন্ধি হইল (১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ)। এই সন্ধি সল্‌বই-এর সন্ধি নামে পরিচিত। কোম্পানী সলসেটি লাভ করিল এবং মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া রঘুনাথ রাও-র পক্ষ ত্যাগ করিল। রঘুনাথ রাওকে বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হইল। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকিলেও হেষ্টিংসের দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার ফলে কোম্পানীর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মারাঠাদের আতঙ্ক হইতে ২০ বৎসর মুক্ত হইয়া পরপর চারটি ঘোরতর সংগ্রামে কোম্পানী মহীশূরকে দমন করতে সক্ষম হয়।

সল্‌বই-এর সন্ধি



হেষ্টিংস

ব্রিটেনের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের উপকরণঃ অধীনতামূলক মিত্রতা (১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ)ঃ গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী। ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল। তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির আর একটি কারণ ছিল ফরাসী ভীতি। এই সময় ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব উৎখাত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। টিপু সুলতানের সঙ্গে ইতিমধ্যে ফরাসীদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতে যাহাতে ব্রিটিশ স্বার্থ ও প্রভুত্ব বিপন্ন না হয়, এইজন্য ভারতীয় নৃপতিগণকে ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে আনয়ন করিবার জন্য ওয়েলেস্‌লী, অধীনতামূলক মিত্রতা' (Subsidiary Alliance) নামক এক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই নীতির মূল কথা হইল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় নৃপতিগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিবে, বিনিময়ে তাঁহাদিগকে ইংরাজের অধীন মিত্রে পরিণত হইতে হইবে। যে রাজ্য অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি গ্রহণ করিবে, সেই রাজ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ প্রতিহত বা দমন করিবার দায়িত্ব ইংরাজ কোম্পানী গ্রহণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য সেই রাজ্যে থাকিবে। সৈন্যদলের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নৃপতিকে বহন করিতে হইবে বা তাঁহার রাজ্যের একাংশ কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। 'অধীন মিত্র' রাজা কোম্পানীর অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন

অধীনতামূলক মিত্রতা

শক্তির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে এবং কোন ইউরোপীয়কে তাঁহার রাজ্যে কোন কার্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। এককথায় যে-দেশীয় নৃপতি স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইবে, তাঁহাকে ইংরাজ রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিবে।

বিভিন্ন রাজ্যের অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি গ্রহণ

হায়দরাবাদ, অযোধ্যা, সুরাট, তাঞ্জোর, কর্ণাট প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকগণ একে একে এই নীতিতে বিনাযুদ্ধে ইংরাজের নতিস্বীকার করিয়া রাজ্য-রক্ষার চেষ্টা করিলেন। এমনকি পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অন্যান্য মারাঠা নায়কগণের ভয়ে বেসিনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া অধীনতা-মূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তি দ্বিতীয় মাধব রাও এবং নানা ফড়নবীশের নেতৃত্বে শক্তি সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সিন্ধিয়া, ভোঁসলে, হোলকার, গাইকোয়াড় প্রভৃতি মারাঠা সামন্তগণ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। ইন্দোরে মলহর রাও হোলকারের পুত্রবধূ অহল্যাবাঈ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার সুশাসন ও প্রজা-হিতৈষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাদ্‌জী সিন্ধিয়াই ছিলেন এককালে মারাঠা-নায়কদের মধ্যে প্রধান। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হয়। নানা ফড়নবীশ তখন মারাঠা সাম্রাজ্যে সর্বেসর্বা, কিন্তু অকস্মাৎ মাধব রাও নারায়ণের মৃত্যুতে এবং দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া পদলাভে মারাঠা সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল। নানা ফড়নবীশের মৃত্যুর পর (১৮০০ খ্রীঃ) মারাঠা শক্তি অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইল। ইন্দোরের শাসনকর্তা যশোবন্ত রাও হোলকার পেশোয়াকে পরাজিত করিয়া পুনায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৮০২ খ্রীঃ)।

মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব



নানা ফড়নবীশ

পেশোয়ার অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ভীত হইয়া বোম্বাই-এর ইংরাজ কর্তৃপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বেসিনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অধীনতামূলক নীতি গ্রহণ করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিলেন (১৮০২ খ্রীঃ)। এই চুক্তি অনুসারে ইংরাজ সৈন্যের সাহায্যে বাজীরাও প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারাইয়া সাময়িকভাবে পেশোয়ার পদ অধিকার করিলেন।

পেশোয়া ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করায় অন্যান্য মারাঠা-নায়ক ক্ষুব্ধ হইলেন। হোলকার, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতি সকলেই পেশোয়া-পদের গৌরব রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু এই সময়েও মারাঠা-নায়কগণ একযোগে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারিলেন না। গাইকোয়াড় যুদ্ধে যোগ দিলেন না। হোলকার একা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনী 'অসাই'-এর যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি আর্থার ওয়েলেস্‌লীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। পরাজিত সিন্ধিয়া আর তখনই যুদ্ধোদ্যম করিলেন না। ভোঁসলে ওয়াড়গাঁও-এর যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হইয়া দেবগাঁও-এর সন্ধি দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিলেন এবং নিজ রাজ্যের একাংশ ইংরাজকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। লাসোয়ারীর যুদ্ধে লর্ড লেকের নিকট পরাজিত হইয়া সিন্ধিয়া সুরজ-অঞ্জন গাঁও-এর সন্ধি দ্বারা ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে ইংরাজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। দিল্লীর সম্রাট সিন্ধিয়ার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ইংরাজের পেন্সন-ভোগী সম্রাটে পরিণত হইলেন। ব্রিটিশ শক্তি ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের পরাজয়

যশোবন্ত রাও হোলকার সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সহিত যোগদান না করায় যে ভুল করিয়াছিলেন, এইবার তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। অবশ্য ওয়েলেস্‌লীও হোলকারকে রেহাই দেওয়ার লোক ছিলেন না। হোলকার ব্রিটিশের আশ্রিত রাজপুত রাজ্য আক্রমণ করিলে ওয়েলেস্‌লী তাঁহার বিরুদ্ধে সেনাপতি লেককে প্রেরণ করেন। ভরতপুরের রাজাও প্রথমে হোলকারের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু দিগের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি হোলকারের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হইলেন, হোলকার অবশ্য যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন না। এই সময়ে ওয়েলেস্‌লী ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্বদেশে গমন করিলে হোলকার রক্ষা পাইলেন। পরে সার্ জর্জ বার্লো হোলকারের সহিত সন্ধি করিলেন (১৮০৬ খ্রীঃ)। হোলকারের রাজ্য ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল।

হোলকার ও ওয়েলেস্‌লী

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে সর্বপ্রধান ঘটনা হইল মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর নিকট ইংরাজের প্রভুত্ব অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি এবং তাঁহার মন্ত্রী ত্রিম্বকজী মারাঠা শক্তিকে সংহত করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে সিন্ধিয়া ভোঁসলে এবং হোলকারের সহিত সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাও করা হইয়াছিল। লর্ড হেষ্টিংস এক নূতন চুক্তিবলে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে মারাঠা সঙ্ঘের নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে অন্য কোন শক্তির সহিত তাঁহার যোগাযোগ করাও নিষিদ্ধ হইল। অধিকন্তু কোঙ্কন, মালব ও বুন্দেলখণ্ড কোম্পানী অধিকার করিয়া লইল। ভোঁসলের সহিতও নূতন করিয়া চুক্তি করা হইল। এইভাবে লর্ড হেষ্টিংস মারাঠা-নায়কগণকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন।

যুদ্ধের কারণ

পেশোয়ার তদানীন্তন মন্ত্রী গোকলার প্রেরণায় হোলকার, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে ও পেশোয়ার সম্মিলিত বাহিনী ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইল। পুনার নিকটবর্তী কিঙ্কিতে ব্রিটিশ দূতাবাস ভস্মীভূত করা হইল। এলফিন্‌স্টোনের আদেশে অনতিবিলম্বে ইংরাজ সৈন্য পুনা আক্রমণ করিলে পেশোয়া পলায়ন করিলেন। 'সীতাবলদীর যুদ্ধে' ভোঁসলে এবং 'মাহীদপুরের যুদ্ধে' হোলকার পরাজিত হইলেন। দ্বিতীয় বাজীরাও পরপর কোরিগাঁও এবং অষ্টির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোম্পানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া বিঠুরে নির্বাসিত করা হইল। পেশোয়ার রাজ্যের অধিকাংশ কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করিবার পর অবশিষ্ট অংশে শিবাজীর এক বংশধরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিক্ষুব্ধ মারাঠাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা চলিল। হোলকার তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ ছাড়িয়া দিতে এবং অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলের রাজ্যের কিয়দংশ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইল। এইভাবে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পতন ঘটিল।

যুদ্ধ ও মারাঠাদের পরাজয়

মারাঠা শক্তির পতন

মারাঠাদের পরাজয়ের কারণঃ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠাগণ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রথম বাজীরাও-এর নীতি পরিত্যাগ করিয়া মারাঠাগণ শক্তিমদে মত্ত হইয়া উঠিল। ফলে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় মারাঠা শক্তিকে দুর্বল করিয়া তুলিল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবনের জন্য শিবাজী বা বাজীরাও-এর মতো নেতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একমাত্র মাধবরাও নারায়ণ ব্যতীত, অপর কোন নেতা তেমন যোগ্যতা বা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। কিন্তু মাধবরাও নারায়ণের অকাল মৃত্যুতে মারাঠা অভ্যুত্থানের শেষ আশাও বিনষ্ট হইল।

সুযোগ্য নেতার অভাব

শিবাজী ধর্মান্ধ ঔরঙ্গজীবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া হিন্দু রাজ্য-গঠনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বাজীরাও 'হিন্দুপাদ্ পাদশাহী' স্থাপনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উত্তর ভারতের হিন্দুগণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য পরধর্মদ্বেষী কেহই ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী মারাঠা-নায়কগণ সে আদর্শ ত্যাগ করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের অত্যাচার হইতে হিন্দু-মুসলমান কেহই রেহাই পায় নাই। তাহার অনিবার্য পরিণতি হইল পানিপথের পরাজয় এবং মারাঠা শক্তির পতন।

শিবাজী ওবাজীরাও-এর অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ

মারাঠা-নায়কগণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব মারাঠা শক্তির পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। শিবাজীর মৃত্যুর পর যে আত্মকলহ দেখা দিয়াছিল তাহা দূর করিয়া প্রথম তিন জন পেশোয়া মারাঠা সাম্রাজ্যে ঐক্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর পেশোয়ার ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। মারাঠা-নায়কগণও স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। মারাঠা সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট হইল। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল ইংরাজগণ।

অন্তর্দ্বন্দ্ব

মারাঠা-নায়কগণ ইংরাজ অপেক্ষা মহীশূর এবং হায়দরাবাদকে অধিক শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। ফলে তাঁহারা মহীশূর ও হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যেমন নিজেদের শক্তি ক্ষয় করিতেন তেমনি মহীশূর এবং হায়দরাবাদকে শত্রু করিয়া তুলিতেন। প্রধানতঃ মারাঠার ভয়েই নিজাম ইংরাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

মারাঠা-নায়কগণের অদূরদর্শিতা

এইসকল কারণ ব্যতীত ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব, ইংরাজ সেনা-নায়কগণের উচ্চতর সামরিক নৈপুণ্য মারাঠা সামরিক নেতৃত্ব অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের ছিল। নৌশক্তির অভাব এবং পাশ্চাত্য প্রথায় সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত না করার জন্যও মারাঠাগণ ইংরাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ইংরাজদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব

মহীশূরের পতন
[Fall of Mysore]

মহীশূরের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া, নিজাম ও ইংরাজ সকলেই হায়দার আলির বিরুদ্ধে এক শক্তিজোটে আবদ্ধ হন। মারাঠাগণ সর্বপ্রথম মহীশূর আক্রমণ করিলে হায়দার অর্থের বিনিময়ে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। নিজাম ও ইংরাজের সম্মিলিত বাহিনী তখন মহীশূর আক্রমণ করে। চঙ্গম ও ত্রিন্‌কোমা যুদ্ধে ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইয়াও হায়দার একাকী তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। শীঘ্রই ম্যাঙ্গালোর অধিকার করিয়া তিনি উল্কাবেগে অশ্বারোহী আক্রমণে বক্সার বিজয়ী হেক্টর মুনরের বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া মাদ্রাজের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে ইংরাজ সরকার তাঁহার সহিত সন্ধি করে (১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)। স্থির হয় যে, উভয়ে বিজিত ভূমিখণ্ড পরস্পরকে প্রত্যাপণ করিবে এবং ভবিষ্যতে উভয়ে পরস্পরের বিপদে সাহায্য করিবে। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হইল।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭ খ্রী:)

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০ খ্রীঃ)ঃ কিন্তু ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর আক্রমণ করিলে ইংরাজগণ সন্ধির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া হায়দারকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করে। ইংরাজের এই বিশ্বাসঘাতকতায় হায়দার স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হইলেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম ও মারাঠাগণ ইংরাজ-বিরোধী এক মৈত্রী গঠন করিলে হায়দার তাহাতে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইংরাজগণ মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী-অধিকৃত 'মাহে' নামক স্থানটি অধিকার করে। এই আচরণে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া হায়দার ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ)। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হইলে হায়দার আর্কট অধিকার করিলেন। এই সময়, সার আলফ্রেড লায়াল-এর ভাষায়, "ভারতে ইংরাজদের ভাগ্য অবনতির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল।" এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করেন ওয়ারেন হেষ্টিংস্। তাঁহারই প্ররোচনায়

মারাঠা-নায়ক সিন্ধিয়া ও নিজাম হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করেন। ফলে, হায়দার আলিকে এককভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয় এবং পোর্টোনোভর যুদ্ধে (১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ) হায়দার পরাজিত হন। নেগাপতম এবং ত্রিন্‌কোমালি ইংরাজ অধিকারে আসে। এদিকে সমুদ্রপথে ফরাসী নৌবাহিনী সাফ্রেঁর নেতৃত্বে হায়দারের সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু কোনরূপ সাহায্য লাভের পূর্বেই অকস্মাৎ হায়দারের মৃত্যু হয় (১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ)।


হায়দার আলি

হায়দার আলির কৃতিত্ব

হায়দার আলি ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য প্রসারের পথে ছিলেন এক প্রবল অন্তরায়। নিজ প্রতিভা ও কর্মক্ষমতাবলে তিনি মহীশূরের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। বিপদে অটল ও অসাধারণ বুদ্ধিমান হায়দার একাধিকবার বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তিসঙ্ঘকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বাধীনতাপ্রীতি তাঁহার চরিত্রকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল। ডক্টর স্মিথ মনে করেন যে, তাঁহার 'ধর্ম, নীতিজ্ঞান অথবা দয়ামায়া ছিল না।' কিন্তু ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালন না করিলেও হায়দার ধর্মজ্ঞানহীন ছিলেন না। ঐতিহাসিক উইলক্স হায়দারকে সকল মুসলমান নরপতিগণের মধ্যে 'সর্বাপেক্ষা সহিষ্ণু' নৃপতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

টিপু সুলতান

হায়দারের মৃত্যুর পর তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্র টিপু সুলতান ইংরাজের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যান। অবশেষে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধিতে (১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ সমাপ্ত হয় উভয় পক্ষ পরস্পরের বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করে। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকে।

কিন্তু ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা ইঙ্গ-মহীশূর বিরোধিতার কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। ইংরাজ ও টিপু উভয়েই ঐ সন্ধিকে সাময়িক যুদ্ধবিরতি বলিয়াই মনে করিতেন। স্বাধীনচেতা টিপু দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরাজ আধিপত্য বিনাশ করিতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। এজন্য তিনি ফ্রান্স ও কনষ্ট্যান্টিনোপল প্রভৃতি দেশের নিকট সাময়িক সাহায্য চাহিয়া দূতও প্রেরণ করিয়াছিলেন (১৭৮৭ খ্রীঃ)। অপরদিকে গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশও ব্রিটিশ শক্তিবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঙ্গালোর সন্ধির শর্ত অমান্য করিয়া নিজামের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গুণ্টুর নামক স্থানটি লাভ করেন। ঐতিহাসিক উইলকস্ ও সার জন ম্যালকম কর্নওয়ালিশের এই আচরণের তীব্র সমালোচনা করিয়া ইহাকে টিপুর সহিত মৈত্রী-চুক্তির বিরোধী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এই বিশ্বাস-ভঙ্গে ক্রুদ্ধ টিপু ইংরাজের আশ্রিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলে কর্নওয়ালিশ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করেন। নিজাম ও মারাঠারাও ইংরাজদের সহিত যোগদান করে। এইভাবে শুরু হইল তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রথম দিকে মাদ্রাজ বাহিনীকে টিপু পরাজিত করিলে কর্নওয়ালিস স্বয়ং টিপুকে পরাজিত করিয়া রাজধানীর নিকট অগ্রসর হইবার সময় টিপু তাঁহার রসদ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে তিনিও প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। তৃতীয় বারের আক্রমণে তাঁহার রাজধানী অবরুদ্ধ করিলে টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইহা শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি (১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ) নামে পরিচিত। সন্ধিবলে মালাবার, দিন্দিগুল, বড়মহল ইংরাজ অধিকারে আসে। কুর্গ-এর রাজার উপরও ইংরাজদের প্রভুত্ব স্বীকৃত হয়। কৃষ্ণা হইতে পেনার নদী পর্যন্ত টিপুর রাজ্যাংশ নিজামকে এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর সন্নিকটস্থ অঞ্চল মারাঠাগণকে সমর্পণ করা হয়। অধিকন্তু টিপু তিন কোটি টাকারও অধিক ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুত হন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ



টিপু সুলতান

স্মিথ বলেন, যুদ্ধ শেষে অনেকের মনে হয় তখন সমগ্র মহীশূর দখল করিলেই আর একটি যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু বিজয়ী ইংরাজ বাহিনীতে তখন রোগরাগী, মিত্রপক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ প্রভৃতির জন্য কর্নওয়ালিশের আশঙ্কা হয় দুর্ধর্ষ টিপু পুনরায় আক্রমণ করিলে পরাজয়ের আশঙ্কা ছিল। আমেরিকার পরাজয়ের পর এই পরাজয়ের ভয় এড়াইতেই তিনি তৎপর হইয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণও শান্তিস্থাপনেই উদগ্রীব ছিলেন। বিশেষ করিয়া কর্নওয়ালিশ মনে করিতেন যে সমগ্র মহীশূর অধিকার করিলে ইংরাজের পক্ষে দেশীয় মিত্রগণের সহিত যথাযথ মৈত্রী-ব্যবস্থা বজায় রাখা দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

টিপুর যুদ্ধ প্রস্তুতি

কিন্তু শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি সম্পর্কে কর্নওয়ালিশের উচ্চাশা শীঘ্রই অলীক বলিয়াই প্রমাণিত হইল। টিপুর ন্যায় স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক নরপতির পক্ষে শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধির অপমানজনক শর্তাদি মানিয়া চলা ছিল অসম্ভব। ম্যালকমের ভাষায়ঃ 'ভাগ্যবিড়ম্বনার ফলে হতোদ্যম না হইয়া তিনি যুদ্ধের ক্ষতসমূহের প্রতিকারে যত্নবান হন।' তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গগুলির তিনি সংস্কার সাধন করেন। দেশের কৃষির উন্নয়ন এবং অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা বাহিনীর সংখ্যা ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করিয়া টিপু নিজ রাজ্যকে শীঘ্রই এক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদের সাহায্য লাভের আশায় টিপু ফরাসী বিপ্লবীদল 'জ্যাকোবিন ক্লাব'-এর (Jacobin club) সদস্যপদও গ্রহণ করেন। ইংরাজ শক্তির উচ্ছেদে টিপুকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক ম্যাঙ্গালোর-এ আসিয়া

উপস্থিত হয়। বিদেশে মিত্রলাভের উদ্দেশ্যে টিপু আরব, কাবুল, কনষ্ট্যান্টিনোপল্, ভার্সাই এবং মরিশাসে দূত প্রেরণ করেন।

টিপুর এইরূপ প্রস্তুতির কথা ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলীর (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ) নিকট অজ্ঞাত রহিল না। লর্ড ওয়েলেসলী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল তাঁহার মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'অধীনতামূলক মিত্রতা' (Subsidiary Alliance) নামক এক নীতি গ্রহণ করেন।

ওয়েলেসলীর প্রস্তুতি

এই নীতি ঘোষণা করার পর টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ওয়েলেসলী সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। তিনি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-মারাঠা-নিজাম মৈত্রীকে পুনরুজ্জীবিত করিতে যত্নবান হন। অতঃপর টিপু তাঁহার 'অধীনতা-মূলক মিত্রতা' নীতি গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে ওয়েলেসলী টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। টিপু প্রথমে ইংরাজ সেনাপতি স্টুয়ার্টের হস্তে সেদাসীরের যুদ্ধে এবং পরে সেনাপতি হ্যারিসের নিকট মালভেলীর যুদ্ধে পরাজিত হন। রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষার উদ্দেশ্যে টিপু অতঃপর তথায় সৈন্য সমাবেশ করেন। শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষার্থে যুদ্ধের সময়ে টিপু বীরের মৃত্যু বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংরাজের এক প্রবলতম প্রতিপক্ষের তিরোভাব ঘটে। টিপুর পুত্রগণ বন্দী হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হন।

চতুর্থ-ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ



ওয়েলেসলী

টিপুর বাহিনী শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রতি অবিচল ছিল। আর্থার ওয়েলেসলী (পরবর্তী নেপোলিয়ন বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটন) শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, (৪ঠা মে বিজয় দিবস) রাত্রিতে যাহা ঘটিল তাহা বর্ণনার অতীত। শহরের এমন কোন বাড়ি ছিল না যাহা লুণ্ঠিত হয় নাই ; এবং আমি জানিয়াছি যে শিবিরে মহা মূল্যবান সমস্ত জহরৎ, সোনার তাল, আমাদের সৈন্য, সিপাহী, এবং অনুচরগণ কর্তৃক সেনাবাহিনীর বাজারে বিক্রিত হইয়াছে। তাহারা (জনসাধারণ) আবার তাহাদের ঘরবাড়িতে ফিরিয়া গিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কাজে যোগ দিবে, তবে তাহাদের যথাসর্বস্বই শেষ হইয়া গিয়াছিল।"

বিজয়ী ইংরাজ পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো মারাঠাগণকে বিজিত মহীশূর রাজ্যের গুণ্ডা ও হারপোনেলী জেলাসমূহ প্রদান করিলেও তাহারা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। নিজামকে মহীশূরের উত্তর-পূর্বে কিছু ভূখণ্ড দেওয়া হইল। মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশই অবশ্য ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইল। পশ্চিমে

মহীশূরের পতন

কানাড়া, দক্ষিণ-পূর্বে ওয়াইনাদ, কোয়েম্বাটোর ও দরপরম জেলা সমূহ, পূর্বে দুইটি অঞ্চল এবং শ্রীরঙ্গপত্তন প্রভৃতি ইংরাজের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মহীশূর রাজ্যের অবশিষ্টাংশে পুরাতন হিন্দু রাজবংশের একজন নাবালক সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এই রাজবংশ ইংরাজেরই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীন রহিল।

মহীশূরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পথে এক বিরাট বাধা দূরীভূত হয়। ভারতের প্রকৃত শত্রু যে একমাত্র ইংরাজ—এই সত্য পিতা হায়দারের ন্যায় পুত্র টিপুও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। হয় মর্যাদাদীপ্ত স্বাধীনতা এবং বিদেশী ইংরাজের বিতাড়ন, না হয় মৃত্যু—ইহাই ছিল টিপুরও আদর্শ।

টিপুর কার্যের মূল্যায়ন

উইলকস্, রবার্টস, রেনেল প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ টিপুকে নিষ্ঠুর ধর্মান্ধ এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরূপে বর্ণনা করিলেও, টিপু প্রকৃতপক্ষে ছিলেন শিক্ষিত, ধর্মভীরু এবং দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক। এডওয়ার্ড মুরের ন্যায় সমসাময়িক ইংরাজ লেখক টিপুর শাসনের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। টিপুর লিখিত পত্রাদি হইতে দেখা যায় যে, তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতার অভিযোগ অমূলক। স্বাধীনতা রক্ষার্থে তিনি যে নির্ভীক শৌর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। ইংরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিপু ভারতীয় রাজন্যবর্গের সক্রিয় সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। মারাঠা ও অন্যান্য দেশীয় নৃপতির সহায়তা পাইলে টিপুর পক্ষে দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরাজের আধিপত্য বিলুপ্ত করা হয়তো অসম্ভব হইত না।

অন্যান্য রাজ্য জয়
[Other Conquests]

ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ ঃ গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস্ (বা লর্ড ময়রা) লর্ড ওয়েলেসলীর ন্যায় সাম্রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হন। ফলে, বিভিন্ন দেশীয় শক্তির সহিত কোম্পানীর পুনরায় সংঘর্ষ বাধে। প্রথম সংঘর্ষ হয় নেপালের সহিত। নেপালের অধিবাসী অর্থাৎ গুর্খাগণ কোম্পানীর রাজ্যে হানা দিত। উপরন্তু নেপালরাজ দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিলে ইঙ্গ-নেপালের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে নেপাল পরাজিত হইলে সগৌলির সন্ধি (১৮১৬ খ্রীঃ) অনুসারে ইংরাজগণ আলমোড়া, নৈনিতাল, মুসৌরী প্রভৃতি স্থান লাভ করে। নেপালরাজ তাঁহার দরবারে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখিতে স্বীকৃত হন। অতঃপর সিকিমের সহিতও ইংরাজদের মৈত্রী স্থাপিত হয়।

সগৌলির সন্ধি

ইহার পর লর্ড হেষ্টিংস্ একে একে রাজপুত রাজ্যগুলিকে কোম্পানীর অধীন মিত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া তোলেন।

রাজপুতানা

প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ ঃ লর্ড হেষ্টিংসের পর লর্ড আমহার্স্ট গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত প্রতিরক্ষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমান্তের সংলগ্ন হইয়া পড়িলে ইংরাজদের সহিত ব্রহ্মরাজের বিবাদ অনিবার্য হইয়া

পড়ে। ১৮২১-১৮২২ খ্রীঃ ব্রহ্মরাজ আসাম জয় করেন। পরবর্তী বৎসর ব্রহ্মসেনা চট্টগ্রামের শাহপরী দ্বীপ অধিকার করেন। ইহার ফলে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ব্রহ্মরাজ ইয়ান্দাবোর (১৮২৬ খ্রীঃ) সন্ধি দ্বারা আরাকান ও তেনাসিরিম অঞ্চলে কোম্পানীকে অর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং মণিপুরকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লন।

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলাফল

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে ইংরাজদের ক্ষয়-ক্ষতি হইলেও লাভ হইয়াছিল অনেক। সমুদ্রোপকূলের অধিকাংশই বর্মার হস্তচ্যুত হইয়া ইংরাজদের অধিকারভুক্ত হয়। আসাম, কাছাড় এবং মণিপুর কার্যত ইংরাজের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ

কিন্তু প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের পরও ভারতের পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করিতে স্বল্পকালের মধ্যেই আর একটি যুদ্ধের পটভূমিকা রচিত হয়। ব্রহ্মদেশের নূতন রাজা থারাবাডি (Thrrawaddy, 1837-1845) ইয়ান্দাবুর সন্ধিকে মানিয়া চলিতে অস্বীকার করেন। ব্রহ্মের দক্ষিণ উপকূলে যে সকল ব্রিটিশ ব্যবসায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা রেঙ্গুনে গভর্নরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে থাকে। ঐ বণিকগোষ্ঠী তাহাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য কলিকাতার ইংরাজ সরকারের নিকট আবেদন জানায়। ইংরাজগণ রেঙ্গুন বন্দর অবরোধ করিয়া ব্রহ্মরাজের একটি জাহাজ অধিকার করিলে বর্মীরা একটি ব্রিটিশ জাহাজের উপর গোলা বর্ষণ করে। এইভাবে দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ শুরু হয়।

সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসী জেনারেল গডউইন (General Godwin) এবং অ্যাডমিরাল অষ্টেন (Admiral Austen)-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। রেঙ্গুন, প্রোম, বেসিন, পেগু প্রভৃতি নিম্ন ব্রহ্মের অঞ্চলগুলি একে একে বিজিত হয় (১৮৫২ খ্রীঃ)। ব্রহ্মরাজ সন্ধি করিতে অস্বীকৃত হইলে ডালহৌসী একটি ঘোষণা দ্বারা সমগ্র নিম্ন ব্রহ্ম ইংরাজ অধিকারভুক্ত বলিয়া বিবৃতি প্রদান করেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলাফল

পেগু অধিকারের ফলে ব্রিটিশ ভারতের পূর্ব সীমান্ত সলউইন (Salween) নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বঙ্গোপসাগরের সমগ্র পূর্ব উপকূলে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রহ্মের নিকট সমুদ্রপথ বন্ধ হইয়া যায়।

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৮৩৮-১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকাল প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের জন্য স্মরণীয়। পারস্য আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে রাশিয়ার দ্রুত প্রভাব বৃদ্ধিতে ইংরাজ সরকার চিন্তিত হইয়া ওঠে। রাশিয়ার প্ররোচনায় পারস্য হিরাট আক্রমণ করিলে গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্তানের সহিত বোঝাপড়া করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। তিনি আফগান আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত মৈত্রীর জন্য আলেকজাণ্ডার বার্নসকে দূতরূপে কাবুলে প্রেরণ করেন। দোস্ত মহম্মদ মৈত্রীর মূল্য রূপে পেশোয়ার দাবি করিলে অকল্যাণ্ড রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্যভুক্ত পেশোয়ার প্রদান করিতে

অস্বীকৃত হন। ফলে, দোস্ত মহম্মদ রাশিয়ার সহিত মৈত্রীস্থাপনে উদ্যোগী হইলে অকল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে বিতাড়িত করিয়া ভূতপূর্ব আমীর শাহ্ সুজাকে আমীরপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তদুদ্দেশে তিনি রঞ্জিত সিংহ ও শাহ্ সুজার সহিত চুক্তিবদ্ধ হন এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (১৮৩৮ খ্রীঃ)। ফলে দোস্ত মহম্মদ সিংহাসনচ্যুত ও শাহ্ সুজা আমীরপদে অধিষ্ঠিত হন (১৮৩৯ খ্রীঃ)। কিন্তু ইহাতে স্বাধীনতাপ্রিয় আফগান জাতি বিদ্রোহ করে ও বহু ইংরাজ সৈন্যকে হত্যা করে; ব্রিটিশ সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল।


লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

পরবর্তী গভর্নর জেনারেল ঃ লর্ড এলেনবরা প্রথমে কাবুল পুনরুদ্ধার করিবার আদেশ দেন। এই কার্যে সেনাপতি পোলক সক্ষম হইলেন এবং কাবুলে নারকীয় হত্যা ও ধ্বংসলীলা সমাপ্ত করিয়া কাবুল পরিত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে শাহ্ সুজা নিহত হওয়ায় দোস্ত মহম্মদ সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন।

সিন্ধু জয়

এই সময়েই লর্ড এলেনবরা সিন্ধুদেশে আমীরগণের সহিত নূতন চুক্তির জন্য স্যার চার্লস নেপিয়ারকে প্রেরণ করেন। কিন্তু নেপিয়ারের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বালুচগণ দূতাবাস আক্রমণ করিলে এলেনবরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইংরাজ বাহিনী দ্বারা সিন্ধু জয় করাইয়া লন।

শিখ জাতির উত্থান

[Rise of the Sikhs]

শিখ জাগরণ

দশম বা শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পাঞ্জাবের শিখজাতি এক দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজীব এবং পাঞ্জাবের মুঘল সুবাদারদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই ধর্মীয় গুরু সেনানায়ক ও রাজনীতিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি এক অপূর্ব ধর্ম উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া 'খালসা' বা পবিত্র সেনাদল গঠন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী কালে যোগ্য শিষ্য বান্দা মুঘল শক্তি রোধ করিতে গিয়া অসামান্য ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। কর্পূর সিংহ নামক নেতার অধীনে শিষ্যগণ যে সংগঠন স্থাপন করে, তাহা পরে 'দল খালসা' নামে পরিচিত হয়। পাঞ্জাব মুঘলের হস্তচ্যুত হইয়া কালক্রমে আহ্‌মদ শাহ্ আবদালীর অধীনে গেল। কিন্তু শিখরা এই বিদেশী, বিধর্মী শাসনকে কিছুতেই স্বীকার করে নাই। পানিপথ-বিজয়ী আবদালী তাঁহার পাঞ্জাব অধিকার বজায় রাখিতে আরও একাধিকবার পাঞ্জাব অভিযান করেন। ১৭৬১ খ্রীঃ আবদালীর ভারত ত্যাগের পর তাঁহার

দুর্বল উত্তরাধিকারী তিমুর শাহের হস্ত হইতে ভারত তাঁহার অধিকৃত রাজ্যগুলি শিখগণ দখল করে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্বে সাহারানপুর হইতে পশ্চিমে অ্যাটক এবং দক্ষিণে মুলতান হইতে উত্তরে কাংড়া ও জম্মু পর্যন্ত শিখ আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

শিখ মিশ্‌ল্ বা সংঘ

এইভাবে পাঞ্জাবে আধিপত্য স্থাপনে সফল হইলে শিখগণ বারোটি মিশ্‌ল্ বা সংঘে বিভিন্ন নেতার অধীনে দলবদ্ধ হয়। কিন্তু অনতিকাল পরেই এই মিশ্‌ল বা সংঘগুলি পাঞ্জাবে সার্বভৌমত্ব লাভের লালসায় পরস্পরের সহিত বিবাদে লিপ্ত হয়। ভারতে ব্রিটিশ শক্তি তখন প্রসারোন্মুখ। এই সন্ধিক্ষণে বিভক্ত ও বিবদমান শিখ সম্প্রদায়কে একত্রীভূত করিয়া 'সুকারচাকিয়া' মিশ্‌লের যে-নেতা এক বিরাট শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনিই ভারত ইতিহাসের মহান নায়ক পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিংহ।

রঞ্জিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীঃ)ঃ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিৎ সিংহের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা 'সুকারচাকিয়া' মিশ্‌লের নেতা মহা সিংহের মৃত্যুকালে রঞ্জিতের বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। এত অল্পবয়সেই 'সুকারচাকিয়া' মিশ্‌লের গুরু দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়। আকবর ও শিবাজীর ন্যায় নিরক্ষর হইলেও তাঁহার সামরিক প্রতিভা ছিল অসাধারণ।

প্রথম জীবন

কাবুলের অধিপতি জামান শাহের আক্রমণকালে (১৭৯৮ খ্রীঃ) তাঁহাকে সাহায্য করিয়া রঞ্জিৎ তাঁহার নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন এবং লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (১৭৯৮ খ্রীঃ)। শীঘ্রই জামান শাহের আধিপত্যকে অস্বীকার করিয়া রঞ্জিৎ পাঞ্জাবে স্বাধীন জাতীয় শিখ-রাষ্ট্র গঠনে অগ্রসর হন।

জামান শাহ্‌ ও রঞ্জিৎ সিংহ

আফগান প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইয়াই রঞ্জিৎ শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরস্থ শিখ মিশ্‌ল্‌গুলি একে একে অধিকার করেন। ইংরাজদের সহিত তখনই বিরোধে লিপ্ত হইতে তিনি চাহেন নাই। এইজন্যই ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে হোলকার ইংরাজের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া ব্যর্থমনোরথ হন। অতঃপর হোলকার পাঞ্জাবের উপর সকল দাবী ত্যাগ করিলে রঞ্জিৎ বিনা বাধায় শতদ্রুর উত্তরাঞ্চলে রাজ্যবিস্তারের সুযোগ লাভ করেন। শতদ্রুর পূর্বতীরস্থ শিখ মিশ্‌লগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তাহারা রঞ্জিতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। রঞ্জিৎ সিংহ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা অধিকার করেন (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহাতে বিরুদ্ধপক্ষীয় শিখগণ ভীত হইয়া ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষও রঞ্জিতের দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধিতে চিন্তিত ছিলেন।

রাজ্য বিস্তার


রঞ্জিৎ সিংহ

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কাতেও ইংরাজগণ শঙ্কিত ছিল। স্থতরাং গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টো রঞ্জিতের সহিত সন্ধি স্থাপনে অগ্রসর হন। ইহার ফলে রঞ্জিৎ ইংরাজের সহিত অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) দ্বারা মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী রঞ্জিত প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি শতদ্রুর পূর্বতীরস্থ শিখ নায়কগণের রাজ্য আক্রমণ করিবেন না। বলা বাহুল্য, এই সন্ধি রঞ্জিতের অখিল শিখ সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।

অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯খ্রীষ্টাব্দ)

তবে পূর্বদিকে রাজ্যবিস্তারে প্রতিহত হইয়া রঞ্জিত উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে রাজ্যজয়ে উদ্যোগী হন। গুর্খাদের নিকট হইতে কাংড়া এবং আফগানদের নিকট হইতে তিনি অ্যাটক অধিকার করেন। পলাতক আফগানরাজ শাহ্ সুজার নিকট হইতে তিনি কোহিনুর হস্তগত করেন (১৮১৪ খ্রীঃ)। অতঃপর তিনি মুলতান, কাশ্মীর ও পেশোয়ারে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইংরাজের সহিত রঞ্জিতের মৈত্রী সম্পর্ক : লর্ড আমহার্ষ্টের সময়ে উভয় পক্ষে দূত-বিনিময়ের মধ্য দিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে শীঘ্রই পারস্পরিক সন্দেহের সূত্রপাত হয়। সিন্ধু দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে ইংরাজগণ ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিতেছিলেন ; আর রঞ্জিতের পক্ষে সিন্ধু দেশের মাধ্যমে বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক স্থাপন বিশেষ স্থবিধাজনক ছিল। সিন্ধু দেশে রঞ্জিতের ক্ষমতাবিস্তারে বাধা দিতে ইংরাজগণ কৃতসঙ্কল্প হন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক আলেকজাণ্ডার বার্নস্‌কে কূটনৈতিক দূতরূপে রঞ্জিতের দরবারে প্রেরণ করেন। এই সময়ে প্রাচ্যে রাশিয়ার দ্রুত অগ্রগতি ইংরাজদের অন্তরে এক 'রুশ ভীতি'র সঞ্চার করিয়াছিল। রাশিয়া পারস্যে প্রাধান্য বিস্তার করিলে ভারতের নিরাপত্তা সম্পর্কে ইংরাজ সরকার বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং শতদ্রুর তীরে রূপার নামক স্থানে রঞ্জিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইহার ফলে পুরাতন মৈত্রী পুনর্স্থাপিত হয়। আবার বেণ্টিঙ্কের সময়েই ইংরাজগণ সিন্ধুর আমীরদের সহিত সন্ধি স্বাক্ষরিত করিয়া রঞ্জিত সিংহের সিন্ধু অধিকারের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দেয়। কিন্তু রাশিয়ার ভয়ে ভীত ইংরাজগণ রঞ্জিত সিংহকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহে নাই। আফগানিস্থানের শাসক দোস্ত মহম্মদ ইংরাজদের সহিত মিত্রতার বিনিময়ে রঞ্জিত সিংহ কর্তৃক অধিকৃত পেশোয়ার দাবি করিলে ইংরাজ সরকার সেই দাবী অগ্রাহ্য করে। প্রথম আফগান যুদ্ধের প্রাক্কালে রঞ্জিত ইংরাজ ও কাবুলের পলাতক রাজা শাহ্ সুজাকে সাহায্যদানে স্বীকৃত হন। শাহ সুজার নিকট হইতে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা অনুদানের সঙ্গে রঞ্জিৎ সিংহ জালালাবাদের উপর দাবী ত্যাগ করেন কিন্তু ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিতের মৃত্যু হইলে ইংরাজরা তাঁহার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয়।

অখিল শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলেও পাঞ্জাবের শিখ রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ

ছিলেন রঞ্জিত সিংহ। প্রজাহিতৈষী শাসক এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী রঞ্জিত সমসাময়িক রাজনীতির উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফরাসী পর্যটক জ্যাকিমোঁ (Jaequemont) তাঁহাকে 'এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টের' 'ক্ষুদ্র সংস্করণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার শাসন ব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক হইলেও প্রজার মঙ্গল সাধনই ছিল ইহার মূল লক্ষ্য। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক ; কিন্তু তাঁহাকে শাসনকার্যে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিযুক্ত ছিলেন। শিখ রাষ্ট্রের দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং জাতীয় সংহতি। তাঁহার সমস্ত মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন ধর্মের লোকদের রাজা ধ্যান সিংহ, ফকির আজিজউদ্দীন ও ভবানী দাস প্রমুখ। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রঞ্জিতের সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি প্রদেশ আবার বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত ছিল। গ্রামগুলি তাহাদের মৌলিক অধিকার ভোগ করিত। কৃষকদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হইত।

শাসন ব্যবস্থা

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ

শিখ সামরিক বাহিনী ভেন্টুরা (Ventura), অ্যালার্ড (Allard), কোর্ট (Court) এভিট্যাবাইল (Avitabile) প্রমুখ ইউরোপীয় সামরিক বিশেষজ্ঞদের শিক্ষায় ইউরোপীয় রণনীতিতে সুশিক্ষিত হয়। তবে রঞ্জিৎ সিংহের সেনাবাহিনীর জাতীয়তাবোধ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে বহু সুশিক্ষিত শিখ সেনাপতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রামসিংহ, গুজর সিংহ, তেজ সিংহ প্রমুখ। হাণ্টার সাহেবের মতে, রঞ্জিতের সৈন্যদলের স্থৈর্য ও ধর্মীয় উৎসাহের সহিত একমাত্র ক্রমওয়েলের 'Ironsides' দিগের তুলনা চলে। এই সামরিক বাহিনী ছিল শিখ রাষ্ট্রের তৃতীয় স্তম্ভ।

সামরিক বাহিনী

লিখিত আইন-কানুন না থাকায় এই সময়ে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান ও প্রথা অনুসারেই বিচারকার্য সম্পন্ন করা হইত। সাধারণ অর্থদণ্ডই ছিল শাস্তিদানের ব্যবস্থা, মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ড প্রদানের রীতি বিরল ছিল। বিচার, রাজস্ব এবং অন্যান্য বিভাগ ছিল রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বিশেষ।

বিচার ব্যবস্থা

অনেকের মতে, রঞ্জিত সিংহ ইংরাজদের বিরুদ্ধে নির্ভীকতা ও সুষ্ঠু রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইংরাজদের বিরুদ্ধে তিনি শিখ রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই করেন নাই। আবার অনেকে মনে করেন যে, ইংরাজদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া তিনি বাস্তব রাজনীতি জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে 'সব লাল হো যায়েগা" অর্থাৎ সবই ইংরাজের করতলগত হইবে। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে শিশু শিখরাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে তিনি যত্নবান হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁহার অযোগ্য বংশধরদের অন্তর্কলহ ও অদূরদর্শিতার পরিণামে শিখরাই দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়।

রঞ্জিতের কৃতিত্ব

পাঞ্জাবের সংযুক্তিকরণ

[Annexation of Punjab]

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়ক সিংহ ক্ষমতা লাভ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে খড়ক সিংহের মৃত্যু হয়। খড়ক সিংহের মৃত্যুর পরের দিন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নাওনহাল সিংহের আকস্মিক মৃত্যু হয়। তখন রঞ্জিত সিংহের অপর পুত্র শের সিংহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। তখন শিখরাষ্ট্রে 'খালসা বাহিনী'ই সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। সেনাবাহিনী কর্তৃক রঞ্জিত সিংহের ও নাবালক পুত্র দলীপ সিংহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। নূতন রাজার অভিভাবিকা হইলেন রানীমাতা ঝিন্দন।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ

পাঞ্জাবের অভ্যন্তরে শিখগণের মধ্যে এই অন্তর্কলহ ও অশান্তি দেখিয়া ইংরাজ কর্তৃপক্ষ শতদ্রুর পূর্ব-দক্ষিণ তীরে সৈন্য সমাবেশ করেন। ইংরাজদের এই সামরিক তৎপরতায় খালসা বাহিনী আশঙ্কা করে যে, ইংরাজগণ পাঞ্জাব আক্রমণের ব্যাপক প্রস্তুতিতে লিপ্ত। লাহোরের কর্তৃপক্ষ শক্তিশালী খালসা বাহিনীর হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভের আশায় তাহাদের ইংরাজ রাজ্য আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করিলেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন খালসাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে লাহোর নিষ্কৃতি পাইবে, অপরদিকে তেমনই ইংরাজ পর্যুদস্ত হইবে এবং রঞ্জিৎ সিংহ যাহা পারেন নাই, তাহা অর্থাৎ শিখ রাজ্যের যমুনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃতি সম্ভব হইবে।

শতদ্রু পার হইয়া খালসা সৈন্য ইংরাজ বাহিনীকে আক্রমণ করিলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হয় (ডিসেম্বর, ১৮৪৫ খ্রীঃ)। মাত্র তিনমাস মুদ্‌কি, ফিরোজশা, তালিওয়াল ও সোব্রাঁও—এই চারিটি স্থানের যুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়াও শিখগণ পরাজিত হন। এই পরাজয়ের প্রধান কারণ—যোগ্য সেনাপতির অভাব এবং লাহোরের কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসঘাতকতা।

লাহোরের সন্ধি
(৯ই মার্চ, ১৮৪৬)

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজবাহিনী লাহোরে উপস্থিত হয় এবং মার্চ মাসের ৯ তারিখে লাহোরের সন্ধি সম্পাদিত হয়। বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী জলন্ধর দোয়াব ও শতদ্রুর দক্ষিণস্থ সমগ্র ভূভাগ ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হয়। ইহা ভিন্ন, বিরাট ক্ষতি-পূরণের অর্থ প্রদানে অক্ষম হইয়া শিখ কর্তৃপক্ষ ইংরাজদের হস্তে কাশ্মীর সমর্পণ করেন। ইংরাজদের নিকট হইতে কাশ্মীর দশলক্ষ পাউণ্ডে ক্রয় করেন জম্মুর ডোগ্‌রা নায়ক গুলাব সিংহ। অমৃতসর সন্ধির (১৬ই মার্চ, ১৮৪৬ খ্রীঃ) দ্বারা কাশ্মীর ইংরাজদের অভিভাবকত্বে একটি দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয়। সঙ্কুচিত পাঞ্জাবের শাসন বালক রাজা দলীপের নামেই রহিল, তবে শাসনসংক্রান্ত সকল ক্ষমতা হেনরী লরেন্স নামে লাহোরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্টের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল। একদল ইংরাজ সৈন্য লাহোরে মোতায়েন থাকে।

অমৃতসরের সন্ধি
(১৬ই মার্চ, ১৮৪৬ খ্রীঃ)

কিন্তু পাঞ্জাব সম্পর্কে অবলম্বিত ব্যবস্থায় 'স্থায়িত্বের সম্ভাবনা' ছিল না। প্রথম যুদ্ধের অবসানে ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিয়া শিখগণ মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। লাহোরের ইংরাজ শাসনকর্তার হস্তে সকল ক্ষমতা থাকাও শিখগণের নিকট অসহ্য ছিল। ইংরাজ বিরোধী মনোভাবের জন্য রাজমাতা ঝিন্দন নির্বাসিতা হইলে শিখদের ক্ষোভ ও ক্রোধ চরমে ওঠে। মুলতানের শাসক মূলরাজ বিদ্রোহী হন ও তাহার পর বিদ্রোহ করেন হাজারার শাসক ছত্তর সিংহ। তাঁহার পুত্র শের সিংহ ছিলেন লাহোর দরবারে শিখবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক। তিনি এই বিদ্রোহ-দুইটিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্রোহের রূপ দিতে সচেষ্ট হন। পুরাতন শত্রু আফগানদিগকে পেশোয়ার শহর প্রদানের আশ্বাস দিয়া শিখগণ তাহাদিগকে বশীভূত করে। শিখগণের এই প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড ডালহৌসীও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তিনিও শিখ রাজ্য ধ্বংসের জন্য গর্বোদ্ধত ঘোষণা করেন: 'অতীতের উদাহরণ দ্বারা সতর্কিত না হইয়া, দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া শিখ জাতি যুদ্ধের আহ্বান জানাইয়াছে এবং প্রতিহিংসাসহ তাহারা ইহার প্রত্যুত্তর পাইবে।'

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পটভূমিকা

মূলরাজের বিদ্রোহ

এইভাবে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ আরম্ভ হইলে শিখগণ চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও মূলতান ও গুজরাটের যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হয়। মূলরাজ বিতাড়িত হন এবং ছত্তর সিংহ ও শের সিংহ আত্মসমর্পণ করেন। লর্ড ডালহৌসী দলীপ সিংহকে পদচ্যুত করিয়া এক ঘোষণাবলে পাঞ্জাব অধিকার করেন (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ দলীপ সিংহকে বৃত্তিদান করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। পাঞ্জাব বিজয়ের ফলে কোম্পানীর সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পর্বতরাজির পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

শিখরাজ্যের বিলুপ্তি: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার

ডালহৌসী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণ
[Dalhousie and British Imperial Expansion]

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে ডালহৌসীর শাসনকাল (১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রীঃ) এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লর্ড ডালহৌসী ছিলেন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী। এদিক দিয়া তিনি লর্ড ওয়েলেসলীর সহিত তুলনীয়। তবে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, ওয়েলেসলীর রাজ্যবিস্তারের পশ্চাতে ছিল ফরাসী ভীতি। কিন্তু ডালহৌসীর রাজ্যবিস্তার নীতির পশ্চাতে সেইরূপ কোন কারণ ছিল না। রাজ্য অধিকার করাই ছিল তাঁহার উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতির একমাত্র লক্ষ্য।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ডালহৌসী তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন: যুদ্ধ, 'ফিয়াট' বা ঘোষণা, স্বত্ববিলোপ নীতি এবং কুশাসনের অজুহাত। যুদ্ধনীতির প্রয়োগ করা হয় পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ ও দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের

ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে বহুদূর বিস্তৃত হয়। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাব অধিকার করিলে তথাকার শাসন-দায়িত্ব চীফ কমিশনার হেনরী লরেন্সের উপর অর্পণ করা হয়। পাঞ্জাব অধিকারের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইংরাজগণ অতঃপর বহুবিধ সংস্কারের দ্বারা পাঞ্জাবের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে। ফলে, স্বল্পকালের মধ্যেই শিখজাতি পরাজয়ের গ্লানি বিস্মৃত হইয়া ইংরাজদের অনুগত মিত্রকুলে পরিণত হয়।

যুদ্ধনীতি ও সাম্রাজ্যবিস্তার

পাঞ্জাব

অপরদিকে, ইংরাজগণ দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে জয়ী হইলে এক ঘোষণাবলে পেগু প্রদেশটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয় (১৮৫২ খ্রীঃ)। বঙ্গোপসাগরের সমগ্র পূর্ব উপকূলে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে, লর্ড ডাফরিনের আমলে উত্তর ব্রহ্ম অধিকৃত হইলে ব্রহ্ম-বিজয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক নিম্ন ব্রহ্ম জয় ছিল ঘোষণা বলে তাহারই প্রথম পদক্ষেপ।

ব্রহ্মদেশ



লর্ড ডালহৌসী

সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনায় স্বত্ববিলোপ নীতি ডালহৌসী (Doctrine of Lapse) প্রবর্তন করেন। এই নীতির মূল কথা ছিল যে, কোম্পানীর আশ্রিত কোন অপুত্রক শাসকের মৃত্যু হইলে তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে এবং ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতীত কোন দত্তক পুত্র রাজ্যলাভের অধিকারী হইবে না। এই নীতি ডালহৌসীর শাসনকালের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ঐ নীতি অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগও করা হইয়াছিল। মাণ্ডভী (Mandavi) রাজ্যে (১৮৩৯ খ্রীঃ), কোলাবা এবং জলাউন (১৮৪০ খ্রীঃ) এবং সুরাটে (১৮৪২ খ্রীঃ) ঐ নীতি পূর্বেই কার্যকরী করা হইয়াছিল। তবে ইহাও সত্য যে, ডালহৌসীর পূর্বে ঐ নীতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। ঐতিহাসিক আইনস (Innes)-এর ভাষায়ঃ 'তাঁহার প্রত্যেক রাজ্য জয়েরই পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার পূর্বসূরিগণ সাধারণত পরিহারযোগ্য হইলে রাজ্য অধিকারকে পরিহার করার নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্ভব হইলে রাজ্য অধিকারের সাধারণ নীতিই

স্বত্ববিলোপ নীতি

ডালহৌসী গ্রহণ করিয়াছিলেন।' নবোদ্যমে স্বত্ববিলোপ নীতি অনুসরণ করিয়া ডালহৌসী সাতারা (১৮৪৮ খ্রীঃ), জৈনপুর ও সম্বলপুর (১৮৫০ খ্রীঃ), উদয়পুর (১৮৫২ খ্রীঃ), নাগপুর (১৮৫৩ খ্রীঃ) এবং ঝাঁসী (১৮৫৪ খ্রীঃ) প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই নীতির বলেই কর্ণাটক ও তাঞ্জোরের শাসকদ্বয়ের যথাক্রমে ১৮৫৩ এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে ডালহৌসী ঐ রাজ্য দুইটি গ্রাস করেন। দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর (১৮৫৩ খ্রীঃ) পর তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেব বা ধুন্দু পন্থও অনুমোদিত বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হন। এই ব্যবস্থাকে ঐতিহাসিক কেই (Kaye) 'কঠোর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কুশাসন ও অন্যান্য অজুহাতে রাজ্যবিস্তার

কুশাসন ও অন্যান্য অজুহাতেও ডালহৌসী সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কুশাসনের অজুহাতে তিনি অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলীকে বৃত্তিদান করিয়া তাঁহার রাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এস্থলে স্মরণীয় যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলীর চুক্তি অনুযায়ী অযোধ্যার নবাবের কোন ক্ষমতা ছিল না, অথচ রাজ্যশাসনের দায়িত্ব তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। সুতরাং, ক্ষমতাবিহীন দায়িত্ব থাকায় নবাবগণ রাজ্যের শাসনকার্যের প্রতি যাথাযোগ্য মনোযোগ দিতে পারেন নাই। লর্ড বেন্টিঙ্ক ও লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজ্যের কুশাসনের প্রতি নবাবগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল পান নাই।

কুশাসনের কারণে না হইলেও কোম্পানীর সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখিবার ব্যয় বাবদ অর্থ দিতে হায়দরাবাদের নিজাম অসমর্থ হইলে তাঁহার নিকট হইতে বেরার প্রদেশটি কাড়িয়া লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

ডালহৌসীর রাজ্যবিস্তার নীতির ফল

লর্ড ডালহৌসী এইভাবে রাজ্য অধিকার করিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ব্রিটিশের একান্ত অনুগত মিত্র অযোধ্যা অধিকারকে অনেকেই তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ডালহৌসী স্বয়ং স্যার জর্জ কাউপারকে (Sir George Couper) লিখিত এক পত্রে (১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫৫) স্বীকার করিয়াছিলেন যে, অযোধ্যা অধিকার "আন্তর্জাতিক আইনানুগ নহে।" স্যার হেনরী লরেন্সের মতে, অযোধ্যা-জয়ের ঘটনাটি 'ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে'। অযোধ্যা অধিকারের ঘটনা হইতে দেশীয় রাজন্যবর্গ বুঝিলেন যে, কোম্পানী ইচ্ছামতো তাঁহাদের রাজ্য গ্রাস করিবে। দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকারের রীতিকে অগ্রাহ্য করিয়াও ডালহৌসী হিন্দুদের সংস্কারে আঘাত করেন। তাঁহার নীতির ফলেই ভারতে ব্রিটিশের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেইসঙ্গে একটি প্রবল ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবও সঞ্চারিত হয়।

অধীনতা-পাশ হইতে সার্বভৌমত্ব—সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফল

[Subsidiary Alliance to Paramountcy— Effects of Imperialism]

লর্ড ক্লাইভের কূটনৈতিক চাতুর্যের ফলে ইংরাজদের যে প্রাধান্য ভারতে স্থাপিত



হইয়াছিল, তাহা লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। ওয়েলেসলীর 'অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) নীতির মূল কথা ছিল দেশীয় রাজন্য-

বর্গকে ইংরাজদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইতে হইবে। এই মিত্রতায় আবদ্ধ হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি কোম্পানীর অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন শক্তির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে না। বিনিময়ে মিত্ররাষ্ট্র রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ইংরাজ সরকার। হায়দরাবাদ, অযোধ্যা, তাঞ্জোর, সুরাট, এমনকি পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পর্যন্ত ইংরাজের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করেন। ওয়েলেসলীর পরিচালনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অচিরেই এক 'অগ্রসর' নীতির রূপ গ্রহণ করে।

'অধীনতামূলক মিত্রতা' (Subsidiary Alliance)

এই 'অগ্রসর' নীতি লইয়া ইংলণ্ডে অনেক বাকবিতণ্ডা হইলেও পরবর্তীকালে এই নীতিই কার্যত বহাল থাকে। লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'সার্বভৌম অধিকারে' পর্যবসিত হয়, এবং লর্ড ডালহৌসীর আমলে ইহা পূর্ণতা লাভ করে। কট্টর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসী একদিকে যেমন পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন পেগু ও পাঞ্জাব জয় করিয়া, অপরদিকে তেমনই স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ ও কুশাসনের অজুহাতে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ করেন। এই আগ্রাসী নীতির পরিণামে ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সত্য, কিন্তু ভারতব্যাপী ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবও গড়িয়া উঠিতে থাকে। নাগপুর ও অযোধ্যা অধিকার করিয়া লর্ড ডালহৌসী যে নির্দয়তার স্বাক্ষর রাখিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। এদেশে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, ইংরাজ শাসন দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এবং ইহারই পরিণামে ঘটে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ।

ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব (British Paramountcy)

সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফল

৬ প্রশাসনিক ভিত্তিসমূহ
[Administrative Foundations]

ব্রিটিশ রাজনৈতিক শক্তি বিকাশের প্রকৃতি ঃ কোম্পানীর **দেওয়ানী** লাভ ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহা দ্বারা কোম্পানী বাংলা সুবায় রাজস্ব আদায়ের আইনসম্মত অধিকার প্রাপ্ত হয়। 'এই অধিকার কোম্পানীর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।'* বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোম্পানী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এদেশে কোম্পানীর মানমর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব লাভ করায় কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এবং কোম্পানী তাহার শক্তি-সঞ্চয়ে সমর্থ হয়। ফলে, ভারতে কোম্পানীর রাজ্যবিস্তারে পরবর্তীকালে বিশেষ সুবিধা হয়।

দেওয়ানীর গুরুত্ব

১৭৬৫ খ্রীঃ হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই বাংলার প্রকৃত শাসন-কর্তা হইয়া দাঁড়াইল। সৈন্যদল ইহার নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল এবং সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাহার হাতে আসিয়া পড়ে। দেওয়ান হিসাবে কোম্পানী সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাছাড়া নবাবের সহিত সন্ধির শর্ত অনুসারে একজন ডেপুটী সুবেদার নিয়োগ করিয়া বাংলায় পুলিশী এবং বিচার বা নিজামত ব্যবস্থার উপরেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিল। ফলে, এই ব্যবস্থায় একই ব্যক্তি কোম্পানীর ডেপুটী দেওয়ান এবং নবাবের ডেপুটী সুবেদার হিসাবে কাজ করিতে থাকে। ইহাই ইতিহাসে **দ্বৈত শাসন** (**'Double Government'**) নামে পরিচিত। ইতিপূর্বে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বাংলার নবাব নিজামতী ক্ষমতাও প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং, নবাব কার্যতঃ নামেই নবাব রহিলেন। শাসনের দায়িত্ব নবাবের হাতে থাকিল, কিন্তু শাসনক্ষমতা ইংরাজের করায়ত্ব রহিল। কোম্পানী তাহার দেওয়ানীর দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলায় রেজা খাঁ এবং বিহারে সিতাব রায়কে নিযুক্ত করিল। ইহারা 'নায়েব দেওয়ান' নামে অভিহিত হইল। আইনতঃ নবাবের অধীন হইলেও প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর স্বার্থরক্ষাই ছিল তাহাদের প্রধান দায়িত্ব।

দ্বৈত শাসন

এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কোম্পানীর পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও বাংলাদেশের পক্ষে ইহা ছিল দুর্গতির কারণ। ইহার ফলে নবাবের উপর শাসনের দায়িত্ব রহিল, ক্ষমতা রহিল না। কোম্পানীর নিকট শাসনের ক্ষমতা থাকিল, দায়িত্ব থাকিল না। ক্ষমতা ও দায়িত্বের এই বিচ্ছিন্নকরণের জন্য জনসাধারণের দুঃখের অবধি রহিল না। কোম্পানীর কর্মচারিগণ ব্যক্তিগত ব্যবসায় তথা স্বার্থ সিদ্ধির কার্যে মগ্ন থাকায় এবং নবাবের হস্তে ক্ষমতা থাকায় দেশে কুশাসন পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে। ঐতিহাসিক কে (Kaye)-এর ভাষায়ঃ 'দ্বৈত শাসন

দ্বৈত শাসনের ক্রটি

* **Ishwari Prasadi :** *A History of Modern India* **p. 67**

বিশৃঙ্খলাকে আরও জটিল ও দুর্নীতিকে আরও দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।' বাংলাদেশের জনসাধারণকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা পূর্ণমাত্রায় প্রকট হয় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'—১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে।

কেন্দ্রিকতার বৃদ্ধি (হেস্টিংস হইতে কর্নওয়ালিশ)ঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সময়ে প্রবর্তিত রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিট-এর ভারত আইন—এই দুইটি আইন প্রবর্তন করিয়া বৃটিশ সরকার ভারতে কোম্পানীর শাসন কার্য নিয়ন্ত্রিত করিত। কোম্পানীর অর্থনীতি পরিচালিত হইত ইংরাজদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া।

দেওয়ানী লাভের অব্যবহিত পরে তদানীন্তন অবস্থায় বাংলা সুবায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। কোম্পানীর হাতে শুধুমাত্র ছিল তদারকীর ভার। অল্পদিনের মধ্যে দেখা গেল এইভাবে প্রাচীন পন্থায় শাসন পরিচালনা দ্বারা ব্রিটিশ স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং, কোম্পানী দেশ-শাসনের সকল বিভাগ সরাসরি নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া লইল। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও কর্নওয়ালিশের শাসন কালে বাংলা সুবার শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নূতন ভাবে কেন্দ্রীভূত করিয়া ইংলণ্ডে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে ঢালিয়া সাজানো হয়। নূতন নূতন অঞ্চলে বৃটিশ শক্তি প্রসারের ফলে, নূতন নূতন সমস্যা, নূতন নূতন প্রয়োজন, নব নব অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণার জন্যও এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সর্বোপরি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন তিনটি স্তম্ভের উপর খাড়া হইয়াছিল; সরকারী কৃত্যক (Civil Service), সেনাবাহিনী এবং পুলিশ। ইহার প্রধান কারণ, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ইংরাজ শাসনের স্থায়িত্ব আনা। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় না থাকিলে ইংরাজ বণিক ও উৎপাদকগণ সারা দেশের আনাচে-কানাচে কি করিয়া বিলাতী পণ্য বিক্রী করিবে? সেইজন্য প্রয়োজন সুশাসন ও দক্ষ পুলিশ ব্যবস্থা। আবার বিদেশী বলিয়া তাহাদের স্বভাবতই সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করিয়া সাম্রাজ্য না চালাইলে চলিবে না। অতএব, উন্নততর এবং সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর চাহিদা। এই তিনটি স্তম্ভ একদিকে যেমন সুশাসন সম্ভব করিয়াছে, তেমনি আনিয়াছে প্রশাসনিক কেন্দ্রিকতা।

ওয়ারেন হেস্টিংসঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল শাসন সংস্কার। তিনি প্রথমেই ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন বিলোপ করেন। কোম্পানী নিজ হস্তে দেওয়ানী শাসনের ভার গ্রহণ করিল। বাংলার নায়েব সুবা রেজা খাঁ ও পাটনার নায়েব সুবা সিতাব রায় পদচ্যুত হইলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার এক শ্রেণীর কালেক্টরের উপর দেওয়া হইল। কালেক্টরদের সাহায্যের জন্য ভারতীয় দেওয়ান নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন হেষ্টিংস।

মামলা-মোকদ্দমার কাগজপত্র সংরক্ষণ, সুদের হার হ্রাস, হিন্দু ও মুসলমানদের নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে বিচার লাভের ব্যবস্থা, কাজী ও মুফতিদের মাসিক বেতনদান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া হেষ্টিংস শাসন ব্যবস্থা সুসংহত করিতে চেষ্টা করেন।

ব্রিটিশ সরকারের দিক হইতে শাসন কেন্দ্রীকরণের প্রথম প্রচেষ্টা হয় হেষ্টিংস-এর

আমলে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করাইয়া। ইহাতে কলিকাতার গভর্নরকে বোম্বাই ও মাদ্রাজের উপর কর্তৃত্ব ভার দেওয়া হইল এবং তাঁহার পদের নাম হইল গভর্নর জেনারেল। পরবর্তীকালে পিটের ভারত শাসন আইন শাসন ব্যবস্থাকে আরও কেন্দ্রীভূত করে।

কোম্পানী এতদিন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিত অতি অল্প বেতনে কর্মচারী নিয়োগ করিয়া ; নিজেদের আয়বৃদ্ধির জন্য তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার অনুমতি দেওয়া ছিল। ইহার ফলে কর্মচারিগণ অত্যন্ত দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া ওঠে। হেস্টিংস এবং কর্নওয়ালিশ পিটের আইনের শর্ত অনুযায়ী কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

নূতন বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থা সংগঠন

[New Judicial and Police Organisation]

বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট স্থাপন করিয়া ইংরাজগণ ভারতে এক নূতন বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। আবার ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশীয় আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি শুধু বাণিজ্য বিভাগ হইতে শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেন। হিন্দু ও মুসলমানদের শাস্ত্রানুসারে আইন বিধিবদ্ধ করান। প্রতিটি জেলায় একটি দেওয়ানী ও একটি করিয়া ফৌজদারী আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার ন্যস্ত হয় ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ; ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন কাজী বা মুফতি। মফস্বল আদালতের মামলার আপীলের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত স্থাপিত হয়। স-কাউন্সিল গভর্নর জেনারেল সদর দেওয়ানী এবং নবাব সদর নিজামত আদালতের কার্য পরিচালনা করিতেন। অবশ্য কোম্পানী ধীরে ধীরে তাঁহার কার্যের উপরেও তদারকীর ক্ষমতা অধিকার করে। এইভাবে হেস্টিংস-এর সংস্কারের ফলে এক নূতন কার্যকরী বিচার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কর্ণওয়ালিশ আসিয়া বিচার ব্যবস্থা আরও উন্নত এবং সুসংহত করেন। রাজস্ব ও বিচার বিভাগকে তিনি স্বতন্ত্র করিয়া দেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগেই বিভিন্ন স্তরের বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্নে ছিল সদর আমিন ও মুনসেফী আদালত। এই সকল বিচারালয়ে সাধারণ দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা ছিল। সদর আমিন ও মুনসেফী আদালতের উপরে প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই জেলা আদালতগুলি এক একজন ইংরাজ জেলা-জজের অধীনে ছিল। জেলা-জজকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাঁহাকে সহায়তা করার জন্য একজন হিন্দু পণ্ডিত ও একজন মুসলমান কাজীকে নিযুক্ত করা হয়। জেলা-আদালতসমূহের উপরে ছিল চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয় (Provincial Courts)। এই প্রাদেশিক আদালতগুলি কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং পাটনায় স্থাপিত হয়। এই সকল আদালতের প্রত্যেকটিতে তিনজন ইংরাজ বিচারককে সাহায্য করিবার জন্য পণ্ডিত, কাজী প্রভৃতি ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত হয়। জেলা-জজের

বিচারের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক বিচারালয়ে আপীল করা চলিত। দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। ইহার বিচারকার্য পরিচালনার ভার সপারিষদ গভর্নর-জেনারেলের উপর ন্যস্ত করা হয়। দেওয়ানী বিচারব্যবস্থার অনুরূপ ফৌজদারী বিচারব্যবস্থাও গঠিত হয়। সর্বোচ্চ ফৌজদারী আদালত ছিল সদর নিজামত আদালত। এই আদালত মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়া তাহার ভার গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং গ্রহণ করেন। সদর নিজামত আদালতের অধীনে চারটি ভ্রাম্যমান বিচারালয় (Court of Circuit) স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেকটিতে দুইজন করিয়া ইংরাজ বিচারক নিযুক্ত হন। দেশীয় আইন ব্যাখ্যা করার জন্য কাজী ও মুফ্‌তি নিযুক্ত করা হয়। ভ্রাম্যমান বিচারালয়ের বিচারকগণ বৎসরে দুইবার করিয়া বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন।

বিচারব্যবস্থার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত বহু নিষ্ঠুর মুসলমান আইন রহিত করা হয়। অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়। সাক্ষ্যদানের বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ রীতিরও বিলোপ সাধন করা হয়। 'কর্ণওয়ালিশ কোড' ('Cornwallis Code') নামে বিভিন্ন আইন-কানুনের সঙ্কলন করিয়া কর্ণওয়ালিশ বিচারব্যবস্থাকে সুগঠিত করেন।

পুলিশ বিভাগের সংস্কার ঃ এদেশে শান্তিরক্ষার জন্য কর্ণওয়ালিশ পুলিশ বিভাগকে সুসংগঠিত করার চেষ্টা করেন। জমিদারগণের পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত পুলিশ বাহিনীর বিলোপ সাধন করিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর পুলিশ বিভাগ তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। প্রত্যেক জেলাকে কতকগুলি থানায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক থানায় একজন দারোগা নিযুক্ত হয়। কলিকাতার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব একজন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর ন্যস্ত করা হয়।

লর্ড ওয়েলেসলী কলিকাতায় অবস্থিত সদর দেওয়ানী আদালত এবং সদর নিজামত আদালত দুইটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের পরিবর্তে তিনি কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্য হইতে তিনজন করিয়া বিচারক উক্ত বিচারালয় দুইটিতে বিচারকার্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল।

লর্ড হেষ্টিংস-এর বিচারব্যবস্থার সংস্কার

লর্ড ওয়েলেসলীর পর শাসন-সংস্কার কার্যে সাময়িকভাবে ছেদ পড়ে। লর্ড হেষ্টিংসের আমলে তাহা পুনরায় শুরু হয়। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত থাকিলেও লর্ড হেষ্টিংস্ অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায়ও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কার্যভারে ভারাক্রান্ত বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার ছিল বিশেষ জরুরী। দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিকে সহজ করা হয়। কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট পদ দুইটির পার্থক্য দূর করিয়া লর্ড হেষ্টিংস্ একজনের হস্তেই কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। ভারতীয় মুন্সেফ ও সদর আমিনের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। আপীলের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হয় এবং উচ্চতর আদালতসমূহের কার্যভার লাঘব করা হয়। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলির জন্য একটি পৃথক বিচারালয় স্থাপন

করা হয়। কলিকাতায় আপীল-কোর্টের বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচজন করা হয় এবং তাহাদের কার্য নির্দিষ্টরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। নিম্নতর আদালতগুলির কার্য লঘু করিবার জন্য জেলা বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং বিশেষ কমিশনও নিয়োগ করা হয়।

লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া বেণ্টিঙ্ক বিচারকার্য দ্রুত সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন। তিনি ভ্রাম্যমান ও আপীল আদালতগুলি তুলিয়া দেন।

শাসন-সংক্রান্ত সংস্কার : বিচার বিভাগের সংস্কার

ম্যাজিস্ট্রেট ও ক্যালেক্টরের কাজ একই শ্রেণীর কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হয়। কালেক্টরের উপর ফৌজদারী বিচারের ভার দেওয়া হয়। তাহাদের কার্য পরিদর্শনের জন্য কমিশনার নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। 'প্রধান সদর আমিন' নামে এক বিচারক পদেরও সৃষ্টি করা হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে একজন আইন-সদস্য (Law Member) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। বেণ্টিঙ্ক লর্ড মেকলের (Lord Macaulay) নেতৃত্বে এক আইন কমিশন গঠন করেন। মেকলের চেষ্টার ফলে একটি 'পেনাল কোড' ('Penal code') রচিত হয় এবং ইহা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আইনে পরিণত হয়।

লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬-১৮৪২ খ্রীঃ) ঃ বেণ্টিঙ্কের প্রজাহিতৈষী শাসনের পরে স্যার চার্লস্ মেটকাফের স্বল্পস্থায়ী শাসনকালে (১৮৩৫-১৮৩৬ খ্রীঃ) অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের তেমন সুযোগ বা সময় ছিল না। কিন্তু লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬-১৮৪২ খ্রীঃ) তাঁহার শাসনকালে সংস্কারমূলক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা করেন। বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

কর্নওয়ালিশ ঃ কর্নওয়ালিশ শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াই প্রশাসনিক কাঠামো দুর্নীতি-মুক্ত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, উপযুক্ত বেতন না পাইলে কর্মচারীদের পক্ষে সৎভাবে জীবন যাপন সম্ভব নহে। সেইজন্য তিনি কর্মচারীদের ব্যবসা এবং পুরস্কার বা উপঢৌকন বন্ধ করিয়া দেন। সেই সঙ্গে কর্মচারীদের বেতনও যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ব্যবস্থায় সরকারী কৃত্যকদের মাহিনা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। সরকারী কৃত্যকে পদোন্নতি তিনি চাকুরীতে সিনিয়ারিটির উপর নির্ভরের ব্যবস্থা করায় কর্মচারীদের কাজের স্বাধীনতা বজায় ছিল। এই কর্মচারীরাই আই. সি. এস. নামে পরিচিত। তাঁহারা সকলেই ব্রিটিশ শাসন কেন্দ্রীভূত করিতে সহায়তা করেন। কর্নওয়ালিশ এই পদে ভারতীয়দের নিয়োগের বিরোধী ছিলেন।

সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিত্বেও তিনি শুধুমাত্র ইংরাজদেরই নিয়োগ করার রীতি প্রচলন করেন। কর্নওয়ালিশ নিয়মিত বেতন ও ভাতা ইত্যাদি দান করিয়া সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় স্তম্ভ—সৈন্যবাহিনীকে সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখেন।

এই সমস্ত বিচার বিভাগীয় সংস্কারের ফলে সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া একই আইন প্রচলিত ছিল ; সেই সমস্ত আইন-কানুন বিধিবদ্ধ আইন ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। ভারতবর্ষ এইরূপে বিচার ব্যবস্থার দিক দিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিল।

ইংরাজগণ বিচার-বিভাগের নানা সংস্কারের মধ্য দিয়া এদেশে আইনের শাসনের আধুনিক ধারণা প্রবর্তন করে। 'আইনের শাসন' কথাটির অর্থ হইতেছে কোনও ব্যক্তি-বিশেষের খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর না করিয়া বিধিবদ্ধ আইনের ব্যাখ্যায় প্রজা সাধারণের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং দায়-দায়িত্ব অনুযায়ী বিচার করা। আইনের শাসনের ধারণা অনুসারে পুলিশ ও রাজকর্মচারীদের বে-আইনী অত্যাচার-উৎপীড়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রক্ষা কবচ হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হইত। কর্মচারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লোকের বিচার প্রার্থনার অধিকার স্বীকৃত ছিল। ইহার পূর্বে ভারতের কোন শাসকের কার্যেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাহার মীমাংসা লাভের সম্ভাবনা কাহারও ছিল না। ইংরাজ আমলে প্রশাসন পরিচালিত হইতে বিধিবদ্ধ আইনের সীমানার মধ্যে এবং বিচারালয়ই সেই সব আইনের সর্বোচ্চ বিচারক ছিল। এই প্রথম ধর্মীয়, শাস্ত্রীয় এবং চিরাচরিত সংস্কারমুক্ত উদার ন্যায় বিচার ব্যবস্থা ভারতীয়দের জীবনে দেখা দিল। পূর্বের দৈব বিহিত আইনের স্থান গ্রহণ করিল মানব-সৃষ্ট আইন। অবশ্য বিদেশী শাসকের অধীনে তাহাদের স্বার্থ-বিরোধী আইন দেশবাসী সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। ইংরাজদের আইন সংস্কারের অন্য একটি সুফল হইয়াছিল আইনের চক্ষে সমতা। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একই আইনে সকলের বিচার পাইবার অধিকার ঘটিল। ইতিপূর্বে ইহা ছিল সম্রাট, নবাব বা কাজীদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন।

আইনের শাসন

ভূমি-রাজস্ব হইতে বর্ধিত আয়ের প্রয়োজনীয়তা: কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য, তার যত লভ্যাংশ, প্রশাসনের এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনে যত যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যয়ভার সমস্তই বহন করিতে হইয়াছে ভারতের কৃষক বা রায়তকে। বাস্তবিকই কৃষককুলকে করভারে পর্যুদস্ত না করিলে ইংরাজদের পক্ষে ভারতের মতো এত বিরাট সাম্রাজ্য অধিকার সম্ভব হইত না। অবশ্য স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত রাষ্ট্রে কৃষককুলের ফসলের একাংশ ভূমি-রাজস্বরূপে সংগৃহীত করিয়াছে। কখনো সে রাজস্ব সংগ্রহ করা হইয়াছে কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি ; আবার কখনো বা কোন জমিদার প্রভৃতি মধ্যস্থের মাধ্যমে, যাহারা কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া একাংশ কমিশন হিসাবে কাটিয়া রাখিয়া বাকীটা সরকারে জমা দিতেন। এই মধ্যস্থ ব্যক্তিরা সাধারণ রাজস্ব-সংগ্রহকারীই ছিলেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁহারা জমির মালিকও ছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত: ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভের ফলে বিহার, ওড়িশা ও বাংলার রাজস্বের উপর কোম্পানীর অধিকার জন্মে। প্রাথমিক স্তরে কোম্পানী পূর্বতন ব্যবস্থা বজায় রাখিলেও আদায়ের পরিমাণ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ১,৪২,৯০,০০০ এবং ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ৮১,৮০,০০০ টাকার স্থলে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়ায় ২,৩৪,০০,০০০ টাকা। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী নিজেই রাজস্ব সংগ্রহের ভার গ্রহণ করে। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে বৎসর বৎসর জমিদারী নিলামে তুলিয়া সর্বোচ্চ নিলামদারকে

হেস্টিংস

ইজারা দিতেন। ইহাতে হয়তো আদায় বেশী হইতে পারিত কিন্তু সে আয়ের কোন নিশ্চয়তা ছিল না ; সরকারের আশানুরূপ রাজস্ব তাহাতে সংগৃহীত হইতেছিল না। ঠিক যখন কোম্পানীর ব্যয় দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছিল তখনই এই অনিশ্চয়তা সরকারকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহা ছাড়া নিজেদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলিয়া কৃষক কিংবা জমিদার বা ইজারাদার কেহই কৃষির উন্নতির দিকে নজর দিত না। বাৎসরিক হইতে পাঁচ এবং দশ শালা বন্দোবস্ত লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিবার দীর্ঘ কাল ধরিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ চিন্তা করিতে থাকে। অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

ইহার দুইটি বিশেষত্ব ছিল : পূর্বের জমিদার ও রাজস্ব-সংগ্রহকারীদের জমির মালিক বা ভূস্বামী করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা শুধু রাজস্ব সংগ্রহ করিয়াই অধিকারী ছিলেন না। তাঁহাদের অধীনস্থ সমস্ত জমির মালিকও হইলেন। জমির উপরের সে অধিকার ছিল বংশপরম্পরাগত এবং হস্তান্তরযোগ্য। অপরপক্ষে, কৃষককুল তাহাদের চিরাচরিত ভোগ-করা জমির উপর অধিকার হারাইয়া সামান্য কৃষকে পরিণত হইল। তাহা ছাড়া গোচারণ ও জংলা জমি, সেচ খাল, মাছের ভেরী এবং বাস্তু জমির উপরেও অধিকার হারাইল। প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোম্পানীর আয় নির্দিষ্ট হইলেও বাংলার কৃষককুলকে জমিদারদের মুখাপেক্ষী করিয়া দেওয়া হইল। জমিদারদের এই অধিকার দিবার কারণ ছিল, তাহারা যাহাতে নিয়মমতো খাজনা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। তাহাদের ক্ষেত্রে 'সূর্যাস্তের আইন' বলবৎ হইল।

দ্বিতীয়ত জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে যে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, তাহার ১০/১১ ভাগ সরকারে আদায় দিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঠিক করা হয়। নিজেদের জন্য রাখিতে পারিতেন মাত্র ১/১১ ভাগ। সরকারে দেয় রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্ধারিত হওয়ায় পরবর্তীকালে জমির আয় বৃদ্ধি পাইলে সরকার তাহার ফলভোগী হইবে না। সরকারী খাজনার উপর সবকিছুই জমিদার ভোগ করিতেন। যিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-ব্যবস্থাটির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, সেই স্যার জন শোর বলেন—তদানীন্তন বাংলার উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যদি ১০০ ধরা হয়, তাহা হইলে সরকার সংগ্রহ করেন ৪৫% জমিদার ১৫%। অবশিষ্ট ৪০% মাত্র জুটিত কৃষকদের ভাগ্যে।

ঐতিহাসিকগণ ঐরূপ বন্দোবস্তের কয়েকটি রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং প্রশাসনিক কারণ দেখাইয়াছেন।

সর্বপ্রধান কারণ ছিল কোম্পানীর একদল অনুগত এবং বশংবদ সমর্থক সৃষ্টি। ইংরাজ শাসকগণ ভালোভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতে তাঁহারা বিদেশী। স্থানীয় অধিবাসীদের আনুগত্য অর্জন করিতে না পারিলে তাহাদের সঙ্গে শাসন স্থায়ী হইতে পারিবে না। একদল অনুগত জমিদার সৃষ্টি করিতে পারিলে তাঁহারাই ইংরাজ কোম্পানী ও জনসাধারণের মধ্যে রক্ষাকবচের কাজ করিবেন। এই যুদ্ধের গুরুত্ব আরও

বেশী মনে হওয়ার কারণ, সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অংশে সারা দেশে বাংলার জনগণের বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়াছিল। ইংরাজ কোম্পানীর অনুগত জমিদার শ্রেণী নিজ স্বার্থে পরবর্তী বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিত।

দ্বিতীয় কারণ ছিল কোম্পানীর রাজস্বের অনিশ্চয়তা দূর করা। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানী তাহার আয়ের প্রধান উৎস রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আয়ের সে সুস্থিরতা দান করিয়াছিল। তাহা ছাড়া এইভাবে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয়ও ছিল সামান্য। আবার সরকারের আশা ছিল জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার পাইলে জমিদার জমির উন্নতির দিকে মন দিতে পারবে। পরের দিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ওড়িশা, মাদ্রাজের উত্তরাংশের জেলাগুলিতে এবং বারাণসী জেলায় প্রবর্তিত হইয়াছিল।

মধ্যভারত ও অযোধ্যায় ইংরাজগণ সাময়িক জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তাহাতে জমিদারদের জমির মালিক করা হইয়াছিল। তবে তাহাদের দেয় রাজস্বের হার মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করা হইত। আর যে একদল লোক কোম্পানীকে বিশ্বস্ত সেবা করিয়াছিল, সরকার তাহাদেরও জমিদারী দান করেন।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থা ঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইলে নূতন নূতন ভূমি-রাজস্বের সমস্যা দেখা দিয়াছিল। কর্মকর্তাদের ধারণা ছিল যে, এই সকল অঞ্চলে জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের অসুবিধা ছিল। সেইজন্য মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে সরকার হইতে কৃষকদের জমির মালিকানা দিয়া পূর্বের ন্যায় সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করে। রায়তগণের নিকট হইতে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইহার নামকরণ হয় রায়তওয়ারী ব্যবস্থা।

তাঁহারা আরও বুঝাইলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকারের আর্থিক লোকসান হইতে বাধ্য। কারণ জমির বর্ধিত রাজস্বের অংশে সরকারের কোন ভাগ থাকিবে না। জমিদারের দেয় খাজনার সমস্ত উদ্বৃত্তই জমিদারের লাভ হইবে। তাহা ছাড়া ঐ ব্যবস্থায় কৃষকদের জমিদারের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে এবং তাঁহারা যথেচ্ছ ভাবে কৃষকদের শোষণ করিবেন। এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রবর্তক মুনরো বলেন, 'এই ব্যবস্থাই চিরকাল ভারতে প্রচলিত ছিল।' রায়তওয়ারী ব্যবস্থা ২০।৩০ বৎসর অন্তর নূতন করিয়া আরোপ করা হইত এবং তখন খাজনা বাড়ানো হইত।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় কৃষকেরা জমির মালিকানা পায় নাই। কৃষকগণ অচিরেই বুঝিতে পারিল যে ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদারের পরিবর্তে তাহার এক বিরাট রাষ্ট্রনায়ক জমিদারের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। সরকার হইতে ঘোষণা করাই হইল যে, ভূমি-রাজস্ব হইতেছে জমির ব্যবস্থায়ের খাজনা, কর নহে।

মহালওয়ারী-ব্যবস্থা ঃ জমিদারী ব্যবস্থার একটি সংশোধিত রূপের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা গাঙ্গেয় উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের কতকাংশে এবং পাঞ্জাবে

প্রবর্তিত হয়। তাহা মহালওয়ারী ব্যবস্থা নামে পরিচিত। গ্রাম গ্রাম বা মহল মহল ধরিয়া কোনও গ্রাম্য প্রধান বা সমষ্টিগতভাবে কয়েকজনকে জমিদাররূপে স্বীকৃতি দিয়া তাহাদের সহিত সরকার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতেন। পাঞ্জাবে মহালওয়ারী ব্যবস্থার আর একটি সংশোধিত রূপ প্রবর্তিত হইয়াছিল। মহালওয়ারী ব্যবস্থাতেও মাঝে মাঝেই রাজস্বের হার পরিবর্তিত হইত।

ভারতের চির প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা হইতে জমিদারী ও রায়তওয়ারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। ইংরাজগণ জমিতে এমন এক ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তিত করে, যাহার সুফল কৃষককুলে বর্তায় নাই। সারা দেশ জুড়িয়া জমিকে এখন বিক্রয়, বন্ধক এবং হস্তান্তরযোগ্য করিয়া ফেলা হইল। এইরূপ করিবার প্রধান কারণ ছিল সরকারের রাজস্বের নিশ্চয়তা আনয়ন। জমি যদি বিক্রী বা হস্তান্তর যোগ্য না হইত, তাহা হইলে নিঃস্ব কৃষককুলের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় কঠিন হইয়া পড়িত। জমি হস্তান্তর যোগ্য হওয়ায় কৃষক তাহা বন্ধক দিয়া সরকারের খাজনা সংগ্রহ করিতে পারিত। রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হইলে সরকার কৃষকের জমি নিলামে বিক্রী করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেন। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্তনের আর একটি কারণ ছিল যে, তাহা হইলে হয়তো কৃষক ও জমিদার জমির উন্নতির দিকে নজর দিবে। ইংরাজ সরকার জমিকে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করায় ভারতের চিরাচরিত ভূমি ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো হয় এবং তাহার ফলে সমগ্র গ্রামীণ সমাজ-কাঠামোতে ভাঙ্গন ধরে।

৭ শিল্প ও বাণিজ্য
[Industry and Trade]

১৬০০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা হইতে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত কোম্পানীর ভূমিকা ছিল মূলতঃ একটি বাণিজ্যিক কোম্পানীর। তাহারা ইংলণ্ড হইতে পণ্য বা মুদ্রা আনিয়া ভারতের পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জন করিত। কোম্পানীর মুনাফা নির্ভর করিত ভারতীয় দ্রব্যাদি বিদেশে কত বেশী বিক্রয় করিতে পারিত, তাহার উপর। স্বভাবতই নিজেদের স্বার্থে তাহারা ইউরোপে ও প্রাচ্যে সর্বদাই ভারতীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের চেষ্টা করিত। ইহার ফলে তাহারা যেমন একদিকে ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদির রপ্তানী ক্রমেই বাড়াইতেছিল তেমনি ভারতীয় কারিগর ও শিল্পীদেরও উৎপাদনে উৎসাহ দান করিতেছিল। এই দুই কারণেই দেশীয় রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি পায় বলিয়া ভারতের রাজন্যবৃন্দ ইউরোপীয় বণিকদের নানা অত্যাচার সহ্য করিয়াও নানা স্থানে তাহাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দিতেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের অবস্থা ভালোই ছিল। ঐ সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু, আর্মেনিয়ান এবং মুসলমান বণিকসম্প্রদায় ভারতের অন্যান্য অংশ এবং তুরস্ক, আরব, পারস্য ও তিব্বতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। বহির্বাণিজ্য সকল সময়ে বাংলার অনুকূলেই ছিল এবং রপ্তানীর উদ্বৃত্ত মূল্যরূপে বাংলা তথা ভারত স্বর্ণ লাভ করিত।

বাংলাদেশ হইতে রপ্তানী দ্রব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সূতী ও সিল্ক বস্ত্র, কাঁচা সিল্ক, চিনি, লবণ, পাট, সোরা এবং অহিফেন। প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে বাংলার সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র, বিশেষতঃ ঢাকার মসলিন বস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। ইউরোপীয় বণিকসম্প্রদায় বাংলার সূতীবস্ত্র প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করিত এবং সুদূর বসরা, জেড্ডা প্রভৃতি নগরীর বাজারেও ঐ বস্ত্রের কদর ছিল। কাঁচা সিল্ক জাপানে, হল্যাণ্ড এবং মধ্য এশিয়ায় রপ্তানী হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি বিদেশে রপ্তানী করা হইত। বাংলা হইতে চিনি ভারতের বোম্বাই, মাদ্রাজ, সুরাট, মালাবার উপকূল প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রেরিত হইত। বাংলার পাট-শিল্প অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উন্নত হইতে থাকে। একজন প্রখ্যাত ইংরাজ লেখকের মতে, বাংলার ব্যবসা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দেও "করমণ্ডল ও মালাবার উপকূল, পারস্যোপসাগরে এবং লোহিতসাগর, এমন কি ম্যানিলা চীন ও আফ্রিকার উপকূলভাগ" পর্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছিল। সুতরাং, ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব মুহূর্তেও বাংলার বাণিজ্য ও শিল্প বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ছিল।

বাংলার রপ্তানি দ্রব্যসমূহ

ইংলণ্ডের উৎপাদক ও কারিগর গোষ্ঠী ভারতের মতো সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্রাদি উৎপাদন করিতে পারিত না। তাই প্রথম হইতেই তাহারা ইংলণ্ডে ভারতের সূতীবস্ত্রের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হইত। তাহাদের দেশীয় মোটা পশমের পোশাকের পরিবর্তে দেখিতে না দেখিতে ভারতের সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া ভারতীয় বস্ত্রাদিই সমাজে ফ্যাশনের প্রতীক হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে শয্যা গৃহ, পর্দা, চেয়ার, কুশন সর্বত্রই শুধুমাত্র ভারতের ক্যালিকোর একচ্ছত্র ব্যবহার চলিত। ইহার ফলে বিক্ষুব্ধ ইংরাজ উৎপাদকগোষ্ঠী ইংরাজ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিল ভারতের জিনিস আমদানী বন্ধ করার জন্য। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সেজন্য আইন পাশ হইয়া গেল ভারতের রঙীন বস্ত্রাদি পরা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করিয়া। তাছাড়া আমদানী সাধারণ সূতী বস্ত্রের উপরেও ভীষণ শুল্কের বোঝা চাপানো হইল। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিও ইংলণ্ডেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হয় ভারতের বস্ত্রাদি আমদানী নিষিদ্ধ করিল, না হয় তাহা আমদানীর উপর ভীষণ শুল্কের বোঝা চাপাইয়া দিল। এ বিষয়ে কেবলমাত্র হল্যাণ্ড ছিল ব্যতিক্রম। এত বাধা-নিষেধ সত্বেও কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি উন্নততর প্রযুক্তি বিদ্যা আবিষ্কার না করা পর্যন্ত ইউরোপের সর্বত্র ভারতীয় দ্রব্যাদির একাধিপত্য বজায় ছিল।

ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়া

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পরে ভারতের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্যিক সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এখন কোম্পানী তাহার ভারতীয় বাণিজ্য বিস্তারের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছিল। তাহা ছাড়া বাণিজ্য বিস্তারের পক্ষে সহায়ক ছিল বাংলা সুবার রাজস্বও। ইহাতে ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবার কথা। কিন্তু তাহা হয় নাই। কোম্পানী তাহার রাজনৈতিক ক্ষমতার চাপ দিয়া বাংলার তাঁতীদের সস্তায়, এমনকি ক্ষতি করিয়াও কোম্পানীর নিকট উৎপন্ন বস্ত্রাদি বিক্রয়ে বাধ্য করিত। অনেক তাঁতীকে জোর করিয়া কম পয়সায় কোম্পানীর জন্য খাটানো হইত, তাহা না হইলে, অন্য কাহারও নিকট কাজ করিতে দেওয়া হইত না। এই একইভাবে কারিগরদেরও যাহাতে অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী বেশী টাকা দিয়া পণ্যাদি কেনা-বেচা না করিতে পারে, সে ব্যবস্থাও কোম্পানী করিত। তাঁতীদের নিকট তুলা বিক্রীর ব্যবসা কোম্পানী নিজেদের একচেটিয়া অধিকারে রাখে এবং তাঁতীদের সে তুলা অতি উচ্চ মূল্যে কিনিতে বাধ্য করা হইত। এইভাবে তাঁতীরা কি ক্রেতা কি বিক্রেতা উভয় ভাবেই বঞ্চিত হইতেছিল। একদিকে যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা তখনও ইংলণ্ডের আমদানী সূতীবস্ত্রের উপর উচ্চ হারে শুল্ক দিতে হইতেছিল। কারণ ইংরাজ সরকার তাহাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত কারখানার উৎপাদিত বস্ত্রশিল্প রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া পারে নাই। তখনও সেসব দ্রব্যাদি ভারতীয় সূতীবস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। ভারতের বস্ত্রশিল্পের উপর প্রকৃত আঘাত আসিল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে, যখন তাহাদের বিদেশের বাজার তো বন্ধ হইলই, তাহার সহিত ধ্বংস হইল দেশেরও শিল্প ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইলে কৃষির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়িগণ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া

পলাশীর যুদ্ধের পর রূপান্তর

কৃষিজীবির স্থান গ্রহণ করেন। কৃষিতে অর্থ বিনিয়োগের আগ্রহ দেখা দেওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মূলধনের অভাব দেখা দেয়। ফলে, বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য ইউরোপীয়দের কুক্ষিগত হয় এবং ইউরোপীয়গণ তাহাদের নিজস্ব প্রথায় বাণিজ্য-ব্যবস্থা গঠন করে। কিন্তু বাংলার শিল্পী বা ব্যবসায়ীদের আর তাহাতে কোন অধিকার রহিল না।

ভারতের প্রধান শিল্প ঃ সূতীবস্ত্র—ভারতবর্ষের প্রধান শিল্প ছিল সূতী, সিল্ক এবং পশম বস্ত্র। বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল লক্ষ্ণৌ, আহমেদাবাদ, নাগপুর এবং মাদুরা; পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে মিহি শাল প্রস্তুত হইত। ব্রোঞ্জ, তাম্র ও কাঁসা শিল্পের জন্য বারাণসী, তাঞ্জোর, পুণা, নাসিক এবং আহমেদাবাদ প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা ছাড়া স্বর্ণ, প্রস্তর খোদাই কার্য, স্বর্ণরৌপ্যের উপর কারুকার্য এবং মার্বেল, চন্দনকাষ্ঠ, হস্তীদন্ত প্রভৃতি লইয়া শিল্পকর্ম বিখ্যাত ছিল। চর্মশিল্প, সুগন্ধি দ্রব্যের শিল্প প্রভৃতিও ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পূর্বে ভারতের বাণিজ্য-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতের জাহাজ-নির্মাণ শিল্প ইংলণ্ডের তুলনায় অধিকতর উন্নত ছিল। ভারতের বস্ত্রশিল্পের ন্যায়ই তাহার এই জাহাজ-নির্মাণ শিল্পও ব্রিটিশ শিল্পপতি-গণের ঈর্ষার উদ্রেক করে এবং তাহাদের চাপে পড়িয়া ব্রিটিশ সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতে ঐ শিল্পের অগ্রগতি রোধের ব্যবস্থা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার ন্যায় ভারতের অন্যান্য অংশেও বাণিজ্য ও শিল্প দ্রুত ভাঙ্গনের পথে অগ্রসর হয়, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার ভাঙ্গন সম্পূর্ণ হয়। এই ভাঙ্গনের মূলে বহুবিধ কারণ নিহিত ছিল ঃ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নীতি, কারখানায় প্রস্তুত সুলভ পণ্যসামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতা এবং ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে রক্ষা করায় ভারত সরকারের অনিচ্ছা অথবা অক্ষমতা। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব যন্ত্রের সাহায্যে সূতী বস্ত্রাদির উৎপাদন সহজ ও সুলভ করিয়া ভারতীয় সূতী বস্ত্রাদির বিনাশ অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। যন্ত্র ও হস্তচালিত শিল্পের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দূর করা অসম্ভব ছিল বলিয়াই শাসকবর্গের পক্ষে ভারতীয় বয়নশিল্পকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। অপরপক্ষে বহু ভারতীয় এবং ইংরাজ লেখকের মতে, ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব ছিল "ভারতের লুণ্ঠিত ধনসম্পদেরই একটি ফল।" ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু শিল্পসমূহকে রক্ষার পরিবর্তে তাহাদের উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করেন এবং ভারতীয় শিল্পদিগকে কোনরূপ উৎসাহ দান করেন নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেন যে, "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাঁহাদের (ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর) স্থির নীতিই ছিল ভারতকে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পের অধীন করা এবং গ্রেট ব্রিটেনের তাঁত ও কারখানায় যোগান দিবার জন্য কাঁচামাল উৎপাদনে ভারতীয় জনগণকে নিয়জিত করা।"*

ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের ভাঙ্গন : ইহার কারণ সম্পর্কে মতামত

*R. C. Dutt. *Economic History of India*, Vol, I., p. 256.

বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশ্বের শিল্প ও বাণিজ্যের জগতে ভারত তাহার গৌরবোজ্জ্বল আসন হারায়। ধীরে ধীরে ভারত কাঁচামাল উৎপাদনের এবং পাশ্চাত্যের সুলভ শিল্পসম্ভারের ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্ষমতায় আসীন বিদেশী সরকার ভারতের এই পরিণতিতে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করে।

পূর্বতন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় ভাঙ্গন : পলাশীর যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল ভারতে ব্রিটিশ জাতির সার্বভৌম শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ। এই সার্বভৌম শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে পলাশীর যুদ্ধের পরই ভারতে সুস্পষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক শক্তিরূপেই নহে, অর্থ নৈতিক আধিপত্যের অধিকারী হইয়াও ব্রিটিশ শক্তি ভারতের পূর্বতন জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তনের সূত্রপাত করে।

ভারতের জনজীবন ছিল মূলত গ্রামীণ। গ্রামে কৃষিকার্য ও গৃহশিল্পই ছিল জনগণের উপজীব্য। কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষির পরিপূরক ছিল কুটীরশিল্প। সুতাকাটা (Spinning) এবং বয়ন (Weaving) শিল্প গ্রামের প্রতি পরিবারেই প্রচলিত ছিল। এই কুটীরশিল্প গ্রামে সূত্রধর, রজক প্রভৃতির বৃত্তির ন্যায়ই প্রায় বংশানুক্রমিক ছিল। গ্রামের বয়ন-শিল্পসামগ্রীর চাহিদা গ্রামের বাহিরেও থাকায় গ্রাম্য শিল্পসমূহের মধ্যে বয়নশিল্পের একটি বিশেষ মর্যাদার স্থান ছিল। বয়নশিল্পীগণ পরিশ্রমী এবং আপন কর্মে সুনিপুণ ছিলেন। সুতাকাটাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য কুটীরশিল্প ; সাধারণত নারীগণ এই শিল্পে নিযুক্ত থাকিত। গৃহকর্মের অবসরে তাহারা এই শিল্প দ্বারা অর্থ উপার্জন করিত। তাহাদের প্রস্তুত সূতা মিহিবস্ত্রে ব্যবহৃত হইত এবং বিশেষ সুনামের অধিকারী ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে বাংলা তথা ভারতের সমৃদ্ধির জন্য ভেরেলস্ট (Verelst) তাঁহার (বাংলার) শিল্পের স্বল্পমূল্য, এবং গুণ ও বিস্ময়জনক ব্যবসা'র প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুত ভারতের শিল্পসামগ্রী তাহার উৎকর্ষতার জন্য সমগ্র বিশ্বে সুনাম অর্জন করিয়াছিল।

ভারতের পূর্বতন অর্থ নৈতিক চিত্র

ভারতের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন : ভারতীয় শিল্পের এই বিনাশের ফল ভারতের চিরাচরিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন আনে। ভারতের শিল্পসম্প্রদায় তাহাদের পুরাতন বৃত্তিচ্যুত হইয়া চরম দুর্দশায় পতিত হয়। বেকারত্ব এবং নৈরাশ্য ভারতের শিল্পজগৎকে আচ্ছন্ন করে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বীকার করেন : "সূতীজাত দ্রব্যাদি বহুকাল ধরিয়া ভারতের প্রধান শিল্প হইয়াও বর্তমানে চিরতরে অবলুপ্ত ....."।

ইহার ফল

ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের ফলে শিল্পীসম্প্রদায় কৃষিকেই জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করে। সুতরাং, কৃষিবিভাগ বিশেষরূপে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীন ব্যবস্থায় কৃষির সহিত কুটীরশিল্প এক অর্থ-নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করিত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের বিনাশের ফলে সেই পুরাতন 'স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক ভারসাম্য' আর বজায় রহিল না।

অর্থ নৈতিক ভারসাম্য লোপ

ভারতের প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন ভূমি-সংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলে আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৭৯৩ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোম্পানী ভূমি-রাজস্ব সংস্কারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এই ব্যবস্থায় প্রজার স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় জমিদারগণ ইচ্ছামতো খাজনা বৃদ্ধি করিতে বা প্রজাদের জমি হইতে উৎখাত করিতে পারিত। আবার জমিদারগণ শহরে বাস করিতে থাকিলে তাহাদের কর্মচারীদের হস্তে প্রজাদের দুর্দশা চরমে ওঠে। শিল্পের বৃত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া যাহারা কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহাদের দুর্গতিও চরমে পৌছায়।

কোম্পানীর ভূমি-সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির ফলে প্রাচীন অর্থনীতির বিলুপ্তি

ভারতীয় শিল্পের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন শহরগুলিরও অবনতি শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতীয় শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া বহু শহর প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। মসলিন বস্ত্রের জন্য ঢাকা, সিল্কের জন্য মুর্শিদাবাদ বিশ্বে সুনাম অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ নীতির ফলে ভারতীয় শিল্পের সহিত শহরগুলিও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। বিদেশী লেখকবৃন্দের রচনায় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উইলিয়ম ফুলারটন (William Fullarton)-এর ভাষায়ঃ "পূর্ববর্তীকালে বাংলা ছিল দেশসমূহের শস্যভাণ্ডার এবং প্রাচ্যে বাণিজ্য, ধনসম্পদ ও শিল্পের ভাণ্ডার। কিন্তু আমাদের কুশাসনের অক্লান্ত শক্তির ফলেই কুড়ি বৎসরের অল্প ব্যবধানে এই দেশের বহু অংশই মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।" ভারতীয় শিল্পের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শহরের অধোগতি মণ্টগোমারী মার্টিনকে (Montgomery Martin) ব্যথিত করেঃ "সুরাট, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য যে সকল স্থানে দেশীয় শিল্প চালু ছিল, তাহাদের অবনতি ও বিলুপ্তি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।" বস্তুত ভারতীয় শিল্পের বিনাশ সাধন করিয়া এবং ভারতীয়দের বাণিজ্যিক ক্ষমতা নষ্ট করিয়া ব্রিটিশ শাসন পুরাতন শহরগুলিকে অবনতির পথে ঠেলিয়া দেয়। বিদেশী শাসকগণ তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে এদেশে শিল্প-বাণিজ্য ও শহর-গঠনে আত্মনিয়োগ করে।

ভারতীয় শহর-সমূহের অবনতি

শোষণ ও দারিদ্র্যঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতবর্ষের প্রভূত ধন-সম্পদ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষকে শোষণ করার এই প্রয়াস নানাভাবে পলাশীর যুদ্ধের পরই শুরু হয়। মীরজাফর ও মীরকাশিমের নিকট হইতে কোম্পানী ও তাহার কর্মচারীগণ প্রভূত অর্থ আদায় করে। এই অর্থের পরিমাণ ১৭৫৭-১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশ লক্ষ স্টার্লিং-এরও অধিক ছিল। লর্ড ক্লাইভের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ প্রচুর পরিমাণে উপহার প্রভৃতিও গ্রহণ করিতে থাকে। কোম্পানীর পরিচালক-সমিতি এই সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেও তাহা কার্যকরী হয় নাই। কোম্পানীর

পলাশীর যুদ্ধের পর শোষণের সূত্রপাতঃ উপহার গ্রহণ

কর্মচারিগণের নিকট উপহার প্রভৃতি গ্রহণের স্বর্ণযুগ ছিল ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ও প্রভূত পরিমাণে উপহারাদি গ্রহণ করিয়া আপন সম্পদ বৃদ্ধি করেন। তাঁহার কাউন্সিলের সদস্য রিচার্ড বারওয়েল ৮০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে বিতর্ককালে স্বীকার করিয়া-ছিলেন যে, নিজ সম্পদ বৃদ্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

উপহার অপেক্ষাও ব্যক্তিগত বাণিজ্য কোম্পানীর কর্মচারিগণের নিকট অধিকতর লাভজনক ছিল। বাণিজ্যশুল্কমুক্ত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ প্রভূত ধনসম্পদ উপার্জন করিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল লুণ্ঠনের নামান্তর মাত্র। ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর কর্মচারিগণের এই ব্যক্তিগত বাণিজ্য পুরাদমে চলিতে থাকে এবং ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহা টিঁকিয়া থাকে। এইভাবে কোম্পানীর কর্মচারিগণ কি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা অবশ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। এই সম্পর্কে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ দরবারে রেসিডেণ্ট পদে কর্মরত সাইকস্‌ (Sykes) বারো-তেরো লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেন। পিতার নিকট লিখিত এক পত্রে (১৭৬৭ খ্রীঃ) বারওয়েল স্বীকার করেন যে, সোরার ব্যবসায়ে তিনি ৫০,০০০ টাকা লাভ করিয়াছেন।

কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত বাণিজ্য

কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে তাহার একচেটিয়া আধিপত্যে হস্তক্ষেপ না করিলে কর্মচারিগণের পক্ষে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করায় কোন বাধা ছিল না। কোম্পানী তাহার কর্মচারিগণকে এবং 'স্বাধীনব্যবসায়ীদিগকে' ('Free Merchants') হীরক রপ্তানির অনুমতিও দান করে। হীরক এদেশের দ্রব্যমূল্য বিনিময়ের মাধ্যম নহে বলিয়া হীরক রপ্তানির ফলে কোন অসুবিধা হইবে না—ইহাই ছিল কোম্পানীর ধারণা। বাংলাদেশে হীরকের খনি না থাকায় অযোধ্যা, গোলকুণ্ডা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে হীরক ক্রয় করা হইয়া থাকে। এইভাবেই ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ এবং আরো অনেকে তাঁহাদের অর্থ হীরক ক্রয়েই বিনিয়োগ করেন। ভারতের মহামূল্য হীরকখণ্ডসমূহ বিদেশে পাচার করিয়া ইংরাজগণ ভারতের ক্ষতি সাধন করিয়াছিল।

হীরক রপ্তানি

কিন্তু ব্যক্তিগত বাণিজ্য ব্যতীত ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল হইতে গোপন লোভনীয় চুক্তি দ্বারা কোম্পানীর কর্মচারিগণ প্রভূত অর্থ আত্মসাৎ করে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে অভিযোগের সময়ে ('ইম্পিচমেণ্ট') তাহার বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হয় যে, তিনি গোপন চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য করেন। ঐরূপ চুক্তির সাহায্যে হেষ্টিংস মিত্রলাভ করেন ও সমর্থকদেরও পুরস্কৃত করেন।

গোপন লোভনীয় চুক্তি দ্বারা অর্থশোষণ

কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় উৎপাদকগণের নিকট হইতে অর্থ আদায়ে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীরও ভূমিকা ছিল। ভেরেলস্ট ঢাকার শাসকপদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে ভারতীয় 'মধ্যবর্তী প্রতিনিধিগণ' ('middlemen') বয়নশিল্পীদের নিকট হইতে টাকা প্রতি ১৬ গণ্ডা আদায় করে। রামবোল্ড-এর (Rambold) শাসনকালে রামবোল্ড স্বয়ং টাকা প্রতি ৫ গণ্ডা আদায় করেন। ভারতীয় উৎপাদকগণের নিকট হইতে অর্থ আদায়ে ব্রিটিশ শাসকের এইরূপ ভূমিকা থাকায় সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয়গণ ক্ষতিগ্রস্ত হইত।

শাসকশ্রেণীর ভূমিকা

ভারত হইতে শোষণকার্যে সক্রিয় ভূমিকা লইয়াছিল কোম্পানীর সমর্থন ও সাহায্য-পুষ্ট 'স্বাধীন ব্যবসায়ী' ('Free Merchants') নামে বণিকসম্প্রদায়। তাহারা ভারতে তাহাদের উপার্জিত অর্থ ইউরোপে প্রেরণ করিত। ঢাকায় নিযুক্ত (১৭৮৯ খ্রীঃ) কোম্পানীর রেসিডেণ্ট (Resident) জন বেব-এর (John Bebb) ভাষায়: "তাহাদের ('স্বাধীন ব্যবসায়ী') মধ্যে কেহই বাংলাদেশে বসবাসের প্রস্তাব বা বসবাস করে নাই। ধনসম্পদ লাভ করিবামাত্র তাহা ইউরোপে প্রেরিত হয় এবং এই দেশের শোষণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।"

'স্বাধীন ব্যবসায়ী' কর্তৃক অর্থশোষণ

লর্ড কর্নওয়ালিশ কোম্পানীর কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিলে 'স্বাধীন ব্যবসায়ী' ও কোম্পানীর প্রাক্তন কর্মচারিগণ ইউরোপে নীল এবং মালয় ও চীনে অহিফেন রপ্তানি করিতে থাকে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ৪০,০০০ মণ নীল রপ্তানি করা হয়। কিন্তু ভারতীয়গণকে বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করায় এবং নানাভাবে উৎপীড়ন করায় নীলচাষী ক্রীতদাসের পর্যায়ে অধঃপতিত হয়।

নৌশিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজগণ করমণ্ডল উপকূল হইতে স্বলভ লবণ এদেশে আমদানি করিতে থাকে। ফলে, বাংলা তথা ভারতের নিজস্ব লবণ ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে।

স্বলভ লবণের আমদানি

এইভাবে ভারত হইতে যে শোষণ কার্য চলিতে থাকে, তাহার জন্য কোম্পানীর বিনিয়োগও (Investment) কম দায়ী ছিল না। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৩ লক্ষ প্রচলিত মুদ্রা। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় এক কোটি টাকারও অধিক। এই দ্রুত প্রসারোন্মুখ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ পলাশীর যুদ্ধের পরে কোম্পানী ভারতে বাণিজ্যরত ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসীদের মাধ্যমে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে থাকে। বিনিময়ে এদেশে ঐসকল বিদেশী ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে কোম্পানী সাহায্য করিতে থাকে। এইভাবে শোষণ পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল।

কোম্পানীর বিনিয়োগ

চীনের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্যেও এদেশের অর্থের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা দেশ হইতে চীনে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য প্রেরিত হইতে থাকে। সিলেক্ট কমিটির (১৭৬৭ খ্রীঃ) মতে, চীনের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্যের জন্য এদেশ হইতে বার্ষিক শোষণের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ টাকা।

চীনের সহিত বাণিজ্য

রাজ্যবিস্তারের জন্য শোষণ : বোম্বাই ও মাদ্রাজে কোম্পানীর বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিকে সাহায্যের জন্য বাংলার অর্থ ব্যয় করা হয়। ভারতের অন্যান্য অংশে রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ করা হয় এবং এজন্য বাংলার কৃষক ও শিল্পীর নিকট হইতেই অর্থ শোষণ করা হয়।

ভূমি-রাজস্বের বৃদ্ধি

ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বাংলা তথা ভারতের কৃষক শোষিত হইতে থাকে। ১৭৬৪-১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র বাংলায় আদায়ীকৃত ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ পাউণ্ড। কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড।

শোষিত অর্থের পরিমাণ

এইভাবে ভারত হইতে শোষিত অর্থের পরিমাণ বিপুল আকার ধারণ করে। এই অর্থের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কাহারও মতে, ১৭৫৭ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং মুদ্রা। জেম্‌স গ্রান্ট এবং হোলডেন ফারবার প্রমুখ লেখক মনে করেন যে, ১৭৮৩ হইতে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বার্ষিক শোষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৮,০০,০০০ পাউণ্ড।

অর্থশোষণের ফল : দারিদ্র্য

ভারত হইতে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ শোষণের (Economic Drain) ফলে এদেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ শাসক ফ্রেডারিক জন শোর মনে করেন : 'ভারতের সমৃদ্ধির দিন সমাপ্ত হইয়াছে; তাহার প্রভূত ধনসম্পদের এক বিরাট অংশ শোষণ করিয়া লওয়া হইয়াছে।" ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর রেসিডেন্ট বেচার (Becher) কোম্পানীর নিকট তাঁহার প্রতিবেদনে 'এই সুন্দর দেশের' ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার উল্লেখ করেন। ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের ধ্বংসের ফলে জনগণের মধ্যে বেকারত্ব প্রকট হইয়া ওঠে। ইংলণ্ডে পুরাতন হস্তচালিত তন্তুবায়ের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু ভারতে সেইমতো অজস্র কারিগর ও শিল্পীর স্থান কোন নূতন শিল্প গ্রহণ করে নাই। ভারতীয় কারিগর ও শিল্পীরা কৃষিকেই জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করায় কৃষিকর্ম ক্রমশই ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কর্মের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় বেকারত্ব ও দারিদ্র্যই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশন ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্যের জন্য 'একমাত্র জীবিকারূপে কৃষি' এবং 'বিভিন্ন কর্মসংস্থানের অভাব'কেই দায়ী করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশের ব্যাঙ্কার জগৎশেঠ পরিবারেরও দ্রুত অবনতি দেখা যায়। জনগণের অবস্থাও দ্রুত অবনতির পথে যাইতে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কৃষকদের দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছিল। তাহাদের আয় এতই অল্প ছিল যে, তাহা দ্বারা কৃষক পরিবারগুলির ভরণ পোষণ চলিত না।

৮ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
[The Cultural Scene]

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ঃ ইংরাজগণ যখন বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে, তখন উচ্চ শিক্ষা শুধুমাত্র সংস্কৃত আরবী ও ফারসী পাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল টোল ও মাদ্রাসাগুলিতে। কিন্তু উহাদের কোনটাতেই দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। যেমন ছিল না, মাতৃভাষার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, তেমনি কোনও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি বা ভূগোল ইত্যাদি আধুনিক বিদ্যাই সে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ব্যাকরণ, সংস্কৃত-আরবী-ফারসী শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, আইন ও ধর্ম শাস্ত্রাদিই মাত্র উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইত।

নিম্নশ্রেণীতে পাঠশালা ও মক্তবে লিখিতে, পড়িতে এবং অঙ্ক কষিতে শিখিবার সহিত ছাত্রগণ পুরাণ প্রসঙ্গ ও কিম্বদন্তী সমূহের বিষয় জ্ঞান লাভ করিত। ভারতের বাহিরে ইউরোপ নবজাগরণের পরে যে দ্রুতলয়ে প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, সে সম্পর্কে কোন সংবাদই ভারতের কেহ রাখিত না এবং সে সম্পর্কে কোন কৌতূহলও তাহাদের ছিল না। শিক্ষাদীক্ষা ও মানসিক উন্নতির দিক দিয়া ভারত ইউরোপের মধ্যযুগের স্তরেই অবস্থান করিতেছিল।

পরিবর্তন সমূহ ঃ ইংরাজগণ ভারতের মানস-জগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে অনেকটা সাফল্য অর্জন করিয়াছিল এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা। তবে সে-কার্যের কৃতিত্ব কেবলমাত্র সরকারেরই নহে। সরকারের সহিত মিশনারীদের সাধু প্রচেষ্টার সমন্বয়েই এই কঠিন কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল উদারচেতা ভারতীয়দের প্রচেষ্টাও।

ভারতে আধিপত্য বিস্তারের প্রথম ৬০ বৎসর বাণিজ্যিক লাভ ও মুনাফা প্রত্যাশী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষাবিস্তারে কোনই মনোযোগ দেয় নাই। বিদ্যোৎসাহী ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতায় কলিকাতা মাদ্রাসা, উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটি এবং রেসিডেণ্ট জোনাথান ডাঙার্স বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কোম্পানীর সিভিল সারভ্যাণ্ট চার্লস গ্র্যাণ্ট সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্কুল খোলার চেষ্টা করিয়া বিফল হন। সে মহৎ চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন বাংলা ও মাদ্রাজের মিশনারিগণ।

মাদ্রাজের মিশনারিগণ সরকারের সাহায্যে অষ্টাদশ শতকের শেষেই ইংরাজী স্কুল স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় মিশনারীদের আগমনে বাধা আরোপিত হওয়ায় দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে বসিয়া উইলিয়াম কেরী, মার্শমান প্রমুখ মিশনারিগণ বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় ইংরাজী বাইবেল অনুবাদ করিয়া এবং বাংলা সাময়িক পত্র প্রচার করিয়া বাংলা শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইলে সেখানে কেরী এবং বাঙালী পণ্ডিতগণ শিক্ষকতা করিতে করিতে বাংলা ভাষার চর্চা করেন।

এই সময়ে ভারতে এবং ইংলণ্ডে একদল উদার মানবতাবাদীদের আন্দোলনের চাপে কোম্পানী ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদে এদেশে শিক্ষাখাতে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিতে বাধ্য হয়। রামমোহন রায় প্রমুখ আধুনিকপন্থিগণের দাবী ছিল এই অর্থ পাশ্চাত্য শিক্ষার পিছনে ব্যয় করা হউক; কিন্তু আর এক অনুদারপন্থী ইহার বিরুদ্ধতা করিয়া প্রাচ্য বিদ্যার পিছনে এই অর্থ ব্যয় দাবী করেন। ফলে কোম্পানী হইতে কিছু করা হয় নাই। শুধুমাত্র মিশনারীদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ায় কলিকাতায় তাহারা নানা ইংরাজী স্কুল খুলিতে আরম্ভ করেন। রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, এবং অন্যান্যদের বদান্যতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

চার্টার (১৮১৩ খ্রী:)

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা

১৮২৩ খ্রীঃ বাংলায় কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান স্থাপিত হইলে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হয় এবং সেখান হইতে সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সীতে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ভারতীয় উদ্যোগীগণ এবং মিশনারীরা সম্মিলিতভাবে স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপন করিয়া ইংরাজীতে স্কুল পাঠ্যপুস্তকাদি প্রকাশ করিতে থাকেন। ইংরাজী গ্রন্থাদির চাহিদা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান-এর পরিচালক দল ক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদী দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্যপন্থীদের বক্তব্য ছিল যে কোম্পানীর অর্থ একমাত্র পাশ্চাত্যের উদারপন্থী শিক্ষার পিছনে ইংরাজীর মাধ্যমে ব্যয় করা উচিত। এই শিক্ষা বহুলোকের মধ্যে প্রচারিত না হইলেও—নূতন শিক্ষিতেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই শিক্ষার সুফল অন্যের মধ্যে প্রচার করিতে পারিবে। এই নীতিকে পাশ্চাত্য পন্থীরা বলিতেন 'ইনফিলট্রেসন' পদ্ধতি।

ইনফিলট্রেসন পদ্ধতি

ইংরাজী শিক্ষা: ইতিমধ্যে লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁহার কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য অ্যাডামসকে বাংলার তদানীন্তন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে নির্দেশ দেন। অ্যাডামস-এর রিপোর্টে দেখা যায় তখন বাংলায় প্রায় ১½ লক্ষ টোল ও মক্তব এবং মাদ্রাসায় ছাত্ররা পড়াশুনা করিত। কিন্তু তাঁহার রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত লইবার পূর্বেই প্রধানতঃ রামমোহন রায় এবং দেশীয় উদারনৈতিক নেতা ও বেণ্টিঙ্কের আইন সদস্য মেকলে সাহেবের মধ্যস্থতায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজীকেই বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম করিয়া লওয়া হয়। ঐ বৎসরেই কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ফলে সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসায় সাহায্যের মাত্রা কমিয়া যায় এবং কোম্পানীর অর্থ পাশ্চাত্য শিক্ষার পিছনে ব্যয় হইতে থাকে। ইতিমধ্যে কমিটি অব পাবলিক এডুকেশনের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কাউন্সিল অব এডুকেশন। লর্ড হার্ডিঞ্জ আসিয়া নিয়ম করিয়া দেন যে সমস্ত সরকারী চাকুরীতে পরীক্ষা দিয়া ঢুকিতে হইবে। ইংরাজীতে জ্ঞানের উপর চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এইরূপে ইংরাজীর জ্ঞানকেই সরকারী চাকুরী পাইবার একমাত্র উপায় স্থির করা হইলে দেশে দ্রুত ইংরাজী শিক্ষার প্রসার হইতে থাকে।

মেকলে ও ইংরাজী মাধ্যম

কাউন্সিল অব এডুকেশন

বাংলায় প্রচলিত ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি ছিল জনসাধারণের শিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষা চর্চার অবনতি ঘটাইয়া একমাত্র ইংরাজী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া। অ্যাডাম-রিপোর্টে টোল ও মক্তবের সংখ্যার উল্লেখ থাকিলেও সেখানে যে মাতৃভাষা চর্চার শোচনীয় অবস্থা ছিল তাহাও বর্ণিত হইয়াছিল। কিন্তু 'ইনফিলট্রেসন' পন্থীরা মাতৃভাষার উন্নতি এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেন নাই।

মাতৃভাষার অবনতি

তবে শাসকগণ না চাহিলেও ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ইংরাজী শিক্ষালব্ধ জ্ঞানই শিক্ষিতেরা পরবর্তীকালে স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে না হইলেও রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, প্রচার-পুস্তিকা, বক্তৃতামঞ্চ হইতে গণতন্ত্র, জাতীয়তা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের আদর্শ গ্রামীণ ও শহরের জনগণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন।

সুফল

বাংলার বাহিরে কোম্পানীর শিক্ষানীতির এত কুফল দৃষ্ট হয় নাই। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও একই ভাবে মিশনারিগণ ও সরকারী প্রচেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু ঐসব অঞ্চলে ইংরাজীর পাশাপাশি ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলিরও উন্নতি করিয়া মাতৃভাষা প্রসারের ব্যবস্থা হইত।

অন্যত্র

ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পরবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হইল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের 'উডের ডেসপ্যাচ'। স্যার চার্লস উড ছিলেন বোর্ড অফ কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট। তাঁহার প্রদত্ত ডেসপ্যাচের রূপরেখা অবলম্বনেই পরবর্তীকালের শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামো রচিত হইয়াছে।

উডের ডেসপ্যাচ
(১৮৫৪ খ্রী:)

ডেসপ্যাচে ভারত সরকারকে জনগণের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে পূর্বের ইনফিলট্রেসন নীতি বাতিল করা হইল। প্রাথমিক স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে সংগঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়। যেমন থাকিবে উপযুক্ত সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেমনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজ। মেধাবী ছাত্রদের সরকার হইতে পুরস্কারের ব্যবস্থা হইল এবং দানবীরদের দয়ায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েও সরকারী অনুদানের নির্দেশ রহিল। এই সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রদেশে একটি করিয়া 'ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন' প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহাদের পরিচালনাধীনে নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয়। সেইজন্য উপযুক্ত সংখ্যক স্কুল ইনস্পেক্টার নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

উচ্চশিক্ষার সংহতি বিধানের জন্য কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—প্রতিটি প্রেসিডেন্সী টাউনে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ ইহাতে ছিল। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মতো ঐগুলিকে কেবল পরীক্ষা লইবার অধিকার দেওয়া হয়। সেই অনুপাতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্নাতক ছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৭ হইতে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।

উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি লোকশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, মাতৃভাষার উন্নতি এবং শিক্ষক-শিক্ষণেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। সর্বশেষে ডেসপ্যাচে উল্লিখিত হয় যে, মাতৃভাষার বিকল্প হিসাবে ইংরাজীকে তাঁহারা স্থান দিতে চান না। ইংরাজীর পাশাপাশি মাতৃভাষার প্রসারও অপরিহার্য।

বিভিন্ন ডেসপ্যাচে যতই নির্দেশ দেওয়া হউক না কেন, সরকার পক্ষ হইতে তেমন করিয়া শিক্ষাপ্রসারের উদ্যোগ দেখা যায় নাই। তাহারা যেটুকু উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল তাঁহার প্রধান কারণ ছিল উদারচেতা ভারতীয় এবং মিশনারীদের চাপ ও কোন কোন উদারপন্থী শাসকদের অনুগ্রহ। লোকহিত অপেক্ষা ব্যয় সংকোচের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সরকার হইতে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে মন দেওয়া হইয়াছিল। ভারতব্যাপী শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য নিম্নতম স্তর অবধি বিলাত হইতে লোক আনার ব্যয় বহন কোম্পানীর পক্ষে অসাধ্য বোধ করায় তাহারা কেরানী স্তরে ইংরাজী জানা দেশীয়দের চাকুরী দিবার ব্যবস্থা করিয়া ব্যয় সংকোচন করে। অসংখ্য কেরানীর দরকার বলিয়াই সরকার এত স্কুল-কলেজে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহার সহিত আরও একটি উদ্দেশ্য যুক্ত ছিল। কোম্পানীর পরিচালকবর্গের ধারণা ছিল যে, ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ স্বভাবতঃই বিলাতী দ্রব্যের বাজার ভারতে বাড়াইতে সাহায্য করিবে। সর্বশেষে লর্ড মেকলের মতো ইংলণ্ডের কর্তাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে মিলনের সেতুরূপে কাজ করিবে। শাসকদের সদিচ্ছা তাহারা শাসিতদের বুঝাইয়া দিতে পারিবে। সুতরাং, ইংরাজ কোম্পানী আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি রচনা করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে চাহিয়াছিল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন ঘোষণা করিলেন যে, ইংরাজী না জানিলে সরকারী কাজ কেহ পাইবে না, তখন হইতেই চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি ঘটিতে লাগিল। আর কেহই দেশীয় পাঠশালায় পড়িতে চাহিল না। সকলেই ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলের পিছনে ছুটিতে লাগিল।

ইংরাজ কোম্পানী প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা ছিল লোকশিক্ষার প্রতি অবহেলা। তাহার ফলে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দেও শিক্ষিতের হার যাহা ছিল, একশত বৎসর পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেও তাহার কোনই উন্নতি ঘটে নাই। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ৯৪%; দশ বৎসর পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাহা ২% কমিয়া ৯২%-এ দাঁড়ায়। ইংরাজী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করায় দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ দেখা দিল। ক্রমেই শিক্ষিত ভদ্রলোক ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহা ছাড়া বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় ও বৃদ্ধির ফলে উহাও ক্রমেই ধনী ও সহরবাসীদেরই একচেটিয়া অধিকারে দাঁড়াইয়া যায়।

দুর্বলতা

ইহার সহিত উল্লেখ করিতে হয় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অবহেলা। কারণ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রী-শিক্ষার হার ছিল মাত্র ২%। কোম্পানী বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল বিদ্যারও প্রচারে উদ্যোগী হয় নাই। একমাত্র রুরকীতে ছিল একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ; সেখানে আবার প্রবেশাধিকার ছিল মাত্র ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়দের। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতাতে মাত্র তিনটি মেডিকেল কলেজ ছিল।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংযোগ ঃ ইতিপূর্বে ইউরোপের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগ ছিল উপরে উপরে মাত্র। মুঘল যুগে ইহার আরম্ভ হইয়াছিল পর্তুগীজ জেসুইট ধর্মযাজকদের সহিত সংস্পর্শ হইতে। তখন সম্রাটদের মধ্যে মাত্র জাগিয়াছিল পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত পরিচয়ের কিছুটা আগ্রহ। ঔরংজীবের আমলে যুদ্ধ-বিগ্রহ বিদ্রোহের ডামাডোলে অভিজাত ভারতীয়দের সংস্কৃতি বিষয়ে চিন্তার কোন অবসরই ছিল না। ইহার পর হইতে ভারতের রাজন্যবর্গের সহিত ইউরোপের যে সম্পর্ক ছিল তাহা সীমাবদ্ধ ছিল গুলিগোলা-কামান-বন্দুক প্রভৃতির শিক্ষা ও উৎপাদনকে কেন্দ্র করিয়া। এই সময়ে অবশ্য চিত্রাঙ্কন ও স্থাপত্য বিষয়ে পাশ্চাত্যের কিছু মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় কলিকাতার করিন্থের স্তম্ভ (Corinthian pillars) এবং লক্ষ্ণৌর স্থাপসেনিক আর্চ নির্মাণের মাধ্যমে। কিন্তু সত্যকার সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটিয়াছিল অতি সামান্যই।

সত্যকার সংযোগের সুযোগ দেখা দিল ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে। নূতন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উচ্চ বংশীয় এবং সুরুচি-সম্পন্ন। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয়দের সহিত সদাসর্বদা ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যেই প্রথমে জাগিল সর্বপ্রথম ইউরোপের চিন্তা-ভাবনা জীবনদর্শন সম্বন্ধে জানিবার কৌতুহল। একদিকে ইহার পিছনে ছিল উত্তমরূপে ইংরাজী শিখিয়া জীবিকার ক্ষেত্রে উন্নতি বিধান, অপর দিকে ছিল কোন্ গুণে ইউরোপীয়গণ এত দ্রুত জগৎ জয় করিতে সমর্থ হইল, তাহা আবিষ্কার।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাংলার এই দুই আন্দোলনের ধারা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। আন্দোলনের-দুইটিই ছিল একে অপরের পরিপূরক। ভারতীয়দের পক্ষে এই দুই ধারার সমন্বয়িত রূপ ছিলেন রামমোহন রায় এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে ছিলেন উইলিয়ম জোন্স, কেরী, স্যামিয়ন প্রমুখ মিশনারীগণ এবং যুক্তিবাদী শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ার।

এই সমস্ত শক্তি একত্রিত হইয়া যে, তীব্র সৃজনশীল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল, রামমোহন রায় ছিলেন তাহার মূর্তিমান বিগ্রহ। কোম্পানী প্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটি সত্ত্বেও ভারতের বুদ্ধিজীবী এবং মনীষীগণ ইংরাজীর মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের দর্শন বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সহিত পরিচয় লাভ করেন। বাংলায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংযোগের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি রামমোহন ব্যতীত বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ জ্ঞানীগুণী। প্রকৃতপক্ষে ভারত মধ্যযুগের জড়ত্ব ও অন্ধকার হইতে আধুনিক জগতে প্রবেশ করিয়াছে শিক্ষার মাধ্যমেই।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঃ বাংলা ও মহারাষ্ট্র

[Social and Cultural movements : Bengal and Maharashtra]

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বরূপ—বাংলা ঃ পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক জগতের সহিত সংঘাতের ফলে অচিরেই ভারতে এক নবজাগরণের উন্মেষ ঘটিল।

পাশ্চাত্যের বিজয়ের ফলে ভারতের সমাজের দুর্বলতাগুলি চাক্ষুষ হইয়া পড়িল। চিন্তাশীল ভারতীয়গণ নিজ সমাজের ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে যখনই সচকিত হইলেন, তখনই তাঁহাদের সঙ্গে প্রবল আন্দোলন গড়িয়া উঠিল সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজাগরণের জন্য। আর নব-জাগরণের প্রাণশক্তি তাঁহারা আহরণ করিলেন পাশ্চাত্যের জ্ঞান সমুদ্র হইতে। পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদের প্রতি তাঁহারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন। তাহার সহিত নূতন যে সকল ধনিকশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী এবং আধুনিক বুদ্ধিজীবিগণ সকলেরই স্বার্থ এই আধুনিকীকরণের সহিত জড়াইয়াছিল, ইহারই ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসন অবসানকল্পে যে স্বাধীনতা আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন ধারায় প্রবহমান থাকিয়া অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহার সূচনা সন্নিহিত রহিয়াছে বঙ্গদেশের এই পুনর্জাগরণের ইতিহাসে। যাঁহার মানসলোকে আধুনিকতার নবসূর্যোদয় হইয়াছিল, যিনি মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতাকে দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি হইলেন রাজা রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রীঃ)। পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিকতার সহিত প্রাচীন ভারতের মূল্যবোধের সমন্বয় করিয়া যিনি এই জাগরণকে ব্যাপকতা দানে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬ খ্রীঃ)। শুধু বাংলায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃতি-সংস্কার আন্দোলনের যে নূতন অধ্যায় রচিত হইয়াছিল তাহার সূচনায় রামমোহন, সমাপ্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ। এই সুদীর্ঘ সময়কালের মধ্যে আরও অনেক মনীষী ও সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের মহান প্রচেষ্টায় এদেশবাসী এত নূতন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রীঃ)ঃ ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রে যখন মধ্যযুগীয় অন্ধকার ঘনীভূত, সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম (১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রীঃ)। চরম অর্থ-নৈতিক দুর্গতির পরিবেশে ঊনিশ শতকের ইতিহাসে একটি সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া ভারতে নবজাগরণের অধ্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে প্রথম আধুনিক মানুষ রামমোহন। হিন্দু সমাজের তৎকালীন গলদসমূহের মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন, সংস্কারের পর সংস্কারের প্রস্তাব রাখিয়াছেন, ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন পরবর্তী যুগের প্রগতিশীল কার্যাবলীর। ভারতের আধুনিকতার পথে ইহাই যাত্রারম্ভ।


রাজা রামমোহন

রামমোহনের সামাজিক সংস্কারের মধ্যে সর্ব-প্রথম উল্লেখযোগ্য তাঁহার সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রচেষ্টা। গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথাকে বে-আইনী, নরহত্যাদায়ে দণ্ডনীয় অপরাধরূপে ঘোষণা করিলেন। বেণ্টিঙ্কের আইন সমর্থনে রামমোহন ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। কারণ

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে একটি আবেদনপত্র প্রিভি কাউন্সিলে প্রেরিত হইয়াছিল। রামমোহন ইহার প্রতিবাদে অকাট্য যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন। অবশেষে তাঁহার বিরামহীন প্রয়াস সফল হইল। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ বেন্টিঙ্কের আইন অনুমোদন করিলেন।

জাতিভেদ প্রথা

হিন্দু সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—জাতিভেদ প্রথা। বিভেদ প্রবণতা ও অস্পৃশ্যতা ইহার বিষময় কুফল। রামমোহন বর্ণাশ্রম ধর্মবিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন। নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল রামমোহনের সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিই তাহাকে সতীদাহ নিবারণে প্রেরণা দিয়াছিল। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে বিধবার সম্পত্তি অধিকারকল্পে তিনি হিন্দু আইন সংস্কারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণের বহু বিবাহ প্রথার বিলোপ-সাধনে এবং বাল্য বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথাকে সমাজে সক্রিয় করিতে তিনি যত্নবান হইয়াছিলেন।

নারী কল্যাণ

ধর্ম

হিন্দু ধর্মানুশীলনে রামমোহনের বিরাট কীর্তি একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করিয়া বেদান্তিক বা ঔপনিষদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই একেশ্বরবাদকে অবলম্বন করিয়া তিনি হিন্দু সমাজের সকল বর্ণকে একতাসূত্রে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের একেশ্বরবাদ এবং হিন্দু শাস্ত্রসম্মত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি সকল ধর্মের মিলনের প্রশস্ত পথ রচনা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন এবং পরে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রহ্মসভা'। তৎকালীন হিন্দু-ধর্মের সংস্কার ও পৌত্তলিকতা দূর করাই ছিল তাঁহার মূল উদ্দেশ্য।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক হিসাবে রামমোহনের নিরলস সংগ্রাম কাহিনী অবিস্মরণীয়। ডেভিড হেয়ার এবং অন্যান্যের সহায়তায় তিনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ (পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত) প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ ব্যয়ে তিনি একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সেখানে বলবিদ্যা, ভলটেয়ারের দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। বাংলা ভাষা প্রচারেও তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বাংলা ব্যাকরণও রচনা করিয়াছিলেন। ভারতে জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতারও জনক রামমোহন। দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা, ইংরাজী, ফারসী এবং হিন্দীতে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন, নিষ্কর জমির উপর কর বসানোর প্রতিবাদ করেন এবং ভারতীয় পণ্যের উপর রপ্তানী শুল্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সমসাময়িক জগতে রামমোহনই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আধুনিক যুগের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, মানবসভ্যতার আদর্শের চরিতার্থতা বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে না, করে যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে, তেমনি জাতিতে জাতিতেও পারস্পরিক নির্ভরতার উপরে।

ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে হতবাক হইতে হয়, কি করিয়া রামমোহনের এই প্রাচ্য-

পাশ্চাত্যের সমন্বয়ীরূপ ইউরোপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১২ সালে যখন স্পেনের বিপ্লবীরা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পরে যে সংবিধান রচনা করেন, তাহা তাঁহারা উৎসর্গ করিয়াছিলেন প্রাচ্যের মহাপণ্ডিত রামমোহন রায়কে। আবার আমেরিকায় যখন দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে একটি ঘোষণাপত্র ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন রামমোহন রায়ের নামে।

ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ঃ ডিরোজিও কলিকাতায় এক ইউরেশীয় (Eurasian), তথা পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ডিরোজিও পরাধীন ভারতের মর্মবেদনা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেন। ভারতের গৌরবময় অতীতের পুনরুত্থানের তিনি স্বপ্ন দেখিতেন। সেই নবজাগ্রত ভারত হইবে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত; সে ভারত হইবে সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী এবং অতীতের তুলনায় আরো গরিমাময়ী। তিনি ছাত্রদের সম্মুখে মানবতার মহান আদর্শগুলি তুলিয়া ধরিতেন।


ডিরোজিও

ইহার ফলে এক নূতন আলোড়ন দেখা দিল, কলকাতার রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে। বিপ্লবী ও বিধর্মী ডিরোজিওকে তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। কর্তৃপক্ষ হিন্দু কলেজের স্বার্থের দোহাই দিয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে অনধিক তেইশ বৎসর বয়সে ডিরোজিওর মৃত্যু হয়।

ইয়ং বেঙ্গল

ডিরোজিও প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রভাব তৎকালীন যুবকবৃন্দের মধ্যে বাঁচিয়া রহিল। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখ ডিরোজিওর প্রিয়তম ছাত্রবৃন্দ তাঁহার ভাবধারাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন। উত্তরকালে এই যুবকবৃন্দই গড়িয়াছিলেন ইয়ং বেঙ্গল বা তরুণ বাংলা।

সংস্কৃতি ও নূতন সমাজ গঠন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এই মনীষিবৃন্দের সাময়িক প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁহারা রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করিতে সক্রিয় ছিলেন। দেশের সকল প্রকার সামাজিক ও শিক্ষামূলক উন্নয়ন কার্যের সহিত ইঁহারা সংযুক্ত ছিলেন। সমাজে স্ত্রীজাতির হীন অবস্থা, জাতিভেদ প্রভৃতি যে গলদসমূহ প্রকট ছিল, ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা তাহার বিরোধিতা করেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, কারিগরি শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি ছিল তাঁহাদের কর্মসূচীর অপরাপর অঙ্গ। ইহাদের উদ্যমেই শিশুশিক্ষা বিস্তারের জন্য বাংলা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতে চিকিৎসাবিদ্যায়

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণয়নের জন্য তাঁহারা সবিশেষ প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভিত্তি রচিত হইল।

কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ডিরোজিওর অনুগামী ধর্মশূন্য ইয়ং বেঙ্গল দল প্রাচীন ভারতের জীবনচর্চায় স্থায়ী বিপ্লব ঘটাইতে পারিল না। নব্য-ভারতের গতিপথ ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি ধর্মাশ্রয়ী সংস্কার মাধ্যমে নির্ধারিত হইল। ধর্মাশ্রয়ী সমাজ আন্দোলন ও বহুমুখী সংস্কার সাধনের মাধ্যমে ভারতের নবজাগরণ ঘটিল, ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের ধারায় নহে।

ধর্মাশ্রয়ী নবজাগরণের পথে রামমোহনের উত্তরাধিকার বহন করিলেন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা। ভারতের পুনর্জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের অবদান কম নহে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, ইংরাজীর সহিত সমমর্যাদায় বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রবর্তন, পৌত্তলিক ধর্ম বিরোধী প্রচারণা ও বেদ উপনিষদের ধর্মের গুণগান—এই সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে একটি বিরোধী মতবাদ সোচ্চার হইয়া উঠিল। এই মতবাদের নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা নতুন ব্রাহ্ম-মন্দির শুধু বাংলায় নহে, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতেও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেশবচন্দ্রব সেন

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ভারতীয় সংস্কার সংস্থা' স্থাপন করিলেন এবং এক ব্যাপক সংস্কার-সূচী গ্রহণ করিলেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি, শ্রমজীবীদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা, সুলভ সাহিত্যপ্রচার, মিতাচার ও বদান্যতা—পাঁচটি ভাগে কর্মসূচী বণ্টন করা হইল। স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইল, শ্রমজীবীদের অবৈতনিক শিক্ষার ভার ব্রাহ্ম যুবকগণ গ্রহণ করিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের সমর্থনে নতুন বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল এবং আন্তর্বর্ণ বিবাহ চালু হইল। মদ্যপান প্রথাকে সংযত করা হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বহু সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত কাজে হাত দিল। স্ত্রীজাতির উন্নয়ন বহুল পরিমাণে ঘটিয়াছিল। তাহারা উচ্চশিক্ষার অধিকারী হইল। পর্দানশীনতা ঘুচিয়া গেল; বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হইল। বিধবা বিবাহ প্রবর্তিত হইল। বঙ্গদেশের শহরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য ব্রাহ্ম শিক্ষা-সংস্থার সংগঠন হইল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১ খ্রীঃ)ঃ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসের একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল, ইউরোপীয় আদর্শে একজন সমাজ বিপ্লবী। এই কারণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। অফুরন্ত বদান্যতার জন্য তিনি 'দয়ার সাগর' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়া

তাঁহাকে বলা হইত 'বিদ্যাসাগর'। বঙ্গদেশের গোড়া হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়াও তিনি সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কার দ্বারা তিনি নবযুগের সোপান সৃষ্টি করেন।

আধুনিক ভারত গঠনে বিদ্যাসাগরের দান অপরিসীম এবং বহুবিধ।


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্যও তিনি আপ্রাণ প্রয়াস করেন। তিনি নদীয়া বর্ধমান মেদিনীপুর হুগলী প্রভৃতি স্থানে পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় ও কুড়িটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। বেথুন স্কুল পরিচালনা তাঁহার অন্যতম কীর্তি।

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগর চিরস্মরণীয়। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। রামমোহনের ধারায় তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বিধবা বিবাহের সমর্থনে বহু প্রচার পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে জনমত গঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রার্থনা সমাজ ঃ বঙ্গদেশ ছিল সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে। কিন্তু বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ও ভারতীয় নবজাগরণে বেশ কিছু অবদান আছে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংস সভার ভিত্তিরচনা দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের বাণী মহারাষ্ট্র প্রদেশে পৌঁছিয়াছিল। বস্তুত কেশবচন্দ্রের উৎসাহে ও পরিচালনায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রার্থনা সমাজ। ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় প্রার্থনা সমাজেরও আদর্শ ছিল দুইটি—ধর্ম ও সমাজ সংস্কার। নামদেব তুকারাম এবং রামদাস প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ ছিলেন প্রার্থনা সমাজের আদর্শ পুরুষ। প্রার্থনা সমাজের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে।

ঈশ্বরবাদী হইয়াও ধর্মানুশীলনের পরিবর্তে সমাজ সংস্কারমুলক কার্যেই প্রার্থনা সমাজ অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা নিবারণ, সকল জাতির পংক্তিভোজন, আন্তর্জাতিক বিধবা বিবাহ, বিবাহ প্রচলন, নারী জাতির মর্যাদাপ্রতিষ্ঠা এবং নিম্নজাতির মধ্যে শিক্ষাপ্রসার—এই সকল সংস্কার কার্যে প্রার্থনা সমাজ আত্মনিয়োগ করে। সমাজ পন্ধরপুরে অনাথ আশ্রম স্থাপন করে। ইহা ছাড়া ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বহু স্থানে তাহারা শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয়, বিধবা সমিতি ও দুংস্থদের সাহায্যার্থে প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন করেন। মহারাষ্ট্রের নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন বিচারপতি রাণাডে। সমাজের সংস্কার-সাধনে তিনি মানবপ্রেমকে কেন্দ্র করিয়া একটি নূতন দার্শনিক তত্ত্ব দেশবাসীকে দান করেন।

দাদাভাই নওরোজী ছিলেন বোম্বাই-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। পার্শীধর্ম সংস্কার-এর উদ্দেশ্যে তিনি পার্শীয় এ্যাসোসিয়েশন গঠন করিয়া পার্শী মহিলাদের অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করেন।

৯ | কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহসমূহ
[Peasant unrest and uprisings]

কৃষক অভ্যুত্থানসমূহ ঃ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রভাবে ভারতের জাতীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের স্থচনা হয়। কিন্তু এই সকল পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের স্বার্থ ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী হওয়ায় তাহাদের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার করে। কোথাও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে অসন্তোষের সূত্রপাত ঘটে। কোথাও বা অর্থ নৈতিক শোষণ অথবা ধর্মীয় ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের ফলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সাধারণত, ভারতবাসী ইংরাজ বণিক গোষ্ঠীর শাসন ও শোষণ ধৈর্য-সহকারে সহ্য করিলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে তাহারা সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। ঐতিহাসিক উইলসন যথার্থই বলিয়াছেন যে, এই বিস্ফোরণগুলির নমুনা হইতেই ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষক বিদ্রোহ ঃ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়িয়া ইংরাজ কোম্পানীর নূতন ঔপনিবেশিক ভূমি ব্যবস্থা ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের বারাসতে রায়বেরেলির সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য মীর নিসার আলি বা তিতুমীর ঐ অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে এক বলিষ্ঠ নীলকর এবং জমিদার-এর শোষণ বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। উহা ওয়াহাবী আন্দোলনের অংশরূপে আরম্ভ হইলেও অচিরেই শোষণ বিরোধী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কৃষক আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তীতুমীর ২৪ পরগণার নারিকেলবেরিয়ায় বাঁশের কেল্লা বানাইয়া তাঁহার ঘাটিটি স্থরক্ষিত এবং নীলকর ও জমিদারদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রায় ৫০০ পাইকদের স্থশিক্ষিত করেন। এই বাহিনী লইয়া তিতুমীর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কলিকাতা হইতে প্রেরিত একটি বাহিনী তাহাকে দমনে অসমর্থ হয়। হুগলী কারখানার ম্যানেজার সপরিবারে তাঁহার হস্তে বন্দী হন। শেষ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম হইতে সৈন্যবাহিনী আসিয়া গোলার মুখে বাঁশের কেল্লা উড়াইয়া দেয়। তিতুমীর শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

তবে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তর ভারতের (Upper India) সর্বাপেক্ষা প্রকট হইয়াছিল। শোর-এর ভাষায় : '১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, উত্তর প্রদেশে এমন একটি জেলা বিরল ছিল, যেখানে বিচ্ছিন্নতার ভাব কমবেশী দেখা যাইত না।' ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহারানপুরের নিকট গুজার বিদ্রোহই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলটি দোয়াবের একটি অংশ ছিল এবং দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে (১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ) পরাজয়ের পর সিন্ধিয়া উহাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামদয়াল নামক এক জমিদারের ভূসম্পত্তি

উত্তর ভারতে কৃষক বিদ্রোহ

ইংরাজগণ অধিকার করিলে গুজারগণ বিদ্রোহ করে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করে। ইংরাজ সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮০৭ খ্রীঃ সমগ্র দিল্লী অঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল, ১৮১৪ খ্রীঃ বারাণসীর অদূরে রাজপুত কৃষকদের প্রতিরোধে জনৈক 'বহিরাগতের' নিকট একটি বড় গ্রামের জমিদারীর অবাধ নিলাম-বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নিষ্কর জমির উপর খাজনা ধার্যের প্রতিবাদে ওড়িশার কৃষকেরা ১৮১৭-১৮ সালে স্থানীয় সামন্তনেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

ভিক্ষুকের বিদ্রোহ

তবে ইহার পূর্বে পাতিয়ালা রাজ্যে বদাওয়ার নামক স্থানে একজন ধার্মিক ভিক্ষুক নিজেকে 'কলি'র অবতার বলিয়া ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহও ইংরাজ সরকার দমন করেন।

কৃষক প্রধান জাঠ জাতির বিদ্রোহ

দিল্লীর পশ্চিমে রোহ্‌টক জেলায় কৃষকপ্রধান জাঠ জাতি দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর তাহাদের অঞ্চল ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাহাদের সহিত মেওয়াটি ও ভাটিয়া কৃষক সম্প্রদায়ও যোগদান করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়।

কোলি বিদ্রোহ

গুজরাটেও ইংরাজের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ হয়। কচ্ছের সীমান্ত হইতে আগত কোলি নামে এক রুক্ষ সম্প্রদায় ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। তাহাদিগকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে দমন করা হইলেও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা পুনরায় বিদ্রোহ করে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে দিবাকর দীক্ষিত নামে এক ব্রাহ্মণও বিজাপুরের পূর্বস্থিত সিন্দগী লুণ্ঠন করে। ঐ বৎসরেই ধারওয়ার-এর নিকটে কিট্টুর-এ বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহগুলি ভয়াবহ রূপ গ্রহণ না করিলেও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ব্রিটিশ শাসন ও শোষণনীতির বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই ব্যাপক। প্রাক্তন মারাঠা সৈন্যদের সমর্থনপুষ্ট রামুসি-বিদ্রোহ ১৮২৬-২৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র পুনা জেলাকে আলোড়িত করিয়াছিল। অবশেষে সরকার প্রজাস্বত্ব ভোগীদের কম খাজনার দাবি মানিয়া লওয়ায় সে আন্দোলন থামে। ১৮৩০-৩১ খ্রীঃ বেদগেরে খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ ঘটিলে সরকার মহীশূরে সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে বিদ্রোহ

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণেও ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। ধর্মীয় কারণে আরম্ভ হইলেও কার্যত এই সমস্তই ছিল কৃষক বিদ্রোহ নানা রূপান্তর। 'পাগল পন্থীর' (Pagal Panthi) নামে সম-ধর্মীয় সংস্থা গঠন করেন করম শাহ নামে একজন ভিক্ষুক (জানুয়ারী, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ)। ভূমি জরীপ ও খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে এক ব্যাপক সাধারণ অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে খান্দেশ রাজ্যের সাবদা ও চোপদা অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার কৃষক গণবিদ্রোহ হিংস্র আকারও ধারণ করিয়াছিল। সুরাটে লবণ-কর

হিংস্র গণবিদ্রোহ

আট আনা হইতে এক টাকায় বৃদ্ধি করা হইলে জনগণ বিদ্রোহ করে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে ইংরাজ সরকার বাংলা ওজনপদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা করিলে জনগণ বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহে জনগণ 'বয়কট' এবং 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' ব্যবস্থাও অবলম্বন করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে আয়কর আইনকে

কেন্দ্র করিয়া ও প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই সকল বিদ্রোহ সীমিত গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিলেও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছিল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ্যবিস্তার বা রাজ্যশাসন কোনটাই নিরুদ্বেগে করিতে পারে নাই।

ফারাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন: অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবদুল ওয়াহাব (Abdul Wahhab) নামক একজন আরব দেশীয় যোদ্ধা মুসলমানজগতে একটি নূতন আন্দোলন গঠন করেন। যুক্তপ্রদেশের রায়বেরিলির শাহ্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ (Shah Sayyid Ahmad) আবদুল ওয়াহাবের নিকট হইতে ভাবধারা গ্রহণ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমানদের মধ্যে তদনুরূপ আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। এই আন্দোলনের আদর্শ ছিল হজরতনবীর (Prophet) রীতিনীতির যথাযথ অনুসরণ। ওয়াহাবী নেতাগণ মনে করিতেন যে, সাবেকী পবিত্রতা হইতে বিচ্যুতিই মুসলমান সমাজের অবনতির কারণ। সেজন্য তাঁহারা উপযুক্ত আদর্শ-প্রচারে যত্নবান হন। আরবদেশে এই আন্দোলন প্রধানত ধর্ম-সম্বন্ধীয় হইলেও ভারতবর্ষে এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

উৎপত্তি

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজের অবনতি ঘটে। হাণ্টার সাহেব এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার 'ভারতীয় মুসলমান' শীর্ষক গ্রন্থে।* মুসলমান পরিবারের অর্থাগমের তিনি তিনটি প্রধান উপায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন: সামরিক কর্ম, রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিচার অথবা রাজনৈতিক বিভাগের চাকুরি। ইংরাজ রাজত্বে প্রথমটি হইতে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান কর্মচারীর স্থলে একজন ইংরাজ কালেক্টর নিযুক্ত হন। এই বন্দোবস্তের অন্যতম নীতি হইল অধীনস্থ হিন্দু-কর্মচারীদের জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি দান। এইভাবে মুসলমান রাজস্ব ব্যবস্থার অবসান হওয়ায় মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় পরিবারসমূহের পদমর্যাদা ও বিনষ্ট হয়। ইহা ছাড়া বড় বড় সরকারী বা বেসরকারী চাকুরীও আর মুসলমানদের কুক্ষিগত রহিল না। ফলে, মুসলমান সমাজে অর্থ নৈতিক অবনতি অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজের অবনতি

এই পরিস্থিতিতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওয়াহাবী আন্দোলন ভারতে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনরূপে মুসলমান সমাজের সকল 'ধর্মীয় দুর্নীতি'র সমালোচনায় মুখর হয়। ইহা 'বিশুদ্ধ ইসলাম' হইতে সকল প্রকার বিচ্যুতি ঘোরতর অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করে এবং উহা পরিত্যাগ করিবার আহ্বান জানায়। কিন্তু ভারতে এই আন্দোলন শীঘ্রই ধর্মীয়-রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ সৈয়দ আহ্‌মদের (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) আদর্শ ছিল পাঞ্জাব হইতে শিখদের ও বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজদের বিতাড়িত করিয়া মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। শাহ্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ এ বিষয়ে দিল্লীর প্রখ্যাত ফকীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ-এর (১৫০২-১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

ওয়াহাবী আন্দোলনের আদর্শ

*W. W. Hunter, 'The Indian Musalmans''.

ওয়াহাবীদের কার্যকলাপ মোটামুটিভাবে ১৮২০ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং মাদ্রাজের মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে ইহার প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের বাহিরেও ওয়াহাবী সম্প্রদায় বিশেষ সক্রিয় হইয়া ওঠে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাহাদের সংগঠন ছিল বিশেষভাবে সুসংগঠিত। এই সংগঠন পূর্ববঙ্গের সীমান্ত হইতে সমগ্র উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া সিত্তানা (Sittana) পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। বহু বৎসর ধরিয়া বাংলা ও ভারতের অন্যত্র হইতে সিত্তানায় ব্রিটিশ প্রহরাকে ফাঁকি দিয়া অর্থ প্রেরিত হইত। বিভিন্ন প্রতিনিধির মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে অর্থ আদায় করা হইত বলিয়াই এইভাবে অর্থ প্রেরণ করা যাইত। বস্তুত, মুসলমানগণ ভারতকে 'দার-উল-ইসলাম'-এ (ইসলাম-ভূমি) পরিণত করার প্রেরণায় অনুপ্রেরিত হইয়া কার্য করিতেছিল।

বঙ্গদেশের বাহিরে ওয়াহাবী কার্যকলাপ

ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 'জেহাদ'-এর (ধর্মযুদ্ধ) জন্য অর্থ-সংগ্রহে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। বঙ্গদেশে মালদহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরের ওয়াহাবী নেতা ইব্রাহিম মণ্ডল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 'জেহাদ'-এর জন্য বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মালদহের রফিক মণ্ডল, অপর একজন ওয়াহাবী নেতা। তাঁহার ওয়াহাবী আদর্শে প্রগাঢ় আস্থা ছিল সুবিদিত। বহির্বঙ্গের ওয়াহাবী নেতাদের প্রধান ছিলেন মুহম্মদ হুসেন ও আহ্‌মদউল্লাহ্‌।

ওয়াহাবী নেতৃবৃন্দ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে ওয়াহাবী সম্প্রদায় কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। এই সময়ে তাহাদের বহু নেতা ছিলেন কারারুদ্ধ এবং কর্মকেন্দ্র পাটনার সহিত যোগাযোগও ছিল বিচ্ছিন্ন। ইহা ছাড়া ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ কেবলমাত্র 'সিপাহীগণেরই ব্যাপার'। তৎসত্ত্বেও তাহারা ব্রিটিশের প্রতি বিন্দুমাত্রও সমর্থন জানায় নাই। তাহারাই সর্বপ্রথম চর্বির টোটার সংবাদ প্রচার করিয়াছিল। ইহা ছাড়া হায়দরাবাদ, পাটনা এবং আগ্রায় বিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থানসমূহকে অনেকে তাহাদেরই কার্যকলাপ বলিয়া মনে করেন। ব্রিটিশ সরকারের কঠোর দমন নীতি ও বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ওয়াহাবী আন্দোলন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহে ভূমিকা

ওয়াহাবী আন্দোলন ভারতে মুসলমান সমাজের জাগরণের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় অধ্যায়। এই আন্দোলন মুসলমান সমাজে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক অপূর্ব ঐক্যবোধের সঞ্চার করিয়াছিল। ভারতের মুসলমান কৃষক সমাজেও এই আন্দোলন এক প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। নীলকরদের বিরুদ্ধেও ওয়াহাবী সম্প্রদায় আন্দোলন চালাইয়াছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ইহারাই প্রথম সুস্পষ্ট ভাষায় প্রতিযোগিতার আহ্বান জানাইয়াছিল।

ওয়াহাবী আন্দোলনের গুরুত্ব

'ফারাজী' আন্দোলন : ওয়াহাবী আন্দোলনের ন্যায় ব্যাপক না হইলেও ফারাজী ('Farazi') নামে এক আন্দোলনও ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফরিদপুরের হাজি শরিয়াতুল্লাহ্‌ (Haji Shariatullah) নামে

জনৈক মুসলমানের নেতৃত্বে গঠিত 'ফারাজী' সম্প্রদায় ঐ আন্দোলন শুরু করে। প্রধানত পূর্ববঙ্গে এই আন্দোলনের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকিলেও কতকগুলি কারণে ইহা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, এই আন্দোলন পরবর্তী অনেক আন্দোলনের তুলনায় বহু পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার নেতা শরিয়াতুল্লাহ্ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তাঁহার আদর্শ প্রচার করিতে শুরু করিয়াছিলেন।

আন্দোলনের গুরুত্ব

দ্বিতীয়ত, পরবর্তী 'ওয়াহাবী' আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য শরিয়াতুল্লাহ্‌র আদর্শের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, 'ফারাজী' সম্প্রদায় পরবর্তীকালে 'ওয়াহাবী'দের সহিত একীভূত হইয়া যায়।

শরিয়াতুল্লাহ্‌র মতবাদ

শরিয়াতুল্লাহ্ মুসলমান সমাজে কুসংস্কার ও দুর্নীতির তীব্র নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মনে করিতেন যে, ব্রিটিশ অধিকৃত দেশ 'দার-উল-হারব' (dar-ul-harb) বা শত্রুর দেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই শত্রুর দেশে শুক্রবার বা উৎসব-উপাসনাদির অনুষ্ঠান পালনীয় নহে। এই ধরনের ভাবধারা 'ফারাজী' আন্দোলনকে অরাজনৈতিক রূপ দান করে। নিষ্কলুষ ও আদর্শবাদী জীবনযাত্রার জন্য শরিয়াতুল্লাহ্ বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু সমর্থকও ঐক্যবদ্ধ হয়।

শরিয়াতুল্লাহ্‌র সমর্থকগন

এই সকল সমর্থকদের মধ্যে ছিল ভূস্বামীদের ব্যবহারে তিক্ত-বিরক্ত কৃষক সম্প্রদায় এবং শিল্পজীবিকাচ্যুত কারিগরশ্রেণী। বস্তুত শরিয়াতুল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বই ছিল—'সমবেদনাহীন এবং উদ্যোগহীন বাঙ্গালী কৃষককে উৎসাহে উদ্দীপিত করা।' অবশ্য শরিয়াতুল্লাহ্‌র জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত শাসকশ্রেণীর কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটে নাই। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুহম্মদ মুশীন (১৮১৯—৬০)

শরিয়াতুল্লাহ্‌র পুত্র মুহম্মদ মুশীন (Muhammad Mushin) দুধু মিঞা (১৮১৯—১৮৬০) নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি পিতা অপেক্ষা অধিকতর রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন। পিতার আদর্শও মতবাদের প্রচারেই শুধু তিনি আত্মনিয়োগ করেন নাই, নিজস্ব কিছু মতামতও উহার সহিত যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল। বাহাদুরপুরে প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তিনি পূর্ববঙ্গকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করেন। এই বিভাগগুলি 'হলকোয়াস' (halqahs) নামে পরিচিত ছিল। প্রত্যেক বিভাগে একজন সহকারী বা 'খলিফা' নিযুক্ত থাকিতেন।

কার্যকলাপ

এই সহকারীর দায়িত্ব ছিল, সমিতির আদর্শ কার্যকরী করিবার জন্য 'সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ রাখা, ধর্মান্তরিত করা এবং দান সংগ্রহ করা।' দুধু মিঞার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূস্বামীদিগের অত্যাচার এবং অন্যায় অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদিগকে সংঘবদ্ধ করা। তবে এই সময়ে সাধারণ একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, 'ফারাজী' সম্প্রদায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইংরাজ বিতাড়ন ও মুসলমান শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দুধু মিঞা মুসলমান কৃষকদিগকে মুসলমান সমাজ হইতে বহিষ্কারের ভীতি প্রদর্শন করিয়া আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতেন তাহাদের বাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করিতেন; যদি

কোন মুসলমান, অথবা খ্রীষ্টান তাঁহাকে না জানাইয়া মুন্সেফের আদালতে ঋণ-উদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে মামলা করিত, তাহাকে তিনি শাস্তি দিতেন। দুধু মিঞা জমিদারগণ কর্তৃক বেআইনী কর আরোপের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ঘোষণা করেন যে, সকল ভূমিই ঈশ্বরের সম্পত্তি ও তাহাতে কাহারও কর আরোপের অধিকার নাই।

দুধু মিঞার কার্যকলাপে ক্রুদ্ধ হইয়া ভূস্বামী ও নীলকরগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। ১৮৩৮ সালে তাঁহার বিরুদ্ধে লুণ্ঠনের অভিযোগ আনা হয়। হত্যার অভিযোগে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। আবার ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বেআইনী অনুপ্রবেশ ও সমাবেশের জন্য তাঁহার বিচার হয়। লুণ্ঠনের অভিযোগেও ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এক বিচার হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষীরা সাক্ষ্যদানে বিরত থাকে এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন। তবে জমিদার-গণের নিকট হইতে ক্রমাগত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁহাকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রাজবন্দী হিসাবে আলিপুর জেলে রাখা হয়। বাহাদুরপুরে তাঁহার মৃত্যু হয় (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ)।

দুধু মিঞার পরিণতি

উপজাতীয় আন্দোলন ঃ কোল ও সাঁওতাল

[Tribal Movements : Kols and Santhals]

বোম্বাই মধ্যপ্রদেশের বাংলার একাংশ এবং সাঁওতাল পরগণা জুড়িয়া ছিল আদিবাসী কোল ও সাঁওতালদের রাজত্ব। ইংরাজ রাজত্বে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সহিত তাহাদের অধ্যুষিত অঞ্চলে নূতন নূতন শহর গড়িয়া উঠায় তাহারা বাস্তুচ্যুত হইতে আরম্ভ করে।

এই সমস্ত অঞ্চলে ইংরাজ কোম্পানীর অপশাসনের বিরুদ্ধে উপজাতিদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিতেছিল। সেইজন্য তাহাদের বিরুদ্ধে শাসকদের কঠিন ও ক্লান্তিকর 'খুদেযুদ্ধ' চালাইতে হইতেছিল। ১৮৩১-৩২ খ্রীঃ ছোটনাগপুরে সংঘটিত হোম উপজাতির বিদ্রোহ ইহার একটি উল্লেখ্য নজীর। ১৮২৪ খ্রীঃ এবং ১৮৩৯ খ্রীঃ পুনরায় সত্যাদ্রিতে কোল বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল আবার ১৮৪৪-৪৬ সালে তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল। সেই সময়েই ছোটনাগপুরের পালামৌ অঞ্চলেও ঘটিয়াছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। সিধু-কানুর নেতৃত্বে সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন বাংলাদেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্রোহী সাঁওতাল বাহিনী দলবদ্ধভাবে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইলে ইংরাজের রাইফেল ও বেয়নেটের আঘাতে রক্তের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। কলিকাতার সিধু-কানু ডহর আজও সে বিদ্রোহের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের জীবন্ত নেতা রাজা দোবরুপান্না বীরবর্দীর সহিত সাক্ষাৎকার স্বয়ং বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় 'আরণ্যক' গ্রন্থে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছেন।

পশ্চিম ভারতে দ্বিতীয় বাজীরাও কর্তৃক বহু ভীল উপজাতি বিদ্রোহে প্ররোচিত হইয়াছিল। পশ্চিমঘাটের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল তাহাদের বসতি এবং তাহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল খান্দেশ। ১৮১৮ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সাত বৎসরের ভীল বিদ্রোহ ইংরাজদের যথেষ্ট বিব্রত করিয়াছিল।

ভীল বিদ্রোহ

১০

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ
[The Revolt of 1857]

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় সৈন্যদের যে অভ্যুত্থান এই দেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূলকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল, তাহাই বহু বিতর্কিত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ইংরাজ ঐতিহাসিকদের রচনায় 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলিয়া পরিচিত। তবে বিদ্রোহের চরিত্র লইয়া মতভেদ থাকিলেও বিদ্রোহের কারণগুলি সম্বন্ধে সকলেই প্রায় একমত। এই বিদ্রোহের মূলে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক প্রভৃতি নানা কারণ নিহিত ছিল।

বিদ্রোহের কারণ সমূহ : ব্রিটিশ শক্তি একের পর এক দেশীয় রাজ্য গ্রাস করায় দেশীয় রাজন্যবর্গ ইংরাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদুপরি লর্ড ডালহৌসীর উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি তাঁহাদিগকে আতঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সাতারা, ঝাঁসী, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিয়া এবং নানা সাহেবের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া ডালহৌসী এই সকল অঞ্চলে ক্ষমতাচ্যুত শাসক ও জনমতকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইংরাজ কর্তৃক অযোধ্যা অধিকার এবং দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে তাঁহার প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করার বা তাঁহার সম্রাট উপাধি বিলুপ্ত করার চেষ্টা করিয়া মুসলমান জনগণের অন্তরে গভীর আঘাত দেওয়া হয়। একজন প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন যে ইহাতে ক্ষমতা অথবা অধিকার-চ্যুত ভারতীয়গণ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর উপর ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। বস্তুত, সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেই কয়েকজন শাসক ও তাহাদের মিত্রবর্গ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অযোধ্যার প্রাক্তন নৃপতির উপদেষ্টা আহ্‌মদ উল্লাহ্‌, নানা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব ও তাঁহার সংশ্লিষ্ট তাঁতিয়া টোপী, এবং বিহারের জগদীশপুর অঞ্চলের রাজপুতবীর কুনোয়ার সিং বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক কারণ

অর্থনৈতিক দিক হইতেও ইংরাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। ইংরাজের শোষণভিত্তিক শাসনে এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির জনগণ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করিত। কোম্পানী একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার যেমন এদেশের ব্যবসায়ীদের দুর্দশার কারণ হইয়াছিল, তেমনি ইংলণ্ডের শিল্পপ্রসারের জন্য এদেশের কুটিরশিল্পসমূহের ধ্বংস সাধন করিয়া শিল্পিগণকে মজুরে পরিণত হইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। কৃষকগণও ছিল করভারে জর্জরিত। ক্ষমতাচ্যুত শাসকগণের আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ ও সিপাহিগণ কর্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। অর্থাৎ, কোন-না-কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আর্থিক দুর্গতি ভোগ করিতে আরম্ভ করে।

অর্থনৈতিক কারণ

বিশেষ করিয়া অযোধ্যা অধিকার করার পর ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করে, যাহার ফলে অযোধ্যার জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক নূতন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অযোধ্যার তালুকদারগণ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকশ্রেণীর আর্থিক অবস্থার কোন আশু পরিবর্তন হয় নাই। তাহারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে দলে দলে যোগদান করিয়াছিল এবং এই কারণেই অযোধ্যায় বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লবের আকার ধারণ করিয়াছিল।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণেও ভারতবাসীর অন্তরে ইংরাজের বিরুদ্ধে অসন্তোস পুঞ্জীভূত হইতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্রুত প্রসার এক শ্রেণীর ভারতীয়ের মোটেই মনঃপূত ছিল না। ধর্মপ্রচারকগণের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা যেমন হিন্দু-মুসলমানকে আশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি সতীদাহ প্রথা নিবারণ, হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন, ধর্মান্তর গ্রহণ আইন সিদ্ধকরণ, এমন কি রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তনের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলমানগণ ধর্মনাশের ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য দেখিতে পাইল। ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজ কর্মচারীদের ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের ধর্ম ও নীতিবোধে আঘাত হানিয়াছিল। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অবজ্ঞা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

সর্বোপরি, সামরিক কারণেও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ইনস্ (Innes) মনে করেন যে, "সিপাহী-বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই পরিস্থিতির জটিলতা নিহিত ছিল।" ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে ভারতীয় সিপাহীদের বাহুবলেই বিস্তৃত হইয়াছিল, সেকথা ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের সিপাহীদের বেতন ও পদমর্যাদা ইংরাজ সৈন্য অপেক্ষা অনেক হীন ছিল। এমন কি তাহাদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত দিতেও ইংরাজগণ দ্বিধা করিত না। তথাকথিত 'বাংলা বাহিনী'তে কেবলমাত্র বঙ্গদেশ হইতেই নহে, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের উচ্চবর্ণের মধ্য হইতেও সেনা নিয়োগ করা হইত। এই সিপাহীগণ ছিল তাদের বর্ণ ও ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। ইংরাজদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা তাহাদের আত্মমর্যাদা ও ধর্মনিষ্ঠার পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের বাহিরে বিশেষত সাগর পাড়ি দিয়া ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। বিদেশে যুদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ ভাতার দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় সিপাহীরা অতীতে ১৮৪৪, ১৮৪৯, ১৮৫০ এবং ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দেও বিদ্রোহ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের দুঃখদুর্দশার কাহিনী ভারতীয় সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করে। নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী প্রভৃতি ইংরাজ বিদ্বেষী নেতৃগণের প্রচারকার্যের ফলেও ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের ইচ্ছা তীব্র হইয়া ওঠে।

সামাজিক কারণ

প্রত্যক্ষ কারণ : এচিসন (Aichison) যথার্থ ই মন্তব্য করিয়াছেন : "এইরূপ দাহ্য উপাদানের উপর টোটার সত্য কাহিনী শুষ্ক কাষ্ঠে স্ফুলিঙ্গ যোগ করিল।" বস্তুত,

এনফিল্ড রাইফেলের টোটার প্রবর্তন সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই টোটা দাঁতে কাটিয়া পুরিতে হইত। এই টোটা গরু ও শূকরের চর্বি দ্বারা নির্মিত এইরূপ প্রচার হইলে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ বিদ্রোহ করিল।

বিদ্রোহের গতি ঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে অসন্তোষের আগুন দেখা দিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই সেই অসন্তোষ দমন করিয়া দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে মীরাট শহরে সিপাহিগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মীরাট সেনাপতি হিউইট-এর অধীনে দুই হাজারেরও বেশী ইউরোপীয় সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তিনি বিদ্রোহ দমনের কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই। পরদিন প্রত্যুষে বিদ্রোহিগণ দিল্লী চড়াও করিল এবং দিল্লীতে তখন কোন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী না থাকায় অনায়াসে দিল্লী অধিকার করিল। তাহারা দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করিয়া বৃদ্ধ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। দিল্লীর পতন ইংরাজগণের পক্ষে বিশেষ অসম্মানজনক হইয়াছিল।

বিদ্রোহের গতি



নানা সাহেব

জন-সমর্থনের মাত্রা ঃ বিদ্রোহ শুধুমাত্র সিপাহীদের শিবিরে শিবিরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উত্তর ভারতের সর্বত্রই প্রায় জনগণের সমর্থন সিপাহীদের পিছনে ছিল। এই বিষয়ে অবশ্য উচ্চশ্রেণীর সহিত জনসাধারণের কিছুটা পার্থক্য ছিল। শিক্ষিত উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রায় নিরাসক্ত মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন। কৃষক ও কারিগরি শ্রেণী অধ্যুষিত গ্রামীন জনতারই সমর্থন ছিল বেশী। একমাত্র অযোধ্যা ব্যতীত অন্য কোনও অঞ্চলে বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে দেখা দেয় নাই। বাংলার মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রোহের তেমন প্রভাব পড়ে নাই। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব এই বিদ্রোহ হইতে মুক্ত ছিল। আন্দোলনের গতি প্রকৃতিও সর্বত্র সমান ছিল না।

বিদ্রোহের নেতৃত্ব ঃ কুনোয়ার সিং ঃ কিন্তু দিল্লী পুনরাধিকারের কোন উদ্যোগের পূর্বেই জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজপুতানা, বেরিলী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেনারস ও বিহারের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজপুতবীর কুনোয়ার সিং-এর নেতৃত্বে বিহারের আন্দোলন উইলিয়ম টেলর ও মেজর ভিন্সেন্ট আয়ার কর্তৃক সাময়িকভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বিহারের অন্যান্য অংশে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কুনোয়ার সিং-এর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা অমর সিং বিহার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কর্নেল নীল বেনারসের বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন এবং বহু ধৃত বিদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কানপুর, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীগণ অতিমাত্রায় সক্রিয় হইয়া ওঠে। তবে নর্মদা নদের দক্ষিণাঞ্চল মোটামুটি শান্ত ছিল। জর্জ লরেন্স রাজপুতানায় লর্ড এলফিনস্টোন বোম্বাই প্রদেশে অপেক্ষাকৃত শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঞ্জাব প্রদেশে শিখ প্রধানগণ, কাশ্মীরের গুলাব সিং, ভূপালের বেগম, নেপালের সুদক্ষ মন্ত্রী জং বাহাদুর প্রভৃতি শক্তিশালী ভারতীয়গণ ইংরাজের প্রতি অনুগত থাকিয়া বিদ্রোহ দমনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।

নানা সাহেব

এদিকে কানপুরে নানা সাহেব বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কানপুরের ব্রিটিশ বাহিনী হিউ হুইলারের পরিচালনায় বেশ কিছুদিন আত্মরক্ষার্থে সক্ষম হয়। অবশেষে এলাহাবাদে নিরাপদে পৌঁছিবার আশ্বাস পাইয়া তাহারা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তাহারা যখন নৌকাযোগে এলাহাবাদের পথে রওনা হইবে, তখন 'সতী চৌড়া ঘাটে' এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে চারিজন ব্যতীত সকলেই প্রাণ হারায়। বহু স্ত্রীলোক ও শিশুদের 'বিবিগড়' নামে এক গৃহে আবদ্ধ রাখা হয়। পরে তাহাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং কূপের মধ্যে তাহাদের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘটনা নানা সাহেবের নামের উপর-কালিমা লেপন করে। এই দুঃখজনক ঘটনার পরদিনই এক হিংসাত্মক ব্রিটিশ বাহিনী হ্যাভলকের অধীনে কানপুরে আসিয়া প্রতিশোধ গ্রহণে লিপ্ত হয়।

ইংরাজ কর্তৃক দিল্লী পুনরুদ্ধার

ইতিমধ্যে ইংরাজগণ দিল্লী পুনরাধিকারে মনোনিবেশ করে। ৮ই জুন আম্বালা ও মীরাট হইতে আগত ব্রিটিশ বাহিনী বিদ্রোহী সৈনিকের 'বদলীসাড়ী' নামক স্থানে পরাজিত করিল। স্যার জন লরেন্স পাঞ্জাব হইতে আরও অতিরিক্ত সৈন্য নিকলসনের নেতৃত্বে তাহাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। নিকলসন সিপাহীদের প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীর গেট উড়াইয়া দেওয়া হইল এবং ছয় দিন ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলে তাহারা শহর ও প্রাসাদ অধিকার করিল। নিকলসন মারাত্মকভাবে আহত হইলেন। ব্রিটিশ সেনাগণ সমস্ত শহর তছনছ করিয়া বহু নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করিল। বাহাদুর শাহ ধৃত হইয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত হইলেন। তথায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সম্রাটের পুত্রগণ লেফটেনাণ্ট হডসন কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইলেন। এইভাবে ভারতের বুক হইতে মোগল রাজপরিবার চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইল।

অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড

সার কলিন ক্যাম্বেল অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নেপালের জং বাহাদুরের সাহায্যে লক্ষ্ণৌতে আটক ব্রিটিশ বাহিনীকে মুক্ত করিয়া সমগ্র অঞ্চলটিকে আপন অধিকারে আনেন। অযোধ্যার তালুকদারগণ আনুগত্য স্বীকার না করিলে তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হইবে—এই মর্মে গভর্নর-জেনারেল ক্যানিং একটি ঘোষণা করিলে তালুকদারগণ গেরিলাযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু বেরিলী ইংরাজদের হস্তগত হইলে তাহাদের সকল আশাই নির্মূল হইল।

মধ্য ভারত আন্দোলনের সুযোগ্য নেতা ছিলেন তাঁতিয়া তোপী নামে একজন মারাঠা ব্রাহ্মণ। তিনি কুড়ি হাজার পল্টনসহ নানা সাহেবের বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া একযোগে কানপুরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি উইণ্ডহামকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তাঁহারা কলিন ক্যাম্বেল কর্তৃক পরাজিত হন। তাঁতিয়া তোপী তখন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সহিত যোগদান করিয়া মধ্য-ভারতে প্রচণ্ড লড়াই করিতে লাগিলেন। কিন্তু সার হিউ রোজ তাঁতিয়া তোপীকে বেতোয়া নদীর নিকট পরাজিত করিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ঝাঁসী আক্রমণ করিলেন। রাণী ও তাঁতিয়া তোপী তখন গোয়ালিয়র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মারাঠা শক্তির উত্থান আশঙ্কা করিয়া হিউ রোজ তাঁতিয়া তোপী ও লক্ষ্মীবাঈকে রোধ করিবার প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইলেন এবং অচিরেই গোয়ালিয়র পুনরুদ্ধার করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুন ঝাঁসীর রাণী পুরুষের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সাহসী সৈনিকের ন্যায় প্রাণ বিসর্জন দেন। জুলাই মাসের মধ্যেই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়। তাঁতিয়া তোপী স্থানে স্থানে বিতাড়িত হইয়া অবশেষে ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে ইংরাজদের হস্তে ধরা পড়েন। বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁহার ফাঁসি হয়। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্ভবত ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁতিয়া তোপী ও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি


তাঁতিয়া তোপী


ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার পশ্চাতে অনেকগুলি কারণ নিহিত ছিল। প্রথমত, বিদ্রোহীদের মধ্যে সহযোজন বা যোগাযোগের অভাব এই বিদ্রোহকে ব্যর্থ করে। বস্তুত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এই মহাবিদ্রোহ কোনও সুচিন্তিত বা সুপরিকল্পিত আন্দোলন হিসাবে শুরু হয় নাই।

যথাযথ সংগঠনের অভাব প্রথম হইতেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া, তাহাদের তুলনায় প্রতিপক্ষ দল ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। দেশীয় রাজগণের মধ্যে ঝাঁসীর রাণী, নানা সাহেব ও অযোধ্যার নবাব ব্যতীত অপর কোন শক্তিশালী রাজা বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। সিন্ধিয়া ও নিজাম অর্থ ও বুদ্ধি দিয়া ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের শিখ ও নেপালের গুর্খাগণ অতি বিশ্বস্ততার সহিত বিদ্রোহ দমনে ইংরাজ সৈন্যের সহিত একযোগে সংগ্রাম করে। ইংরাজও দেশীয় রাজগণের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহের পশ্চাতে কোন সর্বভারতীয় পরিকল্পনা ছিল না। কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন বিদ্রোহীদের পুরোভাগে ছিল না। বিদ্রোহের রূপ ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ায় বিদ্রোহ দমন ইংরাজের পক্ষে সহজ হইয়াছিল।

তৃতীয়ত, উপযুক্ত সেনাপতি ও নেতার অভাবেও সিপাহিগণ পরাজিত হয়। রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী প্রভৃতি নেতৃবর্গ সাহসী হইলেও ক্যাম্বেল, হ্যাভলক প্রভৃতি ইংরেজ সেনানায়কদের মতো সামরিক প্রতিভা এবং অভিজ্ঞতা তাঁহাদের ছিল না। লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি ইংরাজ সেনানায়কগণের সমকক্ষ ছিলেন না।

চতুর্থত, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ এই দুইটি বিভাগ ইংরাজের অধীন থাকায় দ্রুত সংবাদ ও সৈন্য প্রেরণ করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, কিন্তু সিপাহীদের এ সুযোগ ছিল না।

পঞ্চমত, সংখ্যা বা সমরোপকরণের দিক হইতেও বিদ্রোহীগণ ইংরাজের সমকক্ষ ছিল না। ইংরাজের উন্নত সমরাস্ত্রের বিরুদ্ধে তাহারা দাঁড়াইতে পারে নাই। তদুপরি, ভারতীয় সিপাহিগণ সামগ্রিকভাবে এই বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। বিভিন্ন অঞ্চলে সিপাহীদের অনেকেই ছিল রাজভক্ত (loyal); অনেকেই ইংরাজপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং বহুস্থলেই জনসাধারণের সহিত তাহাদের বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। এই সকল কারণে ইংরাজদের পক্ষে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল।

বিদ্রোহের স্বরূপ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি বা স্বরূপ লইয়া নানা মতভেদ আছে। এই বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা শুধুমাত্র সিপাহীদেরই বিদ্রোহ কিনা, সে বিষয়ে আজিও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেও সিপাহীদের অসন্তোষ মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। তবে এই সকল বিদ্রোহ ছিল ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমিত এবং সহজেই দমিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের তীব্রতা এতই বেশী ছিল যে, ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি শিথিল হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

বিদ্রোহের প্রকৃতি : এই বিদ্রোহের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ এবং সিংহাসনচ্যুত রাজন্যবর্গের অসন্তোষের প্রতিক্রিয়ারূপেই চিত্রিত করিলেও তাঁহাদের মধ্যেও বিরোধ দেখা যায়। নর্টন, ম্যালেসন, কেই প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই বিদ্রোহকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ-কল্পে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিযান বা ষড়যন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামরূপে আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রখ্যাত ভি. ডি. সাভারকারের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান, দাদাভাই নৌরজি প্রমুখ দেশীয় নেতৃবৃন্দ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অভ্যুত্থানকে সিপাহী বিদ্রোহরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে দুইজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং আরও কেহ কেহ, বহু তথ্য সঙ্কলিত করিয়া এই ভারতীয় বিদ্রোহের উপর নূতন করিয়া আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুরাতন বিতর্কের কোনই নিষ্পত্তি হয় নাই।

সিপাহী বিদ্রোহ না স্বাধীনতা সংগ্রাম ?

তবে সাম্প্রতিক বিতর্কের ফলে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়। কেই বা ম্যালেসন যাহাই বলুন না কেন, কোনও সুপরিকল্পিত চক্রান্তের পরিণামে এই বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই বা কোন রাজনৈতিক দল ইহার পুরোভাগে ছিল না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ইহার সূচনা হইয়াছিল এবং কোন বিদেশী শক্তি দ্বারা ইহা প্ররোচিত হয় নাই। বস্তুতঃ কোন সুচিন্তিত রাজনৈতিক পরিকল্পনা বা আদর্শ এই বিদ্রোহের মূলে নিহিত ছিল না। ইহা ছিল ইংরাজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের মহান উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ ; এই বিদ্রোহই ভারতে ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক অভ্যুত্থান। ইহাও সত্য যে, সিপাহীদের মধ্যে সকলেই এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে নাই ; বরঞ্চ তাহাদের অনেকে ইংরাজদের সাহায্য করিয়াছিল। তবে এই বিদ্রোহ কেবল সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে বে-সামরিক জনগণের মধ্যেও ইহার প্রসার ঘটিয়াছিল। আলফ্রেড লায়াল প্রমুখ তৎকালীন অনেক ইংরাজ কর্মচারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই মতবাদও ভিত্তিহীন। ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে ইহার সূত্রপাত হইলেও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয়গণ ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরাজ শক্তির মোকাবিলা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ তখনও এমনভাবে হয় নাই যে, সমগ্র দেশের সর্বস্তরে এই বিদ্রোহের প্রসার আশা করা যাইতে পারে। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব এই বিদ্রোহের প্রসার মুক্ত ছিল। মহারাষ্ট্রে ইহার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। বঙ্গদেশেও ইহা তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। একমাত্র অযোধ্যাতেই এই বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলনের রূপ ধারণ করিয়াছিল।

বিদ্রোহের ফলাফল : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাস এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিদ্রোহের পর বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব একটি বণিক কোম্পানীর উপর রাখা অসমীচীন বিবেচনা করিরা মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনের বলে এই উপমহাদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এতদিন পর্যন্ত যে দায়িত্ব কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী এবং বোর্ড অব কণ্ট্রোলের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা এখন ভারতসচিব উপাধিধারী একজন ক্যাবিনেটের পর্যায়ের মন্ত্রী ও তদীয় কাউন্সিলের উপর অর্পণ করা হয়। বৃটিশ ভারতের শাসককে গভর্নর-জেনারেল দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত সংযোগ-রক্ষাকারী ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিরূপে ভাইসরয় নামে অভিহিত করা হয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন।

বিদ্রোহের ফলাফল

কোম্পানীর শাসনের অবসান

মহারাণী কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ একটি ঘোষণাপত্র দ্বারা ভারতীয়দের জানান হইল (নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহার দ্বারা ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হইয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কা দূর করা হয়। এই প্রচারপত্রে আরও বলা হয় যে, কোম্পানীর আমলের সকল চুক্তি বলবৎ থাকিবে। বিদ্রোহের ফলে ভারতীয়দের মনে জাগ্রত বিদ্বেষভাব দূর করার জন্য প্রচার করা হয় যে, ব্রিটিশ প্রজা হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যতীত অপর সকলকেই ক্ষমা করা হইবে। ইহার ভিন্ন, ভারতীয়দের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যোগ্যতানুযায়ী সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র

সিপাহী বিদ্রোহের অপর এক প্রত্যক্ষ ফল হইল সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়। সেনাবাহিনীতে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। গোলন্দাজবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় সৈনিক দ্বারা গঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইল।

সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন

দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্পর্কেও ব্রিটিশ নীতির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। এই রাজ্যগুলির উপর নির্দেশ দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে তাহাদের ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমত্ব মানিয়া চলিতে হইবে।

দেশীয় রাজনীতির পরিবর্তন

কিন্তু এই সকল পরিবর্তন সাধন করিয়াও ইংরাজ সরকারের পক্ষে নিশ্চিতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয় নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলে ভারতীয় ও ইংরাজের মধ্যে যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্ট হয়, তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ব্রিটিশ শাসননীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের রাজনৈতিক চিন্তাধারারও পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে, বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন নূতন ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরিণামে ভারত এক নূতন যুগের সম্মুখীন হয়।

পরিশিষ্ট

বংশ-তালিকা

মৌর্য বংশ

- চন্দ্রগুপ্ত
  - বিন্দুসার
    - অশোক
      - মহেন্দ্র ?
      - সঙ্ঘমিত্রা
      - রুমতী
      - কুণাল
        - বন্ধপালিত (দশরথ ?)
        - সম্প্রতি
          - * * *
            - বৃহদ্রথ
      - জলৌক
      - তীবর

গুপ্ত বংশ

- গুপ্ত
  - ঘটোৎকচ
    - প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
      - দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য
        - প্রথম কুমারগুপ্ত
          - স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য
            - ?
              - দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
          - পুরুগুপ্ত
            - নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য
              - তৃতীয় (?) কুমারগুপ্ত
                - বিষ্ণুগুপ্ত
            - বুধ গুপ্ত
            - ? বৈন্যগুপ্ত
            - ? ভানুগুপ্ত
        - প্রভাবতী (বাকাটক রাজমহিষী)

পুষ্যভূতি বংশ (থানেশ্বর)

- নরবর্ধন
  - প্রথম রাজ্যবর্ধন
    - আদিত্যবর্ধন
      - প্রভাকরবর্ধন
        - দ্বিতীয় রাজ্যবর্ধন
        - হর্ষবর্ধন (শিলাদিত্য)
          - কন্যা = দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (বলভী)
        - রাজ্যশ্রী (মৌখরী রাজ্ঞী)

প্রতিহার বংশ

- অজ্ঞাত
  - প্রথম নাগভট
  - নাম অজ্ঞাত
    - কাকুস্থ
    - দেবরাজ
      - বৎসরাজ
        - দ্বিতীয় নাগভট
          - রামভদ্র
            - প্রথম ভোজ (কনৌজ)
              - যুবরাজ নাগভট
              - প্রথম মহেন্দ্র পাল
                - প্রথম মহীপাল
                  - দেবপাল (?)
                    - দ্বিতীয় মহীপাল (?)
                  - বিজয় পাল (?)
                    - রাজ্যপাল (?)
                      - ত্রিলোচন পাল (?)
                        - যশোপাল (?)
                - দ্বিতীয় ভোজ
                - বিনায়ক পাল
                  - দ্বিতীয় মহেন্দ্রপাল

বাংলার পালরাজ বংশ

- দয়িত বিষ্ণু
  - বপ্যট
    - প্রথম গোপাল
      - ধর্মপাল
        - ত্রিভুবন পাল
        - দেবপাল*
          - রাজ্যপাল
      - বাকপাল
        - জয়পাল
          - প্রথম বিগ্রহপাল (প্রথম শুর পাল)
            - নারায়ণ পাল
              - রাজ্যপাল
                - দ্বিতীয় গোপাল
                  - দ্বিতীয় বিগ্রহপাল
                    - প্রথম মহীপাল
                      - নরপাল
                        - তৃতীয় বিগ্রহপাল
                          - দ্বিতীয় মহীপাল
                          - দ্বিতীয় শুরপাল
                          - রামপাল
                            - রাজ্যপাল
                            - কুমারপাল
                              - তৃতীয় গোপাল
                            - মদনপাল
                              - গোবিন্দপাল

* সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত তথ্যানুসারে দেবপালের উত্তরাধিকারিগণ সম্পর্কে কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে।

বাংলার সেনবংশ

সামন্ত সেন
|
হেমন্ত সেন
|
বিজয় সেন
|
বল্লাল সেন
|
লক্ষ্মণ সেন
|
বিশ্বরূপ সেন — কেশব সেন

বিশ্বরূপ সেন
|
কুমার সেন — পুরুষোত্তম সেন

বাতাপীর চালুক্যবংশ

জয়সিংহ
|
রণরাগ
|
প্রথম পুলকেশী
|
প্রথম কীর্তিবর্মন — মঙ্গলেশ

প্রথম কীর্তিবর্মন
|
দ্বিতীয় পুলকেশী — বিষ্ণুবর্ধন (পূর্ব চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা)

দ্বিতীয় পুলকেশী
|
প্রথম বিক্রমাদিত্য
|
বিনয়াদিত্য
|
বিজয়াদিত্য
|
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য
|
কীর্তিবর্মন

দিল্লীর সুলতানবৃন্দ

দাস বংশ (১২০৬—১২৯০ খ্রীঃ)

- কুতবউদ্দীন আইবক
  - আরাম শাহ্
  - কন্যা = ইলতুৎমিস
    - নাসিরউদ্দিন মামুদ
    - রুকুনউদ্দীন ফিরুজ
      - আলাউদ্দীন মামুদ
    - রাজিয়া
    - মুইজ-উদ্দীন বহরাম মামুদ
    - নাসিরুদ্দীন
    - কন্যা = গিয়াসুদ্দীন বলবন (ইলতুৎমিসের ক্রীতদাস)
      - মহম্মদ
      - বুঘরা খাঁ
        - কাইকোবাদ

খলজী বংশ (১২৯০—১৩২০ খ্রীঃ)

- মালবের খলজীগণ
- জালালউদ্দীন ফিরুজ (সিংহাসন প্রাপ্তি—১২৯০ খ্রীঃ)
  - রুকনুদ্দীন
- শিহাবুদ্দীন মামুদ
  - আলাউদ্দীন খলজী
    - খিজির খাঁ
    - শিহাবুদ্দীন উমর
    - কুতবউদ্দীন মুবারক
      - নাসিরুদ্দীন খুসরু (দখলকারী)

তুঘলক বংশ (১৩২০—১৪১৩ খ্রীঃ)

- গিয়াসউদ্দীন তুঘলক
  - মহম্মদ বিন তুঘলক
- রাজব
  - ফিরুজ শাহ
    - ফতে খাঁ
      - গিয়াসউদ্দীন তুঘলক (দ্বিতীয়)
      - নসরৎ শাহ
    - জাফর খাঁ
      - আবুবকর
    - নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ শাহ
      - আলাউদ্দীন সিকন্দর
      - মামুদ শাহ

মোগল বংশ

- বাবর
  - হুমায়ুন
    - আকবর
      - জাহাঙ্গীর (সেলিম)
        - খসরু
        - পরভেজ
        - শাহজাহান
          - দারা
          - সুজা
          - ঔরঙ্গজীব
            - মহম্মদ মোয়াজ্জেম বা (প্রথম বাহাদুর শাহ)
              - জাহান্দার শাহ
                - দ্বিতীয় আলমগীর
                  - দ্বিতীয় শাহআলম
                    - দ্বিতীয় আকবর শাহ
                      - দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
              - আজীমউস্‌শান
                - ফারুকশিয়ার
              - রফিউস্‌শান
                - মহম্মদ ইব্রাহিম
                - রফি-উদ্‌দৌলা
                - রফি-উদ্‌-দারাজাত
              - জাহান শাহ
                - মহম্মদ শাহ
                  - আহম্মদ শাহ
            - প্রথম শাহ আলম
            - আজম
            - আকবর
              - নেকুশিয়ার
            - কামবক্স
          - মুরাদ
        - শাহ্‌রিয়ার
      - মুরাদ
      - দানিয়াল
    - মির্জা হাকিম
  - কামরান
  - হিন্দাল
  - আসকারী

মারাঠা বংশ

- জিজাবাঈ = শাহজী = তুকাবাঈ
  - সইবাঈ = শিবাজী = সয়রাবাঈ
    - প্রথম শম্ভুজী (সইবাঈ)
      - শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী
        - রামরাজা (দত্তক)
          - দ্বিতীয় শাহু (দত্তক)
            - প্রতাপ সিং
            - শাহজী রাজা
    - তারাবাঈ = রাজারাম = রাজসবাঈ (সয়রাবাঈ)
      - তৃতীয় শিবাজী (তারাবাঈ)
        - রামরাজা (শাহুর দত্তক পুত্র)
      - দ্বিতীয় শম্ভুজী (কোলাপুর) (রাজসবাঈ)
        - চতুর্থ শিবাজী

পেশোয়ার বংশ

- বালাজী বিশ্বনাথ
  - প্রথম বাজীরাও
    - বালাজী বাজীরাও
      - বিশ্বাস রাও
      - মাধব রাও
      - নারায়ণ রাও
        - মাধবরাও নারায়ণ
    - রঘুনাথ রাও (রাঘোবা)
      - অমৃত রাও
        - বিনায়ক রাও
      - দ্বিতীয় বাজীরাও
        - নানাসাহেব
      - চিম্‌নজী আপ্পা
  - চিম্‌নজী

গভর্নর ও গভর্নর-জেনারেল (ব্রিটিশ আমল)

(ক) বাংলার গভর্নর

রবার্ট ক্লাইভ	১৭৫৭-৬০
ভ্যান্সিটার্ট	১৭৬০-৬৫
রবার্ট ক্লাইভ (দ্বিতীয় বার)	১৭৬৫-৬৭
ভেরেল্‌স্ট্‌	১৭৬৭-৬৯
কার্টিয়ার	১৭৬৯-৭২
ওয়ারেন হেষ্টিস্‌	১৭৭২-৭৪

(খ) বাংলার গভর্নর-জেনারেল

(১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী)

ওয়ারেন হেষ্টিংস্	১৭৭৪-৮৫
সার জন ম্যাক্‌ফারসন্	১৭৮৫-৮৬
লর্ড কর্নওয়ালিশ	১৭৮৬-৯৩
স্যার জন শোর	১৭৯৩-৯৮
স্যার এ ক্লার্ক	১৭৯৮
লর্ড ওয়েলেসলী	১৭৯৮-১৮০৫
লর্ড কর্নওয়ালিস (দ্বিতীয় বার)	১৮০৫
স্যার জর্জ বার্লো	১৮০৫-০৭
আর্ল অব মিণ্টো (প্রথম)	১৮০৭-১৩
আর্ল অব ময়রা (মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্)	১৮১৩-২৩
জন অ্যাডাম	১৮২৩
লর্ড আমহার্স্ট	১৮২৩-২৮
উইলিয়ম বেইলী	১৮২৮ (মার্চ-জুলাই)
লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক	১৮২৮-৩৩

(গ) ভারতের গভর্নর-জেনারেল

(১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী)

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক	১৮৩৩-৩৫
স্যার চার্লস্ (লর্ড) মেট্‌কাফ	১৮৩৫-৩৬
লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড	১৮৩৫-৪২
লর্ড এলেনবরা	১৮৪২-৪৪
উইলিয়াম উইলবারফোর্স বার্ড	১৮৪৪ জুন
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪-৪৮
লর্ড ডালহৌসি	১৮৪৮-৫৫
লর্ড ক্যানিং	১৮৫৬-৫৮

অনুশীলনী

[প্রাচীন যুগ]

প্রথম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ (ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) ভারতের রাজ্যসংখ্যা কত ? (খ) ভারতীয় উপমহাদেশে কয়টি রাষ্ট্র অবস্থিত এবং কি কি ? (গ) হর্ষবর্ধনের অপর উপাধি কি ? (ঘ) দাক্ষিণাত্যের কোন নরপতি নিজেকে 'দক্ষিণাপথপতি' রূপে দাবী করিয়াছিলেন ? (ঙ) আন্দামানের জারোয়া নরগোষ্ঠী কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ? (চ) 'মঙ্গোলয়েড' জাতিগোষ্ঠী বলিতে কাদের বুঝায় ? (ছ) ভারতের প্রধান উপজীবিকার নাম কি ? (জ) হিমালয়ের যে কোন দুইটি গিরিপথের নাম কর ? (ঝ) আনুমানিক কত বৎসর পূর্বে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ? (ঞ) সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের কাহিনী কে কোথায় খোদাই করিয়াছিলেন ? (ট) 'পতঞ্জলীর' রচিত কাব্যের নাম কি ? (ঠ) কৌটিল্যের রচিত পুস্তকের নাম কি ? (ড) 'হর্ষচরিত' কাহার রচনা ? (ঢ) বিহ্লনের একটি কাব্যের নাম কর। (ণ) কোন গ্রীক ঐতিহাসিক পারসিকগণের ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশ বিজয়ের বর্ণনা দিয়াছেন ? (ত) মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীকদূতের নাম কি ? (থ) 'ইণ্ডিকা' কাব্যের রচয়িতা কে ? (দ) ভারতে দুইজন চৈনিক পরিব্রাজকের নাম কর ? (ধ) 'একরাট' রাজচক্রবর্তী সম্রাট কাহাদের দেওয়া হইত ? (ন) অল্‌বিরুণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেন ?

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(i) তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালাম ভাষাভাষী লইয়া — নরগোষ্ঠী গঠিত। (ii) ভারতীয় আর্য ভাষাভাষী সমাজ — গোষ্ঠীভূক্ত। (iii) ভারতে আর্যদের আবির্ভাব খ্রীষ্টপূর্ব — অব্দে। (iv) উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যে জীবনে স্বাতন্ত্র বিধানের মূল কারণ — (v) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার —, —, — ও — প্রভৃতি দেশে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। (vi) এক কথায় ভারতকে বলা হয় — —। (vii) রাজস্থান ও কাশ্মীর — খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে চাষের প্রয়োজন ছিল। (viii) এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতার নাম —। (ix) কহ্লন, গৌড়বহ সন্ধাকরনন্দীর কাব্যগুলি যথাক্রমে — — ও —। (x) কোন এক অজ্ঞাতনামা নাবিকের — কাব্যখানি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার এক প্রয়োজনীয় উপকরণ। (xi) একজন উল্লেখযোগ্য আরবী লেখক হলেন —।

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

(ক) প্রাকৃতিক বিচারে ভারতকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও সেগুলি কি কি ? (খ) ভারতের মানুষের প্রধান নৃতাত্বিক উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা কর ? (গ) ভারতের ইতিহাসে হিমালয়ের প্রভাব আলোচনা কর ? (ঘ) ভারতের ইতিহাসে বিন্ধ্য পর্বত ও

সামুদ্রিক প্রভাব আলোচনা কর? (ঙ) ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক ঐক্য বলিতে কি বুঝায়? (চ) ইতিহাস রচনায় মুদ্রার অবদান কি?

(ছ) **টীকা লিখ :** (i) বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ। (ii) বৈদেশিক আক্রমণ। (iii) ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র। (iv) সাংস্কৃতিক ঐক্য। (v) বিভিন্ন লিপি ও তাম্রশাসন। (iv) ধর্মীয় ও অন্যান্য সাহিত্য ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান।

৩। রচনাত্মক প্রশ্নাবলী : [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) ভারতীয় ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব কতখানি তা পর্যালোচনা কর।

(খ) 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' একমাত্র ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী : (ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) প্রস্তরযুগ কয়ভাগে বিভক্ত ও কি কি? (খ) কে কত খ্রীষ্টাব্দে হরপ্পার উপনিবেশ আবিষ্কার করেন? (গ) মহেঞ্জোদড়ো উপনিবেশ কে কোথায় আবিষ্কার করেন? (ঘ) হরপ্পা সংস্কৃতির অন্যান্য কেন্দ্রগুলির নাম কর?

২। টীকা লিখ : (i) পুরা প্রস্তর যুগ। (ii) মধ্য প্রস্তর যুগ। (iii) নব্য প্রস্তর যুগ। (iv) তাম্র যুগ (v) সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি। (vi) সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসী। (vii) অন্যান্য সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার সম্পর্ক।

৩। রচনাত্মক প্রশ্নাবলী : [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) মহেঞ্জোদড়োর নগর সভ্যতা ও সমাজ-জীবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(খ) সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় ও অর্থ নৈতিক জীবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

১। বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী : (ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) সিন্ধু সভ্যতার পরে কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? (খ) আর্যগন কোন ভাষায় কথা বলতেন? (গ) আনুমানিক কোন সময়ে আর্যগণ ভারতে বসতি স্থাপন করেছিলেন? (ঘ) আর্যগণ ভারতে কোন স্থানে বসতি স্থাপন করেন? (ঙ) আর্যগণের প্রথম শ্রুতি সাহিত্যের নাম কি? (চ) ঋগ্বেদে ইন্দ্রের অপর নাম কি ছিল? (ছ) বৈদিক সাহিত্যের প্রধান ভাগগুলি কি কি? (জ) বেদাঙ্গের কয়টি ভাগ ও কি কি? (ঝ) ষড়দর্শনের ছয়টি দর্শন কি কি? (ঞ) বৈদিক সাহিত্যে পাঁচজন বিদূষী নারীর নাম কর। (ট) 'চতুরাশ্রম' কাকে বলে? (ঠ) বৈদিক সমাজে পরবর্তীকালে যে চারিটি ভাগ দেখা যায় তাদের নাম কর। (ড) বৈদিক সাহিত্যে চাল বা ধানের নাম কি? (চ) মহাভারত' আনুমানিক কোন সময়ে রচিত হয়েছিল? (ণ) কোন অঞ্চলে কোন সময়ে প্রথম লৌহের ব্যবহার দেখা যায়। (ত) বৈদিক সাহিত্যে লৌহের নাম কি? (থ) দক্ষিণ ভারতে প্রস্তর যুগের পরে কোন যুগ পরিলক্ষিত হয়?

(খ) **শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ**

(i) ইউরোপ রাশিয়ার উড়াল পর্বতমালার দক্ষিণে — অঞ্চল আর্যদের আদি বাসস্থান মনে করা হয়। (ii) এশিয়া মাইনরে — নামক স্থানে শিলালিপিতে ঋগ্বেদ বর্ণিত অনুরূপ দেবদেবীর উল্লেখ রয়েছে। (iii) আর্যদের প্রধান দুটি গোষ্ঠী — ও —। (iv) — এর মন্ত্রগুলি চার ভাগে বিভক্ত। (v) —, —, — ও — একত্রে 'চতুরাশ্রম' নামে পরিচিত। (vi) তাঁতবোনা ছিল — এর কাজ। (vii) —এর মধ্যেই জাতিভেদ প্রথার দার্শনিক ভিত্তি প্রোথিত। (viii) — ও — বংশ মিলে কুরু বংশ — হয়। (ix) হস্তিনাপুর বর্তমানে —জেলার অন্তর্ভুক্ত। (x) বর্তমানের বেরেলি বাদাউন ও ফরাক্কাবাদ নিয়ে বিস্তৃত ছিল — রাজ্য। (xi) বেদের অপর নাম —।

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

(ক) আর্য কাদের বলে? (খ) আর্যদের আদি বসতি সম্বন্ধে যা জান লেখ। (গ) বৈদিক সাহিত্যের প্রধান ভাগগুলি কি কি এবং প্রত্যেক অংশের বৈশিষ্ট্য লেখ। (ঘ) বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন কাকে বলে এবং এগুলি কি কি ভাগে বিভক্ত? (ঙ) আর্য সমাজে নারীর স্থান কিরূপ ছিল? (চ) টিকা লিখ ঃ (i) আর্য সমাজে বর্ণ বিভাগ। (ii) আর্থিক অবস্থা। (iii) প্রশাসনিক বিভাগ। (iv) ধর্মাচরণ ও দেবদেবী। (v) কর্মবাদ। (ছ) লৌহ যুগ কোন সময়ে শুরু হয়? ঐ সময়ে লৌহের কি কি ব্যবহার ছিল? (জ) ধাতুভিত্তিক যুগ বিভাগ করতে গেলে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে কি পার্থক্য দেখা যায়?

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (খ) বৈদিক ধর্ম এবং আর্যদের অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (গ) আর্য সভ্যতার রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও। (ঘ) আর্যদের সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় দাও। (ঙ) ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদিক সংস্কৃতি কিভাবে প্রসার লাভ করে লিখ।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১২]

(ক) আর্য সভ্যতা পরবর্তীকালে যে সকল পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় তার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

১। বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ (ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) ব্রাহ্মণদের বিরোধী ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত দুইজন ধর্ম প্রচারকের নাম কর। (খ) জৈন মতে কয়জন তীর্থঙ্কর জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন? (গ) ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্করের নাম কর। (ঘ) সর্বশেষ তীর্থঙ্করই বা কে? (ঙ) পার্শ্বনাথের চারিটি মূলনীতি কি ছিল? (চ) জৈনধর্মের দুইটি বিভাগ কি কি? (ছ) 'শ্বেতাম্বর' বিভাগের প্রবর্তক কে? (জ) অষ্টমার্গ কি এবং এর প্রবর্তক কে? (ঝ) বৌদ্ধধর্মোপদেশ কোন ভাষায়

রচিত হয় ? (ঞ) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম কি ? (ট) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের কয়টি ভাগ ও কি কি ? (ঠ) প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি কোথায় আহুত হয়েছিল ? (ড) দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ? (ঢ) তৃতীয় ও চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতিগুলিই বা কোথায় আহুত হয়েছিল ? (ণ) বৌদ্ধদের কয়টি ভাগ ও কি কি ? (ত) মহাবীরের পিতামাতার নাম কি ? (থ) মহাবীরের স্ত্রীর নাম কি ? (দ) গৌতমবুদ্ধ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? (ধ) লুম্বিনীর বর্তমান নাম কি এবং কোথায় অবস্থিত ?

(খ) **শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ**

(i) মহাবীর জৈনের অপর নাম —। (ii) গৌতম বুদ্ধের বাল্যকালের নাম —। (iii) বুদ্ধের মাতা — ও স্ত্রী —। (iv) রাজঐশ্বর্যের মায়া ছিন্ন করে সংসার ত্যাগ গৌতমের — নামে খ্যাত। (v) যে স্থানে গৌতম 'বোধি' লাভ করলেন তার নাম হল — ও যে বৃক্ষের তলায় বোধি লাভ করেন তার নাম হল —। (vi) — বৎসর বয়সে গৌতম বুদ্ধত্ব অর্জন করেন। (vii) সর্বপ্রথমে বুদ্ধ সারনাথের — ধর্ম প্রচার করেন। (viii)— জেলার — নগরে — বৎসর বয়সে বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

(ক) বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রতিবাদী আন্দোলনের সূত্রপাতে (i) সামাজিক কারণ ও (ii) অর্থ নৈতিক কারণ আলোচনা কর। (খ) জৈনদের ধর্মের মূলকথা কি ? (গ) বৌদ্ধদের ধর্মেরই বা মূলনীতি কি ? (ঘ) টিকা লিখ ঃ (i) শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর (ii) দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি (iii) মধ্যপন্থা (iv) হীনযান ও মহাযান।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রতিবাদী আন্দোলনের সূত্রপাতের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখাও। (খ) জৈন ধর্মমত ও বৌদ্ধ ধর্মমত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (গ) মহাবীরের জীবন ও বাণী লিখ। (ঘ) বুদ্ধের জীবন ও বাণী লিপিবদ্ধ কর।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১২]

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ (ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(১) কৌম প্রথা কাকে বলে ? (২) মহাজনপদ কাকে বলে ? (৩) ষোলটি মহাজন পদের নাম লিখ। (৪) পরবর্তীকালের চারটি মহাজনপদের নাম লিখ। (৫) কোন রাজার নেতৃত্বে কোশল রাজ্যের সীমা বর্ধিত হয় ? (৬) বৎস রাজ্যের রাজার নাম কি ? (৭) কাহার রাজত্বকাল থেকে অবন্তী রাজ্যের উত্থান শুরু হয় ? (৮) চতুঃশক্তির যুদ্ধে কে জয়ী বিবেচিত হয় ? (৯) বিম্বিসার কোন বংশের রাজা ছিলেন ? (১০) বিম্বিসারের পর কে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন ? (১১) হর্যঙ্ক বংশের শেষ নরপতির নাম কি ? (১২) শিশুনাগ কে ছিলেন ? (১৩) নন্দ বংশের প্রথম

নৃপতি কে ? (১৪) নন্দ বংশের শেষ নৃপতি কে ? (১৫) নন্দ বংশের পর মগধে কোন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার প্রতিষ্ঠাতা কে ? (১৬) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় মগধের রাজা কে ছিলেন ? (১৭) আলেকজাণ্ডারের বিশাল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের অধিপতি কে ছিলেন ? (১৮) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজধানী কোথায় ছিল ? (১৯) মৌর্য্য বংশের দ্বিতীয় সম্রাট কে ছিলেন ? (২০) মৌর্য্য বংশের তৃতীয় সম্রাট কে ছিলেন ? (২১) উক্ত সম্রাট কোন কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন ? (২২) অশোকের রাজত্বকালে কে কে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিংহল যান ? (২৩) মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর কোন রাজবংশ আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে ? (২৪) অ্যাকিমিনিদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (২৫) শেষ অ্যাকিমিনিদ রাজার নাম কি ? (২৬) আলেকজাণ্ডারের পিতার নাম কি এবং তিনি কোথাকার রাজা ছিলেন ? (২৭) কোন সময়ে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন ? (২৮) কোন বাহ্লীক রাজ পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ জয় করেন ? (২৯) মিনাণ্ডার কে ছিলেন ? (৩০) মিলিন্দ পঞ্হো কি ? (৩১) রুদ্রদাসন কে ছিলেন ? (৩২) কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতির নাম কি ? (৩৩) কুষাণ কাহারা ? (৩৪) কণিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ? (৩৫) কণিষ্ক কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন ? (৩৬) কোন কোন রত্ন তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ? (৩৭) সাতবাহন বলতে কাদের বুঝায় ? (৩৮) সাতবাহনের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন ? (৩৯) গৌতমী পুত্র শাতকর্নী কি কারণে বিখ্যাত ? (৪০) গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (৪১) কোন গুপ্ত সম্রাট মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন ? (৪২) হরিষেণ রচিত 'রাজপ্রশস্তি' কোন রাজার সম্বন্ধে লেখা ? (৪৩) কোন গুপ্ত সম্রাট সর্বরাজচ্ছেত্তা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (৪৪) কোন গুপ্ত সম্রাট 'শকারি বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন ? (৪৫) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কোন গুপ্ত পরিব্রাজক ভারত পরিক্রমায় আসেন ? (৪৬) কোন গুপ্ত সম্রাটের সময়ে মধ্য এশিয়ায় দুর্ধর্ষ হুণ আক্রমণ হয় ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

(ক) রাজতন্ত্রের উদ্ভব কিভাবে হয় ? (খ) ষোড়শ মহাজন পদগুলি কি কি ? (গ) বৈবাহিক সূত্রের সাহায্যে কিভাবে বিম্বিসার মগধের শক্তি বৃদ্ধি করেন ? (ঘ) অজাতশত্রুর দিগ্বীজয় বর্ণনা কর। (ঙ) কিভাবে বিম্বিসার দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেন ? (চ) শিশুনাগের উত্থান ও পতন বর্ণনা কর। (ছ) মহাপদ্মনন্দের দিগ্বীজয় বর্ণনা কর। (জ) মৌর্য্য সাম্রাজ্যের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর। (ঝ) সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের দ্বন্দ্বের পরিচয় দাও। (ঞ) চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (ট) অশোকের জীবনে কলিঙ্গ বিজয়ে কি প্রভাব পড়েছিল ? (ঠ) অশোকের ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (ড) অশোকের জনহিতকর কার্যাবলীর পরিচয় দাও। (ঢ) মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনে অশোক কতখানি দায়ী ? (ণ) আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফলাফল কি কি ? (ত) টীকা লিখ ঃ (i) বহ্লীক দেশীয় গ্রীক, (ii) শক, (iii) পহ্লব, (iv) মৌর্য্য শিল্প, (v) প্রথম কদফিস

(vi) কৌটিল্য। (থ) গৌতমীপুত্র শাতকর্ণীর দিগ্বীজয় সম্বন্ধে লেখ। (দ) গুপ্তবংশের উত্থান কি ভাবে হয়? (ধ) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? (ন) সমুদ্রগুপ্তের উত্তর ভারত বিজয় সম্বন্ধে যা জান লেখ। (প) শকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিজয়াভিযান বর্ণনা কর। (ফ) হূনদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের প্রতিরোধ বর্ণনা কর।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) মগধের উত্থান ও শক্তিবৃদ্ধির সম্বন্ধে বিম্বিসার ও অজাশত্রুর অবদান বর্ণনা কর। (খ) নন্দ বংশের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের দিগ্বীজয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর। (ঘ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জান লেখ। (ঙ) ইতিহাসে যে হাজার হাজার রাজার নাম আছে তাদের মধ্যে 'অশোক' একটি একক নাম নক্ষত্রের ন্যায় জাজ্বল্যমান—ব্যাখ্যা কর। (চ) অশোকের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে যা জান লেখ। (ছ) মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি কি কি আলোচনা কর। (জ) আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ও তার ফলাফল বিচার কর। (ঝ) বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায় তাহা বর্ণনা কর। (ঞ) 'কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কণিষ্ক' যুক্তি সহকারে এই উক্তির যথাথ্য বিচার কর। (ট) ভারত ইতিহাসে কুষাণ যুগের গুরুত্ব আলোচনা কর। (ঠ) গৌতমীপুত্র শাতকর্ণীর দিগ্বীজয় ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (ড) সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে যা জান লিখ। (ঢ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শকদমন সম্বন্ধে যা জান লেখ। (ণ) ফাহিয়েনের বর্ণনা থেকে গুপ্তযুগের সমাজ ধর্ম ইত্যাদি কি জানা যায়? (ত) গুপ্তযুগকে স্নুবর্ণযুগ বলা হয় কেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ** (ক) **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(১) চালুক্যগণের রাজধানী কোথায় ছিল? তার বর্তমান নাম কি? (২) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবির নাম কি? (৩) কোন লিপি থেকে দ্বিতীয় পুলকেশী সম্বন্ধে জানা যায়? (৪) কৃষ্ণা গোদাবরীর মধ্যবর্তী অংশ কি নামে পরিচিত ছিল? (৫) কোন পহ্লব রাজার উপাধি ছিল 'বাতাপী-কোণ্ড'। (৬) দু'জন রাষ্ট্রকূট রাজার নাম কর। (৭) ত্রিশক্তি সংগ্রামে অন্যতম রাষ্ট্রকূট রাজ্যের নাম কর। (৮) রাষ্ট্রকূটদের একজন দিগ্বিজয়ী রাজার নাম কর। (৯) ত্রিশক্তি সংগ্রামে রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের প্রতিপক্ষ কে কে ছিলেন? (১০) তৃতীয় গোবিন্দ কি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন? (১১) রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সময় মহীশূরের রাজা কে ছিলেন? (১২) কল্যাণীর চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (১৩) চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? (১৪) কহ্লন রচিত একটি কাব্যের নাম কর। (১৫) পহ্লবগণ কোন জাতির বংশধর। (১৬) পহ্লবদের আদি রাজার নাম কি? (১৭) পহ্লব-

বংশের কোন রাজা সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন? (১৮) 'মহাপহ্লব' শব্দটি কোন নৃপতির সৃষ্টি? (১৯) পহ্লব বংশের দুইজন উল্লেখযোগ্য নরপতির নাম কি? (২০) কোন চোলরাজ 'মহান' বিশেষণে ভূষিত হন? (২১) তাঞ্জোরের শিবমন্দির কার কীর্তি? (২২) প্রথম রাজেন্দ্রচোল কি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন? (২৩) তাঁর রাজধানীর নাম কি? (২৪) কোন চোল রাজা শৈলেন্দ্র রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। (২৫) দু'জন হুননেতার নাম কর যারা ভারতে এসেছিলেন? (২৬) কোন সামন্তপ্রভু মিহিরকুলকে পর্যুদস্ত করেন? (২৭) শশাঙ্ক কে ছিলেন? (২৮) হর্ষবর্ধন কোন বংশের রাজা ছিলেন? (২৯) ত্রিশক্তির সংগ্রামে ত্রিশক্তি কে কে? (৩০) পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? (৩১) কোন পাল রাজার দরবারে সুবর্ণদ্বীপ অধিপতি শৈলেন্দ্র বংশীয় বালপুত্রদেব দূত পাঠিয়েছিলেন? (৩২) সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (৩৩) সেনবংশের শেষ রাজা কে?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

(ক) **টীকা লেখ ঃ**

(i) দ্বিতীয় পুলকেশী (ii) তৃতীয় গোবিন্দের দিগ্বীজয় (iii) তৃতীয় কৃষ্ণ (iv) ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (v) সিংহ বিষ্ণু (vi) প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (vii) নরসিংহবর্মন (viii) রাজ-রাজা চোলের দিগ্বীজয় (ix) প্রথম রাজেন্দ্র চোলের নৌ-অভিযান। (খ) ত্রিশক্তি সংগ্রামে তিনটি শক্তি কি কি? (গ) টীকা লেখ ঃ (i) প্রথম নাগভট্ট (ii) বৎসরাজ (iii) দ্বিতীয় নাগভট্ট (iv) ভোজ (v) মাৎস্যন্যায় (vi) গোপাল (vii) দেবপাল (iv) প্রথম মহীপাল (x) রামপাল (vi) তোরমান (xii) মিহিরকুল (xiii) যশোধর্মন (xiv) শশাঙ্ক (xv) হিউয়েন সাঙ (xvi) বাণভট্ট (xvii) ত্রিশক্তি সংগ্রাম।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (খ) তৃতীয় গোবিন্দ ও তৃতীয় কৃষ্ণের নেতৃত্বে রাষ্ট্রকূটের উত্থান বর্ণনা কর। (গ) কাঞ্চীর পহ্লবগণের উত্থান ও পতন বর্ণনা কর। (ঘ) তাঞ্জোরের চোলগনের উত্থান ও পতন বর্ণনা কর। (ঘ) প্রথম রাজরাজার কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (চ) প্রথম রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয় ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (ছ) গৌড়রাজ শশাঙ্কের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (জ) হর্ষবর্ধনের দিগ্বিজয় ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (ঝ) গুর্জর প্রতিহার বংশের উত্থান ও পতন বর্ণনা কর। (ঞ) ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্ব সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (ট) পাল বংশের উত্থান ও পতন বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ (ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) পাল ও সেন যুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম কর। (খ) দান সাগর ও অদ্ভুত সাগর কার লেখা? (গ) রামচরিত কার রচনা? (ঘ) অতীশ দীপঙ্কর ও শীলভদ্র কে ছিলেন? (ঙ) গীত গোবিন্দ কার রচনা? (চ) অজন্তাও এলিফ্যাণ্ট চিত্র ও ভাস্কর্য কোন

রাজবংশের সাংস্কৃতিক স্বাক্ষর বহন করছে ? (ছ) রাজশেখর কে ছিলেন ? (জ) রাষ্ট্রকূট গণের রাজসার শ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন ? (ছ) কিরাত সাগর হ্রদ কে নির্মাণ করিয়াছিলেন ? (ঞ) চান্দেল্লরাজাদের সংস্কৃতির স্বাক্ষর কোথায় দেখা যায় ? (ট) কোণারকের সূর্যামন্দির কার কীর্তি ? (ঠ) পহ্লব আমলে একটি বিখ্যাত ধ্রুপদী সাহিত্যের নাম কর। (ড) চোল রাজত্বকালে ছুটি বিখ্যাত সাহিত্যের নাম কর। (ঢ) চীনা ভাষায় 'বিজয়পিটক' কে অনুবাদ করেন ? (ণ) কোন চীন সম্রাটের রাজত্বকালে দুজন বৌদ্ধ পণ্ডিত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য চীনদেশে যান ? (ত) বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নাম কি ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

(ক) পাল ও সেনযুগে বাঙ্গালীর চরিত্র কি ছিল ? (খ) চালুক্যদের অর্থনীতি কি রকম ছিল ? (গ) রাষ্ট্রকূটগণের সংস্কৃতি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(ঘ) টীকা লেখ : (i) গঙ্গারাজগণের সংস্কৃতি (ii) পহ্লবদের অর্থনীতি (iii) চোলদের শাসন ব্যবস্থা (iv) সিংহলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ।

মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) সুলতান কাদের বলা হত ? (খ) বাদশাহ কাদের বলা হত ? (গ) মুসলমানগণ কত বৎসর ভারতে রাজত্ব করেন ? (ঘ) ইউরোপের সামন্ত প্রথার দুটি বৈশিষ্ট্য কি কি ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

(ক) ভারতের ইতিহাস মুসলিম সভ্যতার অবদান কতখানি আলোচনা কর।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) ভারতের এই পর্বের ইতিহাসকে 'মুসলিম ভারত' না বলে 'মধ্যযুগীয় ভারত' বলা হয় কেন ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কত সালে হয় ? (খ) মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান কি কি ? (গ) ত্বকাত-ই-নাসিরী কার লেখা ? (ঘ) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী কার লেখা ? (ঙ) মধ্যযুগের দুইজন ঐতিহাসিকের নাম কর। (চ) আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরীর রচয়িতা কে ? (ছ) (Annals and Antiquities of Rajasthan) 'রাজস্থানের ইতিহাস' কার লেখা ? (জ) মধ্যযুগের দুইটি বিখ্যাত আইন সংক্রান্ত গ্রন্থের নাম কর। (ঝ) অলবীরুণীর রচিত গ্রন্থের নাম কি ? (ঞ) আরবীয়গণের সিন্ধু বিজয় সম্বন্ধে একটি গ্রন্থের নাম কর। (ট) কয়েকজন বিদেশী পর্যটকের নাম কর।

(ঠ) টীকা লেখ :

মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান যথা—(i) সরকারী দলিলপত্র (ii) ফরাসী ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থ (iii) মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন (iv) বৈদেশিক বিবরণ।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) 'মধ্য যুগের' ইতিহাসের উপাদান সম্বন্ধে যা জান লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) আরবগণ কত সালে সিন্ধুদেশ জয় করে? (খ) আরবদের সর্বপ্রথম অভিযান প্রেরিত হয় কোথায় এবং কত খ্রীষ্টাব্দে? (গ) দাহির কে ছিলেন? (ঘ) কার নেতৃত্বে সিন্ধুদেশ আরবদের পক্ষে জয় করা সম্ভব হয়েছিল?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

(ক) আরবরা সিন্ধুদেশ জয় কি ভাবে করে? (খ) আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয় রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—এর সত্যতা বিচার কর। (গ) সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই সিন্ধুদেশ বিজয়ের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) আরবদের সিন্ধুদেশ জয় ও তার গুরুত্ব আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) কত খ্রীষ্টাব্দে মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন? (খ) কোন মুসলমান নৃপতি কত খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন? (গ) মামুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন? (ঘ) অলবীরুনীর প্রকৃত নাম কি? (ঙ) অলবীরুনী রচিত গ্রন্থখানির নাম কর।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

(ক) টীকা লেখ : (i) অলবীরুনী (ii) সুলতান মামুদ।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) মুসলিম অভিযানের পূর্বে ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাংশের অবস্থা কেমন ছিল বর্ণনা কর। (খ) সুলতান মামুদের ভারত অভিযান ও তার ফলাফল বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(১) সুলতান মামুদের মৃত্যু কত খ্রীষ্টাব্দে হয়? (২) মহম্মদ ঘোরীর প্রকৃত নাম কি? (৩) কত খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী মুলতান অধিকার করেন? (৪) কোন ভারতীয় রাজা কর্তৃক মহম্মদ ঘোরী পরাজিত হন। (৫) মহম্মদ ঘোরী কোথায় পৃথ্বিরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। (৬) মহম্মদ ঘোরীর সময় বিহার ও বাংলার শাসনকর্তা কে ছিলেন? (৭) কে তাকে পরাজিত করেন? (৮) কুতবউদ্দিন কোন কোন সালে গুজরাট ও কালিঞ্জর দখল করেন? (৯) মহম্মদ ঘোরী কত সালে নিহত হন? (১০) তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? (১১) দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (১২) এই বংশের নাম 'দাস বংশ' হল কেন? (১৩) ভারতের প্রথম সুলতান কে?

(১৪) কত সালে কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়? (১৫) তাঁর পুত্রের নাম কি? (১৬) ইলতুৎমিস কে ছিলেন? (১৭) তাঁর সময় সিন্ধু দেশ ও বাংলার শাসনকর্তা কে ছিলেন? (১৮) কুতবমিনার নির্মানকার্য কে করেছিলেন? (১৯) কার রাজত্বকালে চেঙ্গিজ খাঁ ভারতে আসেন? (২০) কত সালে কে ইলতুৎমিসকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন? (২১) কত সালে ইলতুৎমিসের মৃত্যু হয়? (২২) ইলতুৎমিসের পরে কে দিল্লীর সুলতান হন? (২৩) গিয়াসুদ্দীন বলবনের প্রকৃত নাম কি? (২৪) তাঁর সময়ে বাংলার শাসনকর্তা কে ছিলেন? (২৫) কোন সুলতানের আমলে মোঙ্গল আক্রমণ হয়?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

(ক) টীকা লিখ ঃ (i) তরাইনের যুদ্ধ (ii) চান্দোয়ারের যুদ্ধ (iii) দাস বংশের প্রতিষ্ঠা (iv) কুতবমিনার (v) চেঙ্গিজ খাঁর ভারত আক্রমণ (vi) সুলতানা রাজিয়া (vii) গিয়াসসুদ্দীন বলবন (viii) তুঘরিল খাঁয়ের বিদ্রোহ (ix) মোঙ্গল আক্রমণ।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) সুলতানী সাম্রাজ্যের ভিত্তি কিভাবে স্থাপিত হয়? (খ) সুলতানী সাম্রাজ্য সুসংহত করতে কুতবউদ্দীনের কৃতিত্ব আলোচনা কর। (গ) দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে? তার কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (ঘ) গিয়াসউদ্দীন বলবনের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (ঙ) সুলতানী সাম্রাজ্যের সাথে সাথে যে সকল বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ বিপদ দেখা যায় তাহা বর্ণনা কর। সেগুলির প্রতিকার কিভাবে হয় আলোচনা কর। (চ) সুলতানী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনে দাস বংশের অবদান কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ (ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) খলজী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (খ) খলজী সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে? (গ) মালিক কাফুর কে ছিলেন? (ঘ) গুজরাটের রাণী-ই বা কে ছিলেন? (ঙ) নব মুসলমান কারা? (চ) আকবর কত সালে চিতোর আক্রমণ করেন। (ছ) এই সময়ে দেবগিরির রাজা কে ছিলেন? (জ) দোরসমুদ্রের রাজাই বা কে ছিলেন?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ**

(ক) টীকা লেখ ঃ—(i) রাণী কমলা দেবী (ii) মালিক কাফুর (iii) নব মুসলমান (iv) চিতোর জয় (v) দাক্ষিণাত্য বিজয়। (খ) আলাউদ্দীন কিভাবে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করেন? (গ) তিনি কৃষির কি সংস্কার করেছিলেন?

৩। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) আলাউদ্দিনের দিগ্বিজয় বর্ণনা কর। (খ) তিনি কিভাবে কেন্দ্রীয় শাসন সুসংহত করেন? (গ) তাঁর অর্থ নৈতিক সংস্কার ও তার ফলাফল আলোচনা কর। (ঘ) আলাউদ্দিনের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

১। বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী : [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (খ) তাঁহার পরের সুলতানের নাম কি ? (গ) মহম্মদ বিন তুঘলকের প্রকৃত নাম কি ? (ঘ) তিনি কোথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ? (ঙ) ঐ সময়ে ভারতে একজন বৈদেশিক পর্যটকের নাম কর। (চ) তাঁর পরের সুলতানের নাম কি ? (ছ) তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী : [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

টীকা লিখ :

(i) মহম্মদ বিন তুঘলকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (ii) রাজধানী স্থানান্তর (iii) মুদ্রা সংস্কার (iv) আরাকান বিজয়ের কল্পনা (v) ফিরোজশাহের রাজ্যজয় (vi) তাঁর শাসন সংস্কার।

৩। রচনাত্মক প্রশ্নাবলী : [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিচয় ভাগ্যহীন আদর্শবাদী হিসাবে তাঁর কার্যাবলীর বর্ণনা দিয়া এই উক্তির যথার্থ বিচার কর। (খ) ফিরোজ শাহ তুঘলকের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

১। বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) কত সালে তৈমুরলঙ ভারত আক্রমণ করেন ? (খ) তিনি কোন বংশের লোক ছিলেন ? (গ) তিনি 'লঙ' নামে খ্যাত ছিলেন কেন ? (ঘ) সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ঙ) তাঁর বংশের নাম সৈয়দ বংশ হয় কেন ? (চ) লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ছ) তাঁর পরের সুলতানের নাম কি ? (জ) কার সময়ে কে বাবরকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ করেন ? (ঝ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত সালে কার কার মধ্যে হয়েছিল ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী : [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

টীকা লেখ—(i) তৈমুরের রাজ্যজয় (ii) সৈয়দ বংশ (iii) লোদী বংশ।

৩। রচনাত্মক প্রশ্নাবলী : (ক) তৈমুরের ভারত আক্রমণ ও তার ফলাফল বর্ণনা কর। (খ) সুলতানী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন কিভাবে হয় লেখ। [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

নবম অধ্যায়

১। বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী : (ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(ক) বাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (খ) তাঁর পরে কে সুলতান হন ? (গ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান সুলতান কে ছিলেন ? (ঘ) তৎকালীন শিরাজের মহাকবির নাম কর। (ঙ) কার রাজত্বকালে কোন কবি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেন ? (চ) হুসেন শাহ কে ছিলেন ? (ছ) বাংলার কোন সুলতানের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয় ? (জ) তার পরের সুলতান কে ছিলেন ? (ঝ) পাণ্ডু ও গৌড় কার আমলে তৈরি হয় ? (ঞ) মালাধর বসুকে ফারুক শাহ কি উপাধিতে ভূষিত করেন ? (ট) তার পুত্রই বা কি উপাধিতে ভূষিত হন ? (ঠ) পদ্ম পুরাণ কার লেখা ? (ড) ছোট সোনা মসজিদ কার আমলে তৈরি হয় ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :**

টীকা লেখ : (i) ইলিয়াস শাহের রাজ্যজয় (ii) সিকন্দার শাহ (iii) গিয়াসুদ্দীন আলম শাহ (iv) বড় সোনা মসজিদ।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৯]

(ক) ইলিয়াস শাহের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (খ) শাসক হিসাবে হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (গ) হুসেনশাহ ও নসরৎ শাহের আমলে শিল্প সংস্কৃতির যে উন্নতি ঘটেছিল তার বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী :** (i) ভারতে সমাজ জীবনে ইসলামের প্রভাব কি ছিল ? (ii) তৎকালীন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (iii) ভক্তি আন্দোলন কি ? এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল—এর প্রধান প্রবক্তা কারা ছিলেন ? (iv) সুফীবাদ কি ? (v) সুফী কাদের বলা হত। (vi) তাদের ধর্মমত কি ছিল। (vii) সুলতানী আমলের শিল্প-সাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাস বিবৃত কর। (viii) সুলতানী যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও। (ix) সুলতানী যুগে প্রাদেশিক ভাষা এবং সাহিত্যের অগ্রগতি কিরূপ হইয়াছিল। (x) উর্দু ভাষার বিকাশে সুলতানী আমলের অবদান ও পৃষ্ঠপোষকতা বর্ণনা কর। (xi) হুসেনশাহ ও নসরতশাহের রাজত্বকালে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা কর।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :** (i) ভক্তিবাদী বা সুফীবাদীদের ধর্ম কিরূপ ছিল ? (ii) হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতাদের মতবাদ কি ? (iii) ভারতের সুফী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি ? (iv) ভক্তিবাদের মূল কথা কি ? (v) 'মধ্যযুগের ধর্মসংস্কারক ও প্রচারকগণের মধ্যে নানকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেন ?

৩। **সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :** কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ, মাধবাচার্য, বিশ্বেশ্বর কুল্লক, রামানন্দ, আমির খসরু, শৈবনয়নারগণ, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, নাসিরউদ্দীন চিরাগ-ই-দিল্লী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, বল্লভাচার্য, সত্যপীর।

[মুঘল যুগ]

প্রথম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী :** (i) সুলতানী ভারত ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর। (ii) সরকারী দলিলপত্র হইতে মুঘল যুগে ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি কিরূপে সংগ্রহ করা যায় ? (iii) মুঘল যুগের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সত্যাসত্য নির্ধারণে মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন ভূমিকা কতখানি ? (iv) মুঘলযুগের ইতিহাসের উপকরণরূপে বৈদেশিকদের বিবরণের ভূমিকা আলোচনা কর।

২। **টীকা লিখ :** আকবরনামা, আইন-ই-আকবরী, কাঁফিখাঁ, গুলবদন, র‍্যাল ফিচ, স্যার টমাস রো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ** (i) মুঘলদের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল ? (ii) ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন কে এবং কিরূপে করেন ? (iii) বাবরের স্মৃতিকথা সম্বন্ধে কি জান ? (iv) মুঘল আফগান প্রতিদ্বন্দ্বীতা কোন খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল এবং কেন হইয়াছিল ? (v) হুমায়ুন ও শেরশাহের প্রতিদ্বন্দ্বীতা সংক্ষেপে আলোচনা কর। (vi) শেরশাহের শাসনব্যবস্থা কি মৌলিক ছিল বলিয়া কি তুমি মনে কর ? (vii) শাসক হিসাবে মুঘল ইতিহাসে আকবরের স্থান নির্ণয় কর ? (viii) আকবরকে 'জাতীয় সম্রাট' আখ্যায় ভূষিত করা যাইবে কি ? (ix) আকবরের শাসন ব্যবস্থা আলোচনা কর। (x) শাহজাহানের শাসনকালকে মুঘল ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' কেন বলা হয় ? (xi) শাসক হিসাবে শাহজাহানের 'মূল্যায়ন' নিজভাষায় বিবৃত কর। (xii) শাহজাহানের শাসনকালে উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত যুগের বর্ণনা দাও। (xiii) মুঘলদের রাজপুতনীতি কি ছিল ? (xiv) ঔরঙ্গজীবের ধর্মীয় নীতি আলোচনা কর ? এর ফল কি হইয়াছিল ? (xv) মারাঠাদের উত্থানের কারণ কি কি ছিল। (xvi) শিবাজীর শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (xvii) সম্রাটের বেশে দরবেশ—একথা কাহার সম্বন্ধে বলা হয়। (xviii) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণরূপে ঔরঙ্গজীবের ভূমিকা কতখানি দায়ী ? (xix) মুঘলযুগে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা আলোচনা কর।

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩]

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ**

(i) মোঙ্গল জাতীর আদি বাসস্থান কোথায় ছিল এবং তাদের নেতা কে ছিল। (ii) পাণিপথের প্রথমযুদ্ধ বর্ণনা কর। (iii) খানুয়া এবং গোগরা যুদ্ধ আলোচনা কর। (iv) কবুলিয়ত ও পাট্টা কি, কে প্রবর্তন করেন। (v) যাতায়াতের সুবিধার জন্য শেরশাহের অবদান কি ? (vi) ডাকচৌকী কি ? তার কাজ কি ? (vii) বাবরের আত্মজীবনীর নাম কি ? চৌসার যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে সংগঠিত হইয়াছিল। (viii) দিন-ই-ইলাহি কি, কে প্রবর্তন করেন। (ix) মনসবদারী প্রথা কি ইহার গুরুত্ব কতখানি ছিল। (x) বাণিয়ের ও তাভার্নিয়ের কে ছিলেন ?

৩। **টীকা লেখ ঃ** পরগণা, শিকন্দার-ই-সিকন্দারান, পদ্মাবত, বৈরাম খাঁ, হলদিঘাটের যুদ্ধ, আবুল ফজল, বদাউনী, আইন-ই-আকবরী রামচরিত মানস, ইবাদৎখানা, মুঘল, মিনিয়েচার, নূরজাহান, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই আম, তাজমহল, শায়েস্তা খাঁ।

তৃতীয় অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ** [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

(i) রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা বলিতে কি বোঝ ? (ii) ঔরঙ্গজীবের আমলে মনসবদারী প্রথা কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ? (iii) জায়গীরদার কাহাদের বলা হয় ? (iv) টোডরমল কে ছিলেন ? (v) মুঘল যুগে ধর্ম ও সমাজজীবন বলিতে কি বোঝ ? (vi) মুঘলযুগে অর্থ নৈতিক অবস্থা বিবৃত কর ? (vii) ঢাকার মস্‌লীন কি জন্য

বিখ্যাত ? (viii) মুঘল সাম্রাজ্যে অভিজাত বলিতে কাদের বোঝায় ? (ix) অভিজাতদের মধ্যে কি জন্য নানা গোষ্ঠীচক্রের উদ্ভব ঘটেছিল ? (x) মুঘল সাম্রাজ্য পতনে জায়গীরদারী সংকটের ভূমিকা কি ছিল ? (xi) "মুঘল মিনিয়েচার কাহার অবদান" ? (xii) শাহজাহানের শিল্পানুরাগী তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর ? (xiii) 'হুমায়ুননামা' কাহার লেখা ? (xiv) 'গ্রন্থসাহেব' কোন সময়ে রচনা হয়েছিল ? (xv) চণ্ডীমঙ্গল ও কাশীরামদাসের মহাভারত কোন যুগের রচনা ? (xvi) নুরজাহান কে ছিলেন ? (xvii) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাহার কতটা রাজনৈতিক প্রভাব ছিল ? (xviii) মুঘল স্থাপত্যের বিকাশে আকবরের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর ? (xix) বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় মুঘল যুগে সমাজ ও অর্থনীতির কি পরিচয় পাওয়া যায় ? (xx) শাহজাহানের রাজত্বকালে কোন ফরাসী বণিক ও ফরাসী চিকিৎসক ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ** (ক) 'ইবাদৎ খানা' কে, কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন ? (খ) মুঘল সাম্রাজ্যে জরিপ করা সংক্রান্ত ব্যাপার কাহার উপর ন্যস্ত ছিল ? (গ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সাধারণ শ্রেণী কাহাদের বলা হইত ? (ঘ) আগ্রার দুর্গ কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ? (ঙ) স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা বা মোহর কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ? (চ) বুলন্দ্‌দরওয়াজা কি উপলক্ষ্যে নির্মিত হইয়াছিল ? (ছ) যোধাবাঈ মহল কোথায় অবস্থিত ? (জ) ময়ূর সিংহাসন কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ?

২। **টীকা লেখ ঃ**

(i) পদ্মাবৎ (ii) গ্রন্থসাহেব (iii) উইলিয়ম হকিনস্‌ (iv) পেলসার্ট (v) পাহাড়ী রীতি (vi) রাজপুত চিত্র (vii) আকবরনামা (viii) বদাউনী (ix) আবদুল হামিদ লাহোরী (x) দারাশুকো (xi) ফতোয়া-ই-আলমগীর।

তৃতীয় খণ্ড

আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন ঃ** (ক) (i) ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর কে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন ? (ii) গুরুগোবিন্দ সিংহ-এর পরে কোন্‌ শিখ নেতা বিদ্রোহ পত্র ঘোষণা করেন ? (iii) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম কি ? (iv) জাহান্দার শাহকে হত্যা করিয়া কে সিংহাসন লাভ করেন ? (v) কাহার সহায়তায় মহম্মদ শাহ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ? (vi) হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি ? (vii) ওড়িশার যে নায়েব নাজিম বাংলার শাসন ক্ষমতা দান করেন তাহার নাম কি ? (vii) ১৭৩৯ খ্রীঃ কোন বৈদেশিক বীর ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর। (ii) হায়দরাবাদ সুবার

আঞ্চলিক স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর। (iii) নাদিরশাহের ভারত আক্রমণের ফলাফল লিপিবদ্ধ কর।

৩। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ও ভাঙ্গনের কারণসমূহ বিবৃত করিয়া সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর। (ii) ঔরংজীবের মৃত্যুর পরে সিংহাসনের দ্বন্দ্বে ও সাম্রাজ্য পরিচালনায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভূমিকা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ কর। (iii) নাদিরশাহের ভারত আক্রমণ ও তাহার ফলাফল বিবৃত কর।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের চিত্র আঞ্চলিক স্বাধীনতায় কিভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ** (i) আলিবর্দী খাঁর সময়ে বাংলাদেশ কাহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইল ? (ii) হায়দরাবাদ কাহার নেতৃত্বে মুঘল শাসন হইতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ? (iii) ১৭৬১ খ্রীঃ কে নাঞ্জারাজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া মহীশূর রাজ্যে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ? (iv) ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে কে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন ? (v) গ্রন্থসাহেব সঙ্কলন করেন কে ? (vi) শিখদের নবমগুরুর নাম কি ? (vii) মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দায়ী বিন পেশোয়ার নাম কি ? (viii) মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিস্তার কোন পেশোয়ার কালে ঘটে ? (ix) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয় ? (x) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের প্রতিপক্ষে কে ছিলেন ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) কর্ণাটের রাজনীতির জটিলতার পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা কর। (ii) গুরু অর্জুনের জীবনী ও কৃতিত্ব সংক্ষেপে লিখ। (iii) শিখ সামরিক শক্তির প্রতিষ্ঠাতারূপে গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনী ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (iv) কখন হইতে কিভাবে পেশোয়াতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা সংক্ষেপে লিখ। (v) 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' কি ? (vi) প্রথম বাজীরাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তারের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন কর। (vii) মারাঠারাজ্য প্রথম বাজীরাও এর আমলে কোন্ কোন্ শাখায় বিভক্ত হয় ? (viii) 'হিন্দু পদ পাদশাহী' আদর্শ বলিতে কি বুঝ ? কে তাহা কল্পনা করেন ও কে তাহা প্রায় রূপায়িত করিয়াছিলেন ? (ix) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কারণ অতি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) মুঘল শাসনের অবক্ষয় কালে দাক্ষিণাত্যে জটিলতা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও বাংলা কেমন করিয়া স্বাধীন অঞ্চল হিসাবে শান্তি ও সুখ ভোগ করিতে আসিয়াছিল ? (ii) ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে মহীশূরের ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তি কিভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার আনুপূর্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। (iii) উত্তর ভারতে স্ব-স্বাধীন অঞ্চল হিসাবে অযোধ্যার আত্মপ্রকাশের ইতিহাস বিবৃত করে। (iv) মারাঠা শক্তির সংগঠক হিসাবে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের ভূমিকা লিপিবদ্ধ কর। (v) প্রথম বাজীরাওকে 'শ্রেষ্ঠ গেরিলা বিশারদ বলিয়া অভিহিত করার যৌক্তিকতা বিচার কর। (vi) বালাজী বাজীরাও

মারাঠা সাম্রাজ্য চরম বিস্তার করিলেও তিনিই তাহার ধ্বংসের পথ উন্মোচন করিয়া যান 'উক্তিটির যথার্থ বিচার কর। (vii) প্রথম বাজীরাও এর আমলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের ক্ষমতা বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) শিখজাতির অভ্যুত্থান গোবিন্দ সিংহ এবং অর্জুনসিংহের ভূমিকা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া রণজিৎসিংহের পূর্ব পর্যন্ত পাঞ্জাবে শিখদের ইতিহাস লেখ। (ii) ভারতের ইতিহাসে ফলাফল সহ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ** (i) ইউরোপে নবজাগরণের পরে ভারত ও আমেরিকার পথ অধিকার করে যে মানব ইতিহাসের দুইটি বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উহা কে বলিয়াছিলেন? (ii) ইংরাজরা কখন উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতে আসিতে আরম্ভ করে? (iii) কবে পর্তুগাল প্রাচ্যদেশে ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার মানিয়া লয়? (iv) ওলন্দাজগণ খ্রীষ্টানদের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন? (v) ফরাসীরা কবে কোথায় প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিয়াছিল। (vi) বাংলার কে কবে কোথায় ফরাসীদের কুঠি স্থাপনের অধিকার দান করেন? (vii) কোথাকার সন্ধির সর্ত অনুসারে ওলন্দাজগণকে পণ্ডিচেরী ফরাসীদের ফেরৎ দিতে হইয়াছিল? (viii) ইংরাজগণ রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহের যৌতুকস্বরূপ কি লাভ করে? (ix) কত খ্রীষ্টাব্দে ফরাখসীয়ারের ফরমান প্রদত্ত হইয়াছিল? (x) প্রথম কর্ণাটের যুদ্ধের সময় কর্ণাটের নবাব কে ছিলেন? (xi) কোথাকার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের অবসান ঘটে?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) ভারতে বাণিজ্য বিস্তার সম্বন্ধে টীকা লিখ—(i) পর্তুগাল, (ii) ওলন্দাজ, (iii) স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধের ইতিহাস লিখ। (iv) কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর। (v) ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের বর্ণনা দিয়া ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া লিখ।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) ভারতে ফরাসী বাণিজ্যিক কোম্পানীর কার্যাবলীর বিবরণ লিখ। (ii) ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত ইউরোপের রাজনীতির সম্পর্ক বিচার কর। (iii) কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (iv) ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ লিপিবদ্ধ কর।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) ফরাখসীয়ারের ফর্মানের উল্লেখ করিয়া ভারতে ইরাজ কোম্পানীর কার্যাবলীর ইতিহাস লিখ। (ii) ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কর্ণাটকের যুদ্ধগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ** (i) কত খ্রীষ্টাব্দে বাংলার কাউন্সিল একজন প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রনাধীনে আনা হয়। (ii) কত খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু হয়? (iii) আলিনগর কাহার নাম? (iv) আলিনগরের সন্ধি কাহাদের মধ্যে ঘটে? (v) পলাশীর

যুদ্ধ কবে হইয়াছিল ? (vi) কোথাকার যুদ্ধে ওলন্দাজগণকে ক্লাইভ পরাজিত করেন? (viii) ইংরাজ কোম্পানী কবে দেওয়ানী লাভ করে ? (ix) বক্সারের যুদ্ধ কখন হয় ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :** (i) ফরাখশীয়ারের ফরমান বিষয়ে যাহা জান লিখ। (ii) আলিনগরের সন্ধির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর। (iii) ইংরাজদের সহিত মীরকাসিমের কি লইয়া সংঘর্ষ বাধে? (iv) বক্সারের যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** (i) আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজ কোম্পানীর অভ্যুত্থানের বিবরণ লিখ। (ii) আলিনগরের সন্ধি ও তাহার ফলাফল বিষয়ে যাহা জান বিবৃত কর। (iii) সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরাজ কোম্পানীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** (i) পলাশীর যুদ্ধ ও ভারতের ইতিহাসে তাহার তাৎপর্য বিবৃত কর। (ii) পলাশী হইতে বক্সার পর্যন্ত ভারতে ইংরাজ কোম্পানীর ক্ষমতাবৃদ্ধির পরিমাপ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী :** (i) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ কবে সংঘটিত হইয়াছিল ? (ii) সুরাটের সন্ধি কবে কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (iii) সলবাই -এর সন্ধি স্বাক্ষরের তারিখ কত ? (iv) অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতির প্রবক্তা কে ? (v) কোন মারাঠা নেতা প্রথমে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি গ্রহণ করেন ? (iv) দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি কিভাবে ঘটে ? (vii) সগৌলির সন্ধি কাহাদের মধ্যে কবে সংঘটিত হইয়াছিল ? (viii) প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান কোন সন্ধিতে ঘটে ? (ix) পাঞ্জাব মুঘলদের হস্তচ্যুত হইবার পর কাহার অধীনস্থ হয় ? (x) শিখদের মিশ্‌ল্ বলিতে কি বুঝায় ? (xi) রণজিৎসিংহের উপর কোন্ মিশ্‌লের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল ? (xii) অমৃতসরের সন্ধি কবে কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (xiii) কবে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যু হইয়াছিল ? (xiv) শিখজাতির যুদ্ধের আহ্বানের বিরুদ্ধে কে বলেন, প্রতিহিংসার তাহার প্রত্যুত্তর পাইবে ? (xv) ডালহৌসী কবে পাঞ্জাব অধিকার করেন ? (xvi) ডালহৌসীকে কি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে ? (xvii) কে বলিয়াছেন, 'অযোধ্যা জয় বৃটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে ?'

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :** (i) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। (ii) প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধকর। (iii) শাসক ও সেনাপতিরূপে হায়দর আলির কৃতিত্ব বর্ণনা কর। (iv) চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পরে ইংরাজসৈন্যের বর্বরতা বিষয়ে সেনাপতি আর্থার ওয়েলেসলী কি বলিয়াছিলেন ? (v) সংক্ষেপে ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের বিবরণ লিখ। (vi) কোম্পানীর সিন্ধুজয়ের বিবরণ দাও। (vii) সংক্ষেপে রণজিৎ সিংহের কৃতিত্ব বিচার কর। (viii) শিখ রাজ্যের বিলুপ্তির কাহিনী বিবৃত কর। (ix) ভারতে কি বৃটিশ শক্তি বিস্তারে ডালহৌসী কি কি নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (x) কুশাসন ও অন্যান্য অজুহাতে ডালহৌসী কিভাবে রাজ্য বিস্তার করেন ?

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**ঃ (i) কারণসহ প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ইতিহাস বিবৃত কর। (ii) প্রথম ও দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের মধ্যে ২০ বৎসরের তফাৎ ছিল। ইহার মধ্যে কোম্পানী কোন্ শত্রুর সহিত তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। (iii) দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের গতি ও পরিণতি বিবৃত কর। (iv) ইংরাজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে হায়দার আলির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বিবরণ দাও। (v) টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধের জন্য ওয়েলেসলীর প্রস্তুতির বিবরণ ও সেই যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর। (vi) ইঙ্গ-আফগান সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। (vii) রণজিৎ সিং-এর অভ্যুত্থান হইতে অমৃতসরসান্ধি-পর্যন্ত শিখদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর। (viii) স্বত্ব-বিলোপনীতি কাহাকে বলে ? ঐ নীতির বলে ডালহৌসী কোন্ কোন্ রাজ্য জয় করেন ? (ix) ডালহৌসীর রাজ্যবিস্তার নীতির ফলাফল বিচার কর।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**ঃ (i) মারাঠাদের পরাজয়ের কারণ বিবৃত কর। (ii) ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রসারে মহীশূর যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার মূল্যায়ন কর। (iii) স্বাধীনতা সংগ্রামী এক সুশাসক হিসাবে টিপুসুলতানের কৃতিত্ব বিচার কর। (iv) ইংরাজ কোম্পানীর ব্রহ্মবিজয় সম্পর্কে একটি আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (v) রণজিৎ সিং-এর শাসন কৃতিত্ব বিচার কর। (vi) পাঞ্জাবের সংযুক্তিকরণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (v) ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে লর্ড ডালহৌসীর ভূমিকা বর্ণনা কর। (vi) অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি হইতে সার্বভৌমত্ব লাভ করার ইতিহাস বিবৃত কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী**ঃ (i) রেজা খাঁ এবং সিতাব রায় কে ? (ii) ''দ্বৈত শাসন বিশৃঙ্খলাকে আরও জটিল এবং দুর্নীতিকে আরও দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া তুলিল'' —কাহার উক্তি ? (iii) ইংলণ্ডের সরকার কোম্পানীর কার্য নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত সর্বপ্রথম কোন্ আইন প্রবর্তন করেন ? (iv) কে সর্বপ্রথম কোম্পানীর বাণিজ্যবিভাগ হইতে শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেন ? (v) ভারতের সর্বপ্রথম গভর্নর জেনারেল কে ? (vi) বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে কি ছিল ? (vii) কর্ণওয়ালিশের বিধিবদ্ধ আইন কানুনের সংকলনের নাম কি ? (viii) কলিকাতার শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব কাহার উপর ছিল ? (ix) দেওয়ানীলাভের ফলে কোন্ কোন্ দেশের রাজস্বের উপর কোম্পানীর অধিকার জন্মে ? (x) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রাজস্বের কত অংশ হিসাবে জমিদারের খাজনা ধার্য করা হইয়াছিল ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**ঃ (i) কোম্পানী দেওয়ানীলাভের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (ii) কোম্পানীর কেরানীদের দুর্নীতিপরায়ণ হইবার কারণ কি ? (iii) ইংরাজদের বিচার ব্যবস্থার নূতনত্বের দিকটি বুঝাইয়া দাও। (x) ভূমি রাজস্ব হইতে কোম্পানীর বর্ধিত আয়ের প্রয়োজনীয়তা হয় কেন ? (v) 'রায়তওয়ারী' ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**ঃ (i) হেস্টিংস-এর আমলে কেন্দ্রিকতা বৃদ্ধির স্বরূপ বর্ণনা কর। (ii) ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত থাকিলেও লর্ড হেস্টিংস আভ্যন্তরীন বিচার ব্যবস্থা সংস্কার কিভাবে করেন তাহা বিবৃত কর। (iii) 'আইনের

শাসন' বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। পূর্বের বিচার ব্যবস্থার সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় বুঝাইয়া দাও। (iv) মহালওয়ারী ব্যবস্থা ভারতের কোন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল? ইহার স্বরূপ বর্ণনা কর। (v) রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় প্রজাগণ কেন মনে করে যে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের অধীন না হইয়া এক অতিকায় রাষ্ট্রনায়ক জমিদারের অধীন হইয়া পড়িয়াছে? (vi) কোম্পানীর পুলিশ বিভাগের সংস্কার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** (i) দ্বৈত শাসনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ইহার গুণাগুণ বিচার কর। (ii) কোম্পানী নূতন বিচার ব্যবস্থা কিভাবে সুসংগঠিত করে তাহার একটি আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (iii) কোম্পানীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দেয়? ঐ ব্যবস্থাটির স্বরূপ কি? উহার গুণাগুণ বিচার কর। (iv) ভারতের রাজস্ব সংগ্রহের যে যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া উহাদের নূতনত্ব ও ভারতের জনজীবনে তাহার প্রভাব বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী :** (i) ১৬০০ হইতে ১৭৬৫ খ্রীঃ পর্যন্ত কোম্পানীর কি ভূমিকা ছিল? (ii) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত, তুরস্ক, আরব, পারস্য ও তিব্বতের সহিত কাহারা বাণিজ্য করিত? (iii) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে প্রধান নাম উল্লেখ কর। (iv) বাংলাদেশ হইতে জাপান, হল্যাণ্ড ও মধ্যএশিয়ায় কি রপ্তানী হইত? (v) ইংলণ্ডের অভিজাতদের শয্যাগৃহে, পর্দায়, কুশনে, চেয়ার-ঢাকার সর্বত্র ভারতের শুধুমাত্র কি ব্যবহৃত হইত? (vi) ১৭২০ খ্রীঃ ইংলণ্ড ভারতের সূতীবস্ত্র সম্বন্ধে কি নীতি গ্রহণ করিয়াছিল এক কথায় লিখ। (vii) উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতের জাহাজ শিল্পের সহিত ইংলণ্ডের জাহাজ শিল্পের তুলনায় কাহার অবস্থা উন্নত ছিল? (viii) ভারতের জনজীবনের মৌলিক স্বরূপ কি? (ix) 'পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে বাংলা তাহার শিল্পের স্বল্পমূল্য, গুণ এবং বিস্ময়জনক সাফল্যের বর্ণনা' কে করিয়াছেন? (x) 'সূতীজাত দ্রব্যাদি বহুকাল ধরিয়া ভারতের প্রধান শিল্প হইয়াও বর্তমানে চিরতরে অবলুপ্ত' এই মন্তব্যটি কাহার? (xi) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কবে, কাহার দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল? (xii) 'পূর্ববর্তীকালে বাংলা ছিল দেশসমূহের শস্যভাণ্ডার এবং প্রাচ্যে বাণিজ্য, ধনসম্পদ ও শিল্পেরও ভাণ্ডার'—উক্তিটি কাহার? (xiii) মীরজাফর ও মীরকাসিমের নিকট হইতে কোম্পানী ও তাহার কর্মচারীগণ কত স্টার্লিং অর্থ আদায় করিয়াছিল? (xiv) পিতার নিকট পত্রে কে সোরার ব্যবসায়ে ৫০,০০০ টাকা লাভের কথা ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জানাইয়াছিলেন? (xv) কোম্পানী তাহার কর্মচারী ও স্বাধীন ব্যবসায়ীদের কি রপ্তানীর অনুমতি দান করেন? (xvi) ভারতে শোষণকার্যে সক্রিয় ভূমিকা কাহারা গ্রহণ করিয়াছিল? (xvii) ১৭৯৬ খ্রীঃ কোম্পানীর বিনিয়োগের পরিমাণ কত ছিল? (xviii) ১৭৬৭ খ্রীঃ চীনের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্যের জন্য এদেশ হইতে বার্ষিক শোষণের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ টাকা?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) ভারতীয় রাজন্যবর্গ কেন 'ইউরোপীয় বণিকদের নানা অত্যাচার সহ্য করিয়াও নানা স্থানে তাহাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দান করিতেন'? (ii) অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের অবস্থা বর্ণনা কর। (iii) ভারতের প্রধান শিল্প বলিতে কি বুঝায়? তাহার অবস্থা বিবৃত কর। (iv) কোম্পানীর ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির ফলাফল কি হইয়াছিল? (v) ভারতীয় শিল্পের পতন সম্বন্ধে মণ্টগোমারী মার্টিনের মন্তব্য উল্লেখ কর। (vi) পলাশীর যুদ্ধের পরে উপহার গ্রহণের মাধ্যমে কোম্পানীর শোষনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। (vii) কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের মাত্রা কিরূপ ছিল? (viii) হীরক রপ্তানী বিষয়ে যাহা জান লিখ। (ix) বাংলার জনগণকে শোষণে শাসক শ্রেণীর ভূমিকা বিবৃত কর। (x) কোম্পানীর বিনিয়োগ বিষয়ে যাহা জান লিখ।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) ১৬০০ হইতে ১৭৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারের বর্ণনা দাও। (ii) বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলার রপ্তানীদ্রব্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (iii) বাংলার রপ্তানী বাণিজ্যের ফলে ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর। (iv) পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্যিক সম্পর্কের যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। (v) ভারতীয় বাণিজ্য ও সিন্দের ভাঙ্গন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (vi) ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার নূতন নিয়মে প্রাচীন অর্থনীতির বিলুপ্তি ও শহর সমূহের অবনতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) পলাশীর যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপে পূর্বতন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন ও তাহার পরিবর্তন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর। (ii) পলাশীর যুদ্ধের পর যে সকল সূত্রে শোষণের সূত্রপাত হয় তাহা বিশদভাবে আলোচনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ** (i) বিদ্যোৎসাহী হেষ্টিংস কলিকাতায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন? (ii) এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান স্থাপয়িতা কে? (iii) বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন কে? (iv) বাংলার দিনেমারদের অধিকৃত উপনিবেশের নাম কি? (v) ভারতের শিক্ষা ব্যাপারে ১৮১৩ সালের সনদ কেন বিখ্যাত? (vi) হিন্দু কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? (vii) ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম বলিয়া কোন্ গভর্নর জেনারেল কবে ঘোষণা করেন? (viii) ভারতের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ১৮৫৪ সালে কোন ঘটনা উল্লেখযোগ্য? (ix) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে কার শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (x) ১৯২১ খ্রীঃ ভারতে নিরক্ষতার সংখ্যা ছিল শতকরা কত জন? (xi) সতীদাহ প্রথা কবে কে আইন করিয়া নিষিদ্ধ করেন? (xii) ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের স্রষ্টা কে? (xiii) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। (xiv) বিধবা বিবাহ আইন কবে প্রচলিত হয়? (xv) রামমোহনের নাম ১৮১২ খ্রীঃ স্পেনের কাহারা কোথায় উল্লেখ করিয়াছেন? (xvi) পাশ্চাত্যের বহু বিখ্যাত গুণী ব্যক্তি থাকিতেও আমেরিকায় কাহারা রামমোহনের নামে তাহাদের কোন্ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেন?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (ii) ১৮১৩ সালের চার্টারে শিক্ষা বিষয়ে কি বক্তব্য ছিল এবং ভারতে তাহার কি প্রতিক্রিয়া ঘটে? (iii) ইনফিলট্রেসন পদ্ধতি বলিতে কি বুঝায়? (iv) ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে কিভাবে ঘোষণা করা হয়? (v) রামমোহনের সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক কাজের বিবরণ লিখ। (vi) ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের ভূমিকা বিচার কর। (vii) বিদ্যাসাগরের জীবনের সমাজ সংস্কারমূলক কাজ কি ছিল? (viii) মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের ভুমিকা বিবৃত কর।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) কোম্পানী আমলে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সহিত কি কি পরিবর্তন ঘটে? (ii) ইংরাজী শিক্ষার সুফল ও কুফল সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর। (iii) রামমোহনের সমাজ ও নারী কল্যাণমূলক কার্যাবলীর বিবরণ লিখ।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ** (i) ভারতে ইংরাজী শিক্ষাপ্রসারে উডের ডেসপ্যাচের ভূমিকা সবিস্তারে বর্ণনা কর। (ii) রামমোহনকে আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ বলিবার কারণ কি? (iii) বাংলার নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

নবম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী ঃ** (i) কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও বিস্ফোরণ হইতেই ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়? (ii) বারাসতে রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমেদের শিষ্যের নাম কি? (iii) বাঁশের কেল্লা কে কোথায় রচনা করিয়াছিলেন? (iv) ১৮২৪ খ্রীঃ শাহারানপুরের নিকট কাহাদের বিদ্রোহ ঘটে? (v) সমগ্র দিল্লী অঞ্চলে কত খ্রীঃ কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল? (vi) গুজারগণ কাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দরুণ বিদ্রোহ করিয়াছিল? (vii) ১৮২৬-২৯ সাল পর্যন্ত পুণা জেলা কাহাদের বিদ্রোহে আলোড়িত হইয়াছিল? (viii) ১৮২৪ খ্রীঃ বিজাপুরের পূর্বস্থিত সিন্দগী লুণ্ঠন করিয়াছিল কে? (ix) পাগল পন্থী নামে সম-ধর্মীয় সংস্থা কে গঠন করেন? (x) সুরাটে জনগণ কেন ১৮৪৮ সালে বিদ্রোহ করে? (xi) ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? (xii) ভারতে মুসলমানদের মধ্যে ওয়াহাবী আন্দোলন প্রবর্তন করেন কে? (xiii) 'ভারতীয় মুসলমান' গ্রন্থটির লেখক কে? (xiv) ওয়াহাবীদের কার্যকলাপ কত সাল হইতে কত সাল অবধি অব্যাহত ছিল? (xv) মুসলমানগণ ভারতকে কোন ভূমিতে পরিণত করিতে চাহিতেন? (xvi) ফারাজী আন্দোলন কে সংগঠিত করিয়াছিলেন? (xvii) দুধুমিঞার পরিচয় কি? (xviii) ছোটনাগপুরে ১৮৩১-৩৩ সাল পর্যন্ত কাহাদের বিদ্রোহ হইয়াছিল? (xix) বাংলায় সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নেতার নাম কর। (xx) কলিকাতায় সাঁওতাল বিদ্রোহের কোন্ স্মরণ আছে? (xxi) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্ সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ** (i) সংক্ষেপে তিতুমীরের বিদ্রোহের কাহিনী বিবৃত কর। (ii) রোহ্‌টক জিলার জাঠ জাতির বিদ্রোহ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (iii) গুজরাটের কোলি বিদ্রোহের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (iv) খান্দেশ বিদ্রোহের কারণ ও

ফলাফল বিবৃত কর। (v) ওয়াহাবী আন্দোলনের আদর্শ কি ছিল ? (vi) বঙ্গদেশের বাহিরে ওয়াহাবী কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (vii) সিপাহী বিদ্রোহে ওয়াহাবীদের ভূমিকা বিষয়ে যাহা জান লিপিবদ্ধ কর। (viii) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াহাবী আন্দোলনের গুরুত্ব নির্ণয় কর। (ix) ফারাজী আন্দোলন কি অর্থে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রভাবিত করে ? (x) ফারাজী আন্দোলনের নেতা দুধু মিঞার কি পরিণতি ঘটিয়াছিল। (xi) সাঁওতাল বিদ্রোহ বিষয়ে যাহা জান লিখ।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** (i) বাংলার একটি কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃষক অভ্যুত্থান সমূহের তাৎপর্য বর্ণনা কর। (ii) উত্তর ভারতের বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহের একটি সুবিন্যস্ত নিবন্ধ রচনা কর। (iii) ফারাজী আন্দোলনের উৎপত্তি হইতে শরিয়াতুল্লাহের মৃত্যু পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** (i) ভারতে ওয়াহাবীদের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি বিবৃত করিয়া এই আন্দোলনের একটি সুষ্ঠু রেখাচিত্র অঙ্কন কর। (ii) স্বাধীনতা সংগ্রামে উপজাতীয় আন্দোলনের প্রভাব ও তাৎপর্য বিচার করিয়া দেখাও।

দশম অধ্যায়

১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্নাবলী :** (i) সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেই বিহারের জগদীশপুর অঞ্চলের চক্রান্তকারী রাজপুত বীরের নাম কি ? (ii) 'সিপাহী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই পরিস্থিতির জটিলতা নিহিত ছিল' উক্তিটি কাহার ? (iii) কিসের সত্য কাহিনী শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল ? (iv) নানা সাহেব কে ছিলেন ? (v) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি কি সর্বত্র সমান ছিল ? (vi) অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহ দমনের জন্য কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (vii) মহারাণীর ঘোষণাপত্র কবে প্রচারিত হইয়াছিল ? (viii) ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :** (i) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কি ? (ii) সেই বিদ্রোহে জনসমর্থনের মাত্রা বিচার কর। (iii) বিদ্রোহে কুনোয়ার সিং-এর নেতৃত্ব বর্ণনা কর। (iv) অযোধ্যা রোহিলখণ্ডে সার কলিন ক্যাম্বেল-এর বিদ্রোহ লিপিবদ্ধ কর। (v) বিদ্রোহে ঝাঁসীর রাণীর ভূমিকা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** (i) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পিছনে রাজনৈতিক কারণ কি ছিল বলিয়া তোমার অনুমান ? (ii) বৃটিশ শোষণ শাসন কি এই বিদ্রোহের অর্থ নৈতিক কারণের ভিত্তি প্রস্তুত করিয়াছিল ? (iii) বিদ্রোহের পিছনে সামাজিক কারণ কি কি ছিল ? (iv) বিদ্রোহের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।

৪। **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :** (i) বিদ্রোহের গতি ও পরিণতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ii) বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি নিরূপণ কর। (iii) এই বিদ্রোহ কি সামান্য সিপাহী বিদ্রোহ রূপেই চিহ্নিত হইবার যোগ্য ? উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহ বিদ্রোহের স্বরূপ বিচার কর। (iv) ভারতের জন জীবনে বিদ্রোহের কি ফলাফল ঘটিয়াছিল ?

